হযরত মৌলভী নূরউদ্দীন (রা.)
খলীফাতুল মসীহ আউয়াল

মোহাম্মদ জাফরুল্লাহু খান (রা.)
হযরত মৌলভী নূরউদ্দীন (রা)
খলীফাতুল মসীহ আউয়ালান

মূল (ইংরেজী)
মোহাম্মদ জাফরল্লাহ খান (রা)

বাংলা অনুবাদ
মাওলানা ফিরোজ আলম

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ
একটি আহমদীয়া বিলাত্ত শতবর্ষিকী জুবিলি প্রকাশনা

প্রকাশক : মাহুব হোসেন
ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

প্রথম সংস্করণ : ইংরেজী, ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দ
dি লভন মক্ত, মুক্তরাজ্য কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ : বাংলা, ২৭ মে ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দ

সংখ্যা : ২০০০ পৃষ্ঠাগুলো

মুদ্রণ : ইন্টারকন এসোসিয়েটস
৫৬/৫, ফকিরেরপুর বাজার,
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

Title : Hadrat Maulawi Nur-ud-Din∗ra
Khalifatul Masih I

Written by : Muhammad Zafrulla Khan∗ra

Translated by : Maulana Firoz Alam

Published by : Mahbub Hossain
National Secretary Esha‘at
Ahmadiyya Muslim Jama‘at, Bangladesh
4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211

ISBN 984 991 004-6
হযরত মৌলভী নূরউদ্দীন (রাও)
খলীফাতুল মসীহ আউয়াল
মুখবন্ধ

মহান আল্লাহ তাহালা তাঁর পবিত্র কানোরে সুরা নুরে প্রদত্ত মুহুমমদের প্রতি বিলাক্তের প্রতিক্ষিত এবং খাতামান নবীন ইমামুল মুসলিম হযরত মুহাম্মদ সালাহালা আলাইহে ওয়া সালাম এর ভবিষ্যদ্বাণী কিলাক্ত অলা মিনহাজিন নুবুওয়াত’-এর পূর্বতায় আহমদীয়া মুসলিম জামাতে ২৭ মে ১৯০৮ ইসলামী বিলাক্তের পুনর্প্রতিষ্ঠিত হয়। ২৬ মে ১৯০৮ হযরত ইমাম মাহদী ও মাসুদু মাওলানা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ) -এর ইতিহাসের পর ইসলাম ধর্ম ও মানবতাজাতের সেই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তাঁর পবিত্র মরদেহের কে সাহায্য করার পূর্বে তাঁর সর্বপ্রথম ও সর্বচেয়ে নিবন্ধিত দ্রষ্টব্য শিয়া প্রধান আলেম, কুরআনের মহান প্রাক্তন হযরত হেকিম মৌলিকী নুবুওদীন (রা.) কে তাঁর খেলিফা হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। জামাতের সদস্যরা তাঁর হাতে বয়স করে। এই ক্ষুদ্রতে খেলিফা হিসেবে তাঁর জন্য সে ভূমিকা পালন করা অবহিত ছিল যা ১৩০০ বছর পূর্বে ইসলাম ও মানব জাতির জন্য অধিকাংশ সংকটের মুহূর্তে মহানরী সালাহালা আলাইহে ওয়া সালাম এর প্রথম খেলিফা হযরত আবু বকর (রা.) কে করতে হয়েছে সেই একই দায়িত্ব তিনি পালন করেন। এই কুপুরা হযরত নুবুওদীনকে বিলাক্তের দায়িত্ব এর সুপরিপূর্ণ পালনের জেনেরিফ দিয়েছেন যে, ১৯১৪ সনের মার্চ তাঁর ইতিহাসের সময় যখন জামাতের বয়স ২৫ বছর তখন জামাতের সমর্পন প্রকার বিশ্বব্যাপী ও বিস্মৃতিতে থেকে নিরাপত্তা লাভ করে।

ইসলাম ও আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ইতিহাসে হযরত মৌলিকী নুবুওদীনের (রা.) স্বাত কৃতী ও দৃষ্টির প্রতিবিশ্বিষ্ট। যেহেতু জামাতের অধিকাংশ সদস্য তাঁর পবিত্র জীবনী সম্পর্কে অনবিহত তাঁর মূলান জাফরুলাহ খান (রা.) ইব্রীয়া আলাইহে ‘হযরত মৌলিকী নুবুওদীন (রা.) খেলিফাতুলল মালী আউরাল শীর্ষক জীবনীী স্ক্রিপ্ট চরা করেন। সেদিন তাঁর এ অনুশীলন একটি অধ্যায় ছিল। তথ্যের জন্য প্রায় সকল কর্মক্ষেত্রে মহাম আনুদী কারের রচিত ‘হযরত নুবুওদীন’ এর উপর নির্যাত করেছেন। আহমদীয়া বিলাক্তের সত্যবাক্যী জুবিলী (১৯০৮-২০০৮) প্রকাশনা স্বাতের তালিকার অন্যান্য মূলীর সাথে হযরত নুবুওদীন পুস্তকটি অত্যন্ত হাকাত্মক মার্কিন মনোমতির সহায়ে এর বাংলা অনুবাদ করেন বেশি বাংলাব্যাপরে নির্যাতিত মূলবি সিলুসিলা, মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব। আল্লাহু তাজালা তাঁকে এ মহতি কর্মের জন্য উদ্বেগ পুর্ণকর দিত। পুনরাবৃত্তির অনুবাদ ও প্রকাশ দেখে দিয়েছেন আলহাজ মোহাম্মদ মুমুতুর রহমান এবং কমিটির কর্মকাণ্ডে অবদান রেখেছেন জামাতের প্রকাশনা বিভাগ। আল্লাহু তাজালা সংগঠন সকলকে উদ্বেগ পুর্ণকরে ভূষিত করেন।

মোহাম্মদের উর রহমান
নায়নান আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।
हो।
অনুবাদকের নির্দেশনা

হাবিমুল উম্মত, হাজীউল হারামিন হযরত মৌলানা নুরউদ্দিন (রাও) হযরত চৌধুরী জাফরল্লাহ খানের জীবনে এক অনন্য ব্যক্তিত্ব এবং এক অনন্য প্রেরণার নাম। জাগতিক ও অধ্যাত্মিক খ্যাতির মে ইরশিয়ার মর্যাদায় হযরত জাফরল্লাহ খান উপনিত হন তার জন্য তিনি হযরত নুরউদ্দিনের কাছে ছিলো। এই পুনর্ব্য হযরত নুরউদ্দিনের প্রতি তার গভীর ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতারোধের এক অনুরূপ ধার্ম। হযরত জাফরল্লাহ খান (রাও) এর এ পুনর্ব্য সম্পূর্ণভাবে তাঁর নিজের সূত্রে কিছু তথ্যের জন্য তাকে নির্দেশ করতে হয়েছে 'মেরকাতুল এফিন ফী হায়াতে নুরউদ্দিন' এবং আলবদুল্লাহ কাদার (সন্নদ্ধগরমল) সাহেবের বই 'হায়াতে নুরউদ্দিন' এর উপর।

অনুবাদকের সময়ে উল্লেখিত উক্ত দুটি বর্ণবাদী অনুবাদকের সামনে ছিল যার ফলে আশা করা যায় যে অনুবাদ মূল তথ্যের সমায়তার চলবে; তা তাড়েও এতে কেনাশেখন নেই যে ভুলকৃতি মানুষ ও তার কর্মের চিন্তাধারা, তাই আমি মহান আল্লাহ তালার নিকট ক্ষমাচর্চা।

এ পুনর্ব্যের অনুবাদকের কাছে জাদের ভূমিকা অনন্যতাকার্য তারা হলেন সরুজানাব আহমদ তারক মুসলিম (আমার সহকর্মী), সুলতান আহমদ, মনসুর আহমদ, মোতাসেম বিলাহ, আবার আহমদ (বর্তমানে লতা সর্বোচ্চ)। এক্রে সরবরাহের কিছু সময়ের মধ্যে হলেন মুসলিম উপর রহমান (ন্যায়নাল আমির, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ) এবং জনাব আলহাজ মুহিত রহমান। জনাব ন্যায়নাল আমির সাহেব তার সময় বংশতা এবং জনাব মুহিত রহমান সাহেব নিজ অভিব্যক্তি নিয়ে পুনর্ব্য প্রক্রিয়া রিপ্তিং-এর মত দুঃখ কাজটি করেছেন একাধিকবার। এছাড়া যারাই এ অনুবাদ ও প্রকাশনার সাথে কেনানা কেনানা ভাবে জড়িত আল্লাহ তাআলার তাঁদের সকলকে পুনর্ব্য করুন, আমাম।

এ পুনর্ব্য সকলের জন্য হিদায়ত ও স্থিতি পথ প্রাপ্তির কারণে হজেক এ প্রত্যাশাই করি।

ওয়াসুল্লাম

খাসার
ফিরোজ আলম
ইনচার্জ কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্ক, লতন
<table>
<thead>
<tr>
<th>নামা</th>
<th>পাতার নম্বর</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>লেখক পরিচিতি</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>ভূমিকা</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>পটভূমি</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>জ্ঞানের সমাজে</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>ভূপালে কিছু দিন</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td>হেজাজ গমন</td>
<td>37</td>
</tr>
<tr>
<td>ভ্রমণ চিকিৎসা পেশা</td>
<td>47</td>
</tr>
<tr>
<td>মহারাজার চিকিৎসক</td>
<td>56</td>
</tr>
<tr>
<td>অক্ষেষণকারী - যার অক্ষেষণ</td>
<td>69</td>
</tr>
<tr>
<td>হিজরত</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>আদর্শ শিক্ষা</td>
<td>86</td>
</tr>
<tr>
<td>প্রখ্যাত ধর্মবেত্তা</td>
<td>92</td>
</tr>
<tr>
<td>বিজ্ঞ উপদেষ্টা</td>
<td>106</td>
</tr>
<tr>
<td>খলিফাতুল মসীহ</td>
<td>122</td>
</tr>
<tr>
<td>খলিফার পদমর্যাদা</td>
<td>134</td>
</tr>
<tr>
<td>খিলাফত</td>
<td>152</td>
</tr>
<tr>
<td>অনুষ্ঠান</td>
<td>174</td>
</tr>
<tr>
<td>শেষ নিবেহ</td>
<td>189</td>
</tr>
<tr>
<td>ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ</td>
<td>215</td>
</tr>
<tr>
<td>অভিম দৃশ্য</td>
<td>233</td>
</tr>
<tr>
<td>তথ্যসূত্র</td>
<td>252</td>
</tr>
</tbody>
</table>
লেখক পরিচিতি

স্যার মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান (রা: ) (১৮৯৩-১৯৮৫) হযরত মসীহ মাওউদ (আ: )-এর একজন সাহাবী। তিনি ছিলেন খুবই বিচক্ষণ এবং অসামান্য স্মৃতিশক্তির অধিকারী। সুবক্তাও ছিলেন তিনি। তাঁর লেখনী ছিল শক্তিশালী। ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়াদির উপর তিনি একজন প্রসিদ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তি হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর জন্ম সিয়ালাকোটে চৌধুরী নাসরুল্লাহ খান সাহেবের ঘরে। তিনি ১৯০৪ সালে তাঁর পিতা-মাতার সাথে একত্রে হযরত মসীহ মাওউদ (আ: )-এর হাতে বয়স্ত গ্রহণ করেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন মিউনিসিপাল বোর্ড স্কুল হতে এবং মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন আমেরিকান মিশন হাই স্কুল থেকে। মাত্র ১৪ বছর বয়সে তিনি মেট্রুকুলেশন পরীক্ষায় তাঁর স্কুল হতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯১১ সালে লাহোরের সরকারি কলেজ হতে এগ্রুয়েশন করেন এবং প্রথম ভারতীয় হিসেবে লভন ইউনিভার্সিটি হতে এল.এল.বি. পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পান। তিনি ১৯১৫ সালে আইনজীবী হিসেবে নিজের পেশাগত জীবন শুরু করেন সিয়ালাকোট বারে। অল্প বয়স এবং বয়স অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও তিনি ১৯১৯ সালে লাহোর কলেজের আইনের শিক্ষক নির্বাচিত হন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরু ১৯২৬ সালে পাঞ্জাব এসেম্বলির সদস্য
হযরত মোল্লী নূরউদ্দিন (রা.) - খলিফাতুল মসীহ আউয়াল
মনোনীত হওয়ার মাধ্যমে। তিনি ১৯৩০, ১৯৩১ এবং ১৯৩২ সনে লড়নে অনুষ্ঠিত গোল টেবিল বৈঠকে ভারতীয় মুসলমানদের স্বাধীনতার সাথে তুলে ধরেন। তিনি ১৯৩১ সনে মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। এছাড়া তিনি ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার গভর্নর জেনারেলের প্রশাসনিক কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন এবং এ সময়ে তিনি বিভিন্ন দপ্তরের দায়িত্ব পালন করেছেন। উদ্রেখনযোগ্য দদশাসমূহ হচ্ছে: যাহ্যা, বাণিজ্য, আর্কিওলজি, বিলওয়ে এবং আইন বিভাগ। এ সময়ে তিনি অনিবৃত্ত ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হিসেবে বিভিন্ন দেশে অনেক কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেছেন এবং অনেক দেশের প্রধানদের কাছে বিজ্ঞাপিত বিষয়টি তুলে ধরেছেন। তিনি প্রথম থেকেই কারণে আজ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর একজন মনোনীত সহযোগী হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন।
তিনি ১৯৪৭ সন পাকিস্তানের পররাক্রম মহী হন এবং জাতিসংঘের জেনারেল এসেম্বলিতে পাকিস্তানের ডেলিগেশনের প্রধান ছিলেন। তিনি জাতিসংঘের জেনারেল এসেম্বলির ১৭তম অধিবেশনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি তার পেশাগত জীবনকে আরও উন্নয়ন করেন আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারক হিসাবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে। সেই আদালতে তিনি ১৯৫৪-১৯৬১ পর্যন্ত ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে এবং ১৯৭০-১৯৭৩ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
স্যায় জাফরপুরাহ খান-এর উদ্রেখনযোগ্য কাজের মধ্যে আছে কুরআন শরীফের অনুবাদ, রিয়ায়দুস সালেহীন (হাদিসের বই)-এর অনুবাদ এবং তায়ফিকা (মসীহ মাওদুর (আঃ)-এর ভিষায়দ্বাণী, স্পষ্ট এবং কাশুকের সংকলন)-এর অনুবাদ।
এছাড়াও তিনি বিভিন্ন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিষয়াদির উপর বেশ কিছু বিখ্যাত বই রচনা করেছেন।
ভূমিকা

জামাতে আহমদীয়ার পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ, প্রতিষ্ঠাত মসীহু ও মাহদী (আল্লাহ) করেক ঘটা অসুর্য থাকার পর ১৯০৮ সনের ২৬শে মে লাহোরে ইস্তেমকল করেন। এর প্রায় এক সম্ভাবন কিছু দিন পূর্ব থেকে খোদার পক্ষে থেকে প্রাপ্ত এলাহামে অচিরেই তার জীবনের পরিসমাপ্তি সম্পর্কে বলরে তাকে সতর্ক করা হয়। যাহোক এ ঘটনা যখন ঘটে, জামাতের সদস্যদের কোমর ভেঙে যায়।

তার বিবরণ শিক্ষার নির্দেশ করে আর সবচেয়ে স্পষ্ট শিক্ষা কূটনৈতিক অবস্থায় মেরু উঠে এই তত্ত্বে যে, তাদের বিবরণাত্মক মাত্রাত ও জীবন পদ্ধতির প্রতি যিনি ভয়াবহ হৃদয়কে বিস্মৃতি অবশেষে তাকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। তারা ভেবেছে, তিনি যে জামাত প্রতিষ্ঠা করেছেন তা খুব তাড়াতাড়ি বিস্মৃতির অতল গহ্বরে তলিয়ে যাবে এবং মুসলমানদের মাঝে যে অনুভবের অস্তিত্ব দেখা দিয়েছিল তা এখন অত্যাদৃশ ব্যাপার মাত্র।

মুসলমানদের অত্রশীপ তার দাবীকে প্রায় না করলেও একত্র অনুভূতি করেছেন যে তারা আজকে ইসলামের একজন মহান চাপিয়নকে হারিয়েছে, যার মূর্ত্তি ছিল একটি অপুরুষী কিন্তু। এমনকী মুসলমানগণও একথা সীকার করেছে এবং তার মূল্যত তার অসাধারণ পাদটীকা, নিষ্ঠা ও তার পবিত্র জীবন পদ্ধতি এবং মোহনাদীর গৌরী প্রশংসা করেছেন।

ইসলাম, ধর্ম ও মানবতাতির ইহতায়ারে সে গুরুত্বপূর্ণ মুখতার্কে তার পবিত্র মরদেহামে যথাযথ মায়ার সাথে সমাহিত করার পূর্বে তার সবচেয়ে উচ্চ এবং সবচেয়ে নিরবিছিল শিখা প্রথায় অলেম, খুব আলোর একজন মহান প্রেমিক, প্রথায় হারমিয়া হযরত মৌলী নূরউদ্দিনকে (রাহ) তার খলিফা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। জামাতের সদস্যরা খলিফা হিসেবে তার হাতে বস্তিত করেন।

পাদাশালির কথা এবং ঐশী ইছানুলামে তার জন্য সে ভূমিকা পূর্ণ করা অবধারিত ছিল যা এক সময়ে ইসলাম ও মানবতাতির জন্য অধিকতর সংকটপূর্ণ মুহূর্তে ১৫০০ বছর পূর্বে মহানগি (সা):-এর প্রথম খলিফা হযরত আলুবকর (রা):-কে করতে হয়েছে। ঐশী কৃষ্ণ হযরত নূরউদ্দিনকে সে দায়িত্ব এত সুন্দরভাবে পূরণের জন্য নিয়োজিত যে ১৯১৪ সনের মার্চে তার ইস্তেমকলের সময় যখন জামাতের বয়স সিকর শতাব্দী হয় তখন জামাত সকল প্রকার বিশ্ব খলিফা ও বিজ্ঞানতাতে থেকে নিরাপত্তা লাভ করে। এর অবস্থান হয় যখন "বিলাকত" প্রতিষ্ঠানটি যখন পরিকায় পড়ে, যখন জামাতের কয়েকজন
হযরত মৌলিকী নূরউদ্দীন (রা.) - খলিফাতুল মসীহ আউরাজ

সদনের পক্ষ থেকে তার চালান্ডের সম্মুখীন হয। তাদের দাবী ছিল, জামাতের
শতকরা ৯৫ ভাগ মানুষের সমর্থন তাদের পক্ষ রয়েছে। কিন্তু তাদের ভূল
ভাংতে সময় লাগেনি। জামাতের সংখ্যাগরিষ্ঠ শেষী তা রুখে ঢাকায় এবং
দুঃখার সাথে সে চালান্ডের মোকাবিলা করে। আর তখন থেকে হযরত
খলিফাতুল মসীহ সাননী ও সালেস (রা:)-এর বিচক্ষণ, বলিষ্ঠ ও সত্য নেতৃত্বে
জামাত ক্রমশ এগিয়ে যায। আর সফলতার পর সফলতা লাভ করতে থাকে।
এখন বিশ্বের চতুর্দিকে এর শাখা জালের মত বিস্তার লাভ করেছে। এর
ক্রমবর্ধমান সদস্য সংখ্যা এক কোটির অধিক হবে (যখন বিভিন্ন লেখা হয়েছিল এ
সংখ্যা তখনকার)। কিন্তু বিশ্বব্যাপী বর্তমানে আহমদীর সংখ্যা বিশ কোটির অধিক -অনুবাদক।
এটিকে ব্যাপক পরিসরে ইসলামের প্রতিরক্ষা ঐশ্বী পুনর্প্রতিষ্ঠিত বিবেচনা করা হয়
(১৯৩৩)।

ইসলাম ও আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ইতিহাসে হযরত মৌলিকী নূরউদ্দীনের
(রা:)- স্থান স্থীত ও রূপুত্বে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু জামাতের সেসব সদস্য বা সেসব
সত্য সংস্থার যারা উদ্দেশ্য জানেন না তারা তার জীবন সম্পর্কে খুব একটা অবহিত
নন। এটি ইংরেজী ভাষায় তার জীবনের সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরার অতি খুব
একটি প্রয়োজন মাত্র। সেই সমাজ, মহিমাপ্ত ও রোহিশীল ব্যক্তির কৃতজ্ঞতায়
যে বিশাল ছাঁদ প্রাপ্ত হয়ে লেখক এর মাধ্যমে সুরূপতম একটি অংশ পরিশোধের
প্রয়োজন পাচ্ছেন মাত্র, যার নিকট থেকে তিনি অগ্রনিত ব্যক্তিগত অনুগ্রহ ও দয়া
লাভ করেছেন।

১৭তম অধ্যায় ছাড়া তাদের জন্ম লেখককে প্রায় সম্পূর্ণভাবে মরহীম আবদুল
কাদের (প্রাক্তন সওদাগর মল) কৃতক হযরত খলিফাতুল মসীহ আউরাজের
উদ্দেশ্যে লিখিত জীবনী 'হযরত নূরউদ্দীন এর উপর নির্ভর করতে হয়েছে।
অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সেই সংকলনে সংকলিত সকল ঘটনা মূল উৎস উল্লেখের
মাধ্যমে সত্যায়িত হয়েছে, যার উপর এর ভিত্তি। যেহেতু সকল তথ্যসূত্র উদ্দেশ্যে
তাই এগুলোকে তা উল্লেখের প্রয়োজন অনুভব করা হয় নাই। কেননা সাধারণ
গাঠনকের যতটুকু সম্ভব অংশ এতে তাদের খুব একটা লাভ হবে না। একজন
গবেষক তা আশ্বাসে 'হযরত নূরউদ্দীনে' খুঁজে পারেন।
বাকী যে সকল সূত্রের কথা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো
কুরআনের আয়াত।

মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান

১২
পটভূমি

হযরত মৌলিক নূরউদ্দীন ১৮৪১ সালে পাঞ্জাবের শাহপুর জেলার ভোরা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। সাত ভাই এবং দুই বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। বংশনৃত্রমিক ধারায় তিনি হযরত মুহাম্মদ (সাহ)-এর দ্বিতীয় ক্ষীরা হযরত উমর (রাহ)-এর ৩৪তম অধিক পুরুষ। এদিক থেকে তিনি কোরাইশী, হাশমী এবং ফারুজী সাব্যস্ত হন। তাঁর পিতা হাফেজ গোলাম রসুল এবং অব্যবহিত পূর্বের দশজন পূর্বজীবি পুরুষ কুরআনের হাফেজ ছিলেন। তাঁর মুল্য নূরবখন্ত ভেরার কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত এক গ্রামের আওয়াম বংশীয় সম্প্রদায় মহিলা ছিলেন। তিনি মহলার ছেট ছেট ছেলে-মেয়েদের পাঞ্জাবী ভাষায় কুরআনের অনুবাদ এবং মুসলিম ফিকহ শাস্ত্রের মৌলিক বিষয়াদি শিক্ষা দিতেন। তাঁর ছেট ছেলেও একইভাবে তাঁর কাছে শিক্ষা পেয়েছেন। পরবর্তীতে তিনি প্রায়শ বলতেন, মাতৃভূমি থাকা কালে তাঁর মাকে তিনি কুরআন তেলাওয়াত করতে শেখেছেন আর মাতৃদুঃখের সাথে তিনি কুরআনের ভালবাসা পান করেছেন। তিনি তাঁর প্রথম শিক্ষক ছিলেন। তাঁর পিতাও কুরআনের গাঁই অনুরাগী ছিলেন। তিনি সচিন ছিলেন এবং দূর-দূরদের বিভিন্ন স্থান এমনকি সুনুর বোঝে থেকে কুরআনের কপি সংগ্রহ ও বিনামূল্যে বিতরণের লক্ষ্যে বিপুল অর্থ ব্যয় করেছেন।

তিনি একান্ত সৈয়দীল, উদার এবং সহস্রইল পিতা ছিলেন। সন্তানদের জন্য উচ্চ লক্ষ্য নির্ধারণ করতেন এবং প্রতিটি পদক্ষেপে তা অর্জনে অনুপ্রেরণা যোগাতেন। তাঁর সুযোগ করিন্থ পুরুষ পরবর্তীতে একবার মন্তব্য করেন, 'আমার পিতা আমাদের ব্যাপারে এর উচ্চাকাঙ্ক্ষার রাখতেন যে, যদি আজ তিনি জীবিত থাকতেন তাহলে আমাকে জানানো সুনুর যুক্তরাষ্ট্র পাঠাতেন।'

কিছুটা বড় হলে নূরউদ্দীনকে স্কুলে পাঠানো হয়। তাঁর বাল্যকালে শ্রেষ্ঠীসমূহে ছাত্রের সংখ্যা খুব একটা, বেশি হতো না। প্রত্যেক ছাত্র শিক্ষকের বাক্সের মধ্যে ছাত্র আলাপ করার জন্য তাঁর একটি ব্যক্তিগত সেতুবদ্ধ গড়ে উঠতো। সম্পর্ক যত ধরিষ্ঠ হতো ছাত্র ততবেশি
হযরত মৌলিকী নুরউদ্দিন (রা.) - খলিফাতুল মসাইহ আউরাল

লাভবান হতো। সে যুগে প্রাইভেট পড়ার কোন প্রচলন ছিল না। শিক্ষকরা যে বেতন পেতেন তাকেই তারা স্বকৃষ্টি ধরতেন এবং তারা তাদের অবসর সময় যোগ্য ও মেধাবী ছাত্রদের শিক্ষার পেছনে বায় করতেন। ছাত্রদের গতির শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতেন এবং শিক্ষকদের ঋণ শীঘ্র করতে কখনও কুষ্ঠিত হতো না। আলাহু তালার অপর অনুসারে নুরউদ্দিন তাঁর জীবনে প্রভূত ঘটি লাভ করেছেন। তিনি তাঁর সকল শিক্ষককেই গতির শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় সাথে স্মরণ করতেন। তিনি একটি সুখী ও সমৃদ্ধি পারিবারিক পরিবেশে জীবনংসপৎগের সুযোগ পেয়েছেন। তাঁর বড় ভাই মৌলিকী সুলতান আহমদ একজন সুপরিচিত আলেম ছিলেন যিনি ছোট বাইয়ের সুশিক্ষায় গতির আগ্রহ রাখতেন। মা তাদের সকলের জন্যই তার সন্তান ও হোদাতাত্তর এক অনুমতি দৃষ্টিধর স্পন্দন করে পেয়েছে আম পাঞ্জাবী ভাষায় তাদের মানসিক শাস্ত্র সত্যের বীজ বপন করেছেন। পাঞ্জাবে উর্দু ভাষায় প্রচলন ছিল না। নুরউদ্দিন প্রথমবার দেওবন্দের একজন সন্ন্যাসী উর্দু বলতে শুনেন এবং উর্দুকে ভাববেসে ফেলেন। উর্দু বই পড়ার প্রতি তাঁর গতির আগ্রহ জন্য এবং দুর্দুর্বল শারীরিক পরিবারের সকলের লিখিত বই পড়ে তিনি অনেক উপকৃত হন। জীবনের প্রায়শই বই এর প্রতি তাঁর অনুরাগ দৃষ্ট থাকে এবং তিনি বই সংগ্রহ আরম্ভ করেন।

অশালীন ভাষায় তিনি শৈশব কাল থেকেই ঘৃণা করতেন। তাঁর খেলার সাথীরা তাঁর উপভোগিতে এ ব্যাপারে কুবেই সচেতন থাকতো। তিনি সাতার কাব্যে ভাল ভালবাসতেন এবং শীতকালেও হিলাম নদীতে সাতার কাটতেন।

লাহেরের তাঁর বড় ভাইয়ের একটি ছাপাখানা ছিল। এ কারণে প্রায়শই তাঁকে লাহের মেয়ে হতো। যখন তাঁর বয়স বারার কাছাকাছি, একবার তিনি বড় ভাইয়ের সাথে লাহের যান আর সেখানে অনুষ্ঠান হয়ে পড়লে সাইদ মিঠার হামিদ গোলাম দুর্গীর তাঁর সফল চিকিৎসা করেন। তাঁর খাদ্য ও সুখৈতে অনুপ্রাণিত হয়ে নুরউদ্দিন চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন উৎসাহিত হন। কিন্তু ভাই তাঁকে ফাসিদ পড়ার প্রতি উৎসাহিত করেন এবং তাঁর জন্য একজন প্রখ্যাত ফাসিদ শিক্ষক, মুম্ব মোহাম্মদ কাসিম কাশিমীর কে নিযুক্ত করেন। তিনি তাঁকে এত �分校 ও শ্রম দিয়ে শিক্ষা দিয়েছেন যে, তিনি অন্য সময়ের মধ্যে সে ভাষায় অনেকটা দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি মির্জা ইমাম ভার্দি নামক এক সুদুর্বল লিপিকারের কাছে হাতের লেখার অনুশীলন করেছেন। তাঁর উভয় শিক্ষকই শিয়া মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। সেই কারণে তাদের ছাত্র শিয়া বিশ্বাস, শিয়া মতবাদ ও আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে মৌলিকীটি পরিচিতি লাভ করেন।

১৪
পটভূমি

এ যাত্রায় লাহোরে তাঁর অবস্থান দু' বছরকাল স্থায়ী হয়। ভেরা ফিরে আসার পর মিয়া শরফুদীনের কাছে তিনি ফাসি শিক্ষা অব্যাহত রাখেন। অল্প কিছুকালের মধ্যে তাই মৌলিকী সুলতান আহমদও লাহোর থেকে ভেরা ফিরে আসেন এবং সয়া তাঁকে আরবী ভাষা শিক্ষা দেয়া আরম্ভ করেন। তিনি শিক্ষার একাংশ সহজ পদ্ধতি অনুসরণ করেন যার ফলে জানচারি প্রতি তাঁর অনুরাগ ও মনোযোগ উভয়ই সৃষ্টি হয়। এর কল্যাণে যে ভাষা বাহ্য কোন মনে হতো তা শিক্ষার ক্ষেত্রে মৌলিকী নৌরুদীন প্রভূত উন্নতি করেন।

১৮৩৯ সনে মহারাজা রণজিৎ সিং এর মৃত্যুর পর, পাঞ্জাবে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা, অশান্তি, বৈরাগ্য, রদ্ধতাত্ত্বিক এবং নিরাপত্তা-কীর্তিতার অস্থিতির নিম্নজ্ঞ ছিল, তা থেকে বৃষ্টির মাটি কিছুদিন হলো একে মুক্ত করেছে। জ্ঞান, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিগ্রহণের শেষ সীমায় পৌছে যায়। সাধারণ মুসলমান, এমনকি আলেমদের মাঝেও খুব কম সংখ্যক লোকই পবিত্র কুরআনের অর্থ জানতো। কুরআন শরিফের কেলাও তারকে উৎসাহিত করা হতো না। ঠিক এ সময়ে এক থেকে পুড়নে নৌরুদীনের হস্তে পবিত্র কুরআন পাঠের প্রতি গভীর অনুরাগ জন্য। ১৮৫৭ সনে কলিকাতার এক পাপিত্র বিলোক্তী ভেরা আসেন এবং কয়েকদিন নৌরুদীনের পিতার আতিথ্য আহ্বান করেন। তিনি নৌরুদীনকে কুরআনের অনুবাদ শিখতে উৎসাহিত করেন এবং তাঁকে পবিত্র কুরআনের প্রধান পাঁচটি অধ্যায়ের আরো থেকে উর্ধ অনুদিত কপি উপহার দেন।

অল্পকিছু দিন পর বেঙ্গলের একজন সেনাপ্তি তাঁকে 'তাকুতিয়াতুল ইমান' এবং 'মামারকুল আনোয়ার' নামে দুটো উর্ধ বই পড়ার পরামর্শ দেন যা পবিত্র কুরআনের অংশবিষয়ের তফসীর ছিল। তিনি এ দুটো খুব ভালভাবে পড়েন আর এভাবে পবিত্র কুরআনের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের ভীত রচিত হয় যা তাঁর জীবনের প্রধান আসক্তি ছিল এবং শেষ নির্ব্যাহ পর্যন্ত তা তাঁর জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে।

প্রায় এমন সময়েই তিনি দ্বিতীয়বার লাহোরের যান এবং গোমতি বাজারের হাজীম আলুদীন সাহেবের কাছে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। কিন্তু লাহোরে অবস্থান সংক্ষিপ্ত করে তিনি চলে আসেন আর এভাবে পড়ানো সামান্যকালে বন্ধ হয়ে যায়।

১৫
হলরত মৌলতী নুরউদ্দিন (রা.) - খলিফা মসীহ আউয়াল

১৮৫৮ সনে ১৭ বছর বয়সে শিক্ষায় ডিপ্লোমা নেয়ার উদ্দেশ্যে তিনি রাওয়ালপিডির নর্মাল স্কুলে পড়াশুনা আরম্ভ করেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক মৌলতী সেনাদর আলী সাহেব তাঁর শিক্ষার অগ্রগতিতে এতটা সমর্থ ছিলেন যে তিনি তাঁকে প্রাত্যাহিক কিছু ক্লাস থেকে ছুটি দেন। এভাবে তাঁরা যাওয়া অবশ্যই সময় তিনি ব্যক্তিগত শিক্ষকের সহায়তায় অন্যান্য বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের জন্য কাজে লাগাতেন। চার বছর মেয়াদি কোর্সের পরিসমাপ্তিতে তিনি বহু বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেন। ডিপ্লোমা পরীক্ষায় তিনি এটি ডাল ফলাফল করেন যে মাত্র একশ বছর বয়সে তাঁকে ভেরা শহরের কয়েক মাইল দূরে বিলাম নদীর ওপারে অবস্থিত শহর পীড়দান খান স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। তিনি চার বছর সে দায়িত্বে বহাল ছিলেন।

পীড়দান খানে অবস্থান কালে তিনি বড় ভাই মৌলতী সুলতান আহমদের তত্ত্বাবধানে আরবী শেখা অধ্যাপক রাখেন। এমন সময় তাঁর স্ত্রী-স্বপ্ন দর্শনের অভিধানও অবস্থান হয় যা তাঁর অধ্যায়ন বৃদ্ধি এবং উপলব্ধির প্রধানতায় সহায়তাকার হয়। জীবনের প্রার্থনায় কুরআন পাঠ ইতিমধ্যেই তাঁর অধ্যায়নের বাড়ি-বিচার শিক্ষককে ক্ষেপন করে তুলছিল। রাওয়ালপিডির নর্মাল স্কুলে অধ্যয়নকর্তা অবস্থায় তাঁকে জনাব আলেকজাভার নামে একজন খুব প্রশস্ত পদ্ধতির সাথে সাক্ষাতের জন্য উৎসাহিত করা হয়, যিনি কাছেই থাকতেন। তাঁর সাধনার পক্ষে ‘মীজানুল হক’ এবং ‘তরীফিক হায়ত’ নামে দুটি পুস্তক দেন যা তিনি অত্যন্ত মনোযোগ সহপাঠীর পড়েন। কিন্তু সেগুলো তাঁর কাছে সতৃষ্ণ্যকর বা কাজের কিছু বলে মনে হয়নি।

একবার যখন তিনি পীড়দান খান এর পার্শ্ববর্তী একটি গ্রামের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর পিতার এক ভক্ত তাঁর সাথে অত্যন্ত আতিথ্যেতাতাত্সুলভ ব্যবহার করেন এবং যথেষ্ট আদর-আপ্যায়ন করেন। বিদায় মুখ্যতে তিনি তাঁকে কোন ওয়াফা বা নসীহত লিখে দিতে বা এমন কিছু বলার অনুরোধ করেন যা পরবর্তী জীবনে তাঁর কাছে লাগতে পারে। তিনি তাঁর সামনে কুরআনের এ আযাত পাঠ করেন, "তুমি বল, ‘আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আপ্রান্ত ধন-ভাবারসমূহ আছে, না আমি অদৃশ্য সম্পর্কে অবগত আছি এবং না আমি তোমাদেরকে বলি যে, আমি নিষ্ঠা ফিরিশতা।’ (৬:৫১)।

প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে তাঁর ইন্তফা দেয়ার ঘটনাটি ছিল নাটকীয়। তিনি তা এভাবে বর্ণনা করেন: 16
পটভূমি

"একদিন সুল পরিদর্শক পরিদর্শনে আসেন। আমি খাবার খাচ্ছিলাম। আমি তাকে আমার সাথে খাবার জন্য আমন্ত্রণ জানালাম। তিনি আমার নিম্নলিখিত উপেক্ষা করে রাগের খবর বললেন, 'মনে হয় আপনি আমাকে চিনতে পারেন নি। আমার নাম খোদা বক্ষ এবং আমি সুল পরিদর্শক।'

'তাই নাকি! ভাল কথা, আপনি একজন সৎ মানুষ।' কিন্তু একজন শিক্ষকের পরিবেশিত খাবার আপনি খান না, এটি কেমন কথা!' এ কথা বলে আমি খাবার অব্যাহত রাখালাম আর তিনি তাঁর টাট্টু যেভাবে রেখি দেখে আশায় দাঁড়িয়ে রইলেন যে আমি কোন ছাত্রকে যেভাবে ধরতে বলবে। যখন তিনি দেখলেন, আমি কোন পদক্ষেপ নিচ্ছি না তখন তিনি বললেন: 'দয়া করে একজন ছাত্রকে আমার টাট্টুটি সামালতে বলুন।'

আমি উত্তর দিলাম: 'স্যার, আপনি এটা তাকে যে একজন শিক্ষকের পরিবেশিত খাবারকে যথাযথ মনে করে তা গ্রহণ করবেন না। সুতরাং আমি কিভাবে একজন ছাত্রকে আপনার যেভাবে সামালতে বলতে পারি। তারা বিদ্যালয়ে আসে পড়ালোক করতে, আমাদের বালকদের কাজ করার জন্য নয়। অধিকাংশ আপনি হয়ে এটা এবং খাওয়াতেও বলবেন। যেখানে আপনি নিজেই একজন শিক্ষকের আত্মহত্যার গ্রহণ করতে রাজি হলেন না, সেখানে টাট্টুকে খাওয়ানো কিভাবে সিদ্ধ হতে পারে?'

টাট্টু যেভাবে অস্থির হয়ে উঠছিল, অবশ্য তৎক্ষণে পরিদর্শকের কর্মচারী এসে গেল এবং সবকিছ দেখাতেন আমর করল। ইত্যাদি তিনি জানালেন, ছাত্রদের পরিক্ষা নেয়ার মাধ্যমে কাজ আরম্ভ করবেন। সেই মোটামুটি আমি ছাত্রদেরকে সুশোভনভাবে বসালাম এবং নিজে সরে গিয়ে দূরে বসে পড়লাম। পরিদর্শক পরিক্ষা নিলেন এবং আমাকে বললেন, 'আমি শেক্ষি, আপনি খুবই যোগ্য মানুষ এবং নমল সুলের কৃতি ডিপ্লোমাধারী। সন্ধ্যায় এটাই আমার উদ্ধাত্যুপর্যন্ত আচরণের কারণ।'

আমি জবাব দিলাম, স্যার, 'আমি করেক বর্গ-ইন্দ্র কাগজকে খোদা বলে গ্রাহ করি না। তখন আমি সাতটিকেটটিটি আনালাম, তার সামনেই সেটিকে ছিড়ে টকে-টকে করে ফেললাম এবং দেখালাম যে খোদা সাথে আমি কোন কিছুকেই শরীক করি না। পরিদর্শক পুরো ঘটনার জন্য অনুসন্ধান হলেন এবং আমার সনদটি নতুন হবার জন্য তিনি নিজেকে দায়ি করলেন। কিন্তু সত্য কথা হলো, ডিপ্লোমা ছিড়ে ফেলা আমার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগ্য ছিল যা আমার জন্য স্বাগত কর্ণারাজির দ্বারকে সুপ্রস্ন করেছে।"
হযরত মৌলিকী নুরউদ্দিন (রা.) - খলীফাতুল মসীহ আওয়াল

চার বছরের চাকরীর বিধি-নিষেধ এবং সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হবার পর যুবক নুরউদ্দিনের বয়স এখন পাঁচ। তিনি আবার তাঁর পুরনো বিনোদন জ্ঞান আহরণে ফিরে গেলেন। বাগিচালী মৌলিকী আহমদ দীন সাহেবের কাছে তাঁর পিতার তাঁর আরবী শিখার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু তাঁর বৃহৎ শিক্ষককে একটি বৃহৎ মসজিদ নির্মাণের কাজে অনবরত একস্থান থেকে অন্য স্থানবদ্ধ করতে হয়। এর ফলে ছাত্রদেরকেও তাঁর সাথে সাথে স্থানান্তরিত হতে হতো। নুরউদ্দিন প্রায় পুরো এক বছর এ ধরনের যায়গায়ন-মাপনে বাধ্য হন। বছরের শেষে যখন দেখলেন, খুব একটা লাভ হয়নি তখন তিনি তাঁর সহ মৌলিকী সুলতান আহমদের কাছে তাঁর অসন্তুষ্টির কথা জানালেন, তিনি তাঁকে লাওয়ার নিয়ে যান এবং হাকিম মোহাম্মদ বুলসাহ আরও কয়েকজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে তাঁকে সোপার্দ করেন। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে তাঁর এ সহায়ী উচ্চশিক্ষার সঙ্গে তাঁকে রামপুর যেতে উদ্দেশ্য করেন। তিনি তাঁর এ পরিকল্পনার কথা যখন পিতাকে জানালেন, পিতা তাঁকে সান্দের অনুমতি দিলেন এবং বললেন: ‘আমি অর্জনের জন্য তুমি এত দুরে চলে যাও যেখানে তোমার কাছে আমাদের খবরের পৌঁছা সম্ভব হবে না। কিন্তু তোমার মাকে এ কথা বলবা না পাচ্ছি দীর্ঘ বিচিত্রতার সংসারে তিনি মর্মাহত হন আর তোমাকে নিরুৎসাহিত করে বসেন।’

যাতার প্রকৃতিকালে একজন জ্ঞানীবান্ধির পরামর্শ তাঁর মনে পড়ল: তুমি যে শহরেই বসতি স্থাপন কর না কেন, শহরের পুলিশ প্রধান, একজন ভাল চিকিৎসক, একজন খোদাইচর্ম মানুষ এবং একজন সম্মানিত নাগরিকের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করবে।
জ্ঞানের সম্পন্নে

সাতাশ বছর বয়সে অন্য দুজন জন অষ্টমীর সাথে নূরউদ্দিন লাহোর থেকে পদ্মজন্ম রামপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সফর খুবই কষ্টদায়ক ছিল। যেতে কদম মিল লিখে যায়। শহরে কাউকে তারা চিনতেন না বা জানতেনও না। শহরে প্রবেশের পর তারা একটি প্রায় পরিত্যক্ত মসজিদে গিয়ে আশ্রয় নেন। দুদিন পর্যন্ত ৭/৮ বছরের একটি মেয়ের তাদেরকে সকাল ও সন্ধ্যা খাবার পেঃ দেয়।

তৃতীয় সকালে মেয়েটি খাবার নিয়ে এসে বললে, আমাদের মা অনুরুচ্ছ করেছেন: 'আপনাদের সাহেবকে বলুন যাতে তার শাখা তাঁর প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সরাসরি জানান।' নূরউদ্দিন মেয়েটির সাথে তাদের বসায় গেলেন এবং মেয়ের পিতাকে সন্দর্ভভাবে বুঝালেন, যার ফলে শাখা-শাখার মাঝে ভুন-বুঝানার অবনান হলো আর এ এশী অনুশীল জন্য নূরউদ্দিন খোদা তাঁদার প্রতি কৃতজ্ঞতা জাপন করলেন।

একদিন বিকেলে পাঞ্জাবীদের আবাস অতিক্রম করতে গিয়ে তিনি জনৈক হাফেজ আব্দুল হক সাহেবের মুখোমুখি হন। তিনি তাঁকে তাঁর মসজিদে চলে আসার অপমান জানান। নূরউদ্দিন বললেন, আমায় তিনজন। তাকে বলা হলো, তিনজনই আসতে পারেন। তিনি তাদের ভিতরীয় হিতসীকে বললেন, তারা রামপুরে জন অর্জনের জন্য এসেছেন। জীবিকার জন্য তাদের ভিক্ষা করা সমীচিত
হবে না বা জীবিকার জন্য ঘরের বাচ্চাদের দেখাশোনা করায় উচিত হবে না, বরং তাদের বই-পত্র ও শিক্ষাকে প্রয়োজন। সবকিছুই সুবিধাবাহী হবে বলে তাকে নিয়মান্ত্রে দেয়া হলো। তারা সে মোতাবেক নতুন স্থানে বসবাস আরম্ভ করলেন।

হাফেজ আব্দুল হক সাহেব তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে সবকিছু সুযোগস্বাভাবিক হলো। এ অনুশীল পরিবেশে নূরউদ্দিন পড়ার প্রাণে খুব দ্রুত উন্নতি করতে ছিল।

একবার বেশ কিছু ছাড় একটি জটিল বিষয় নিয়ে বিতর্ক করছিল। কয়েক মুহুর্ত তাকে পর নূরউদ্দিন বললেন, তাঁর কাছে এ প্রশ্নের উত্তর আছে। তাঁর উপস্থিতিকে অনুক্ষেপ্ত মনে করে ছাত্রদের একটি বড় অংশ তাকে তিনিকের করল। পাঞ্জাবী ছাত্ররা বললেন, তার কথা শোনা উচিত, এতে সবাই সম্মত হলো।

তিনি বললেন, একজন দক্ষ ব্যাকারণবিদকে বিচারক নিযুক্ত করা উচিত। জনের সমানিত ব্যক্তি মৌলিক গোলাম নবী সাহেবকে বিচারক নিযুক্ত করা হলো।

নূরউদ্দিনের উত্তরে তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠা হলেন এবং তাকে 'মৌলিক' আখ্যায়িত

করলেন। যুবক নূরউদ্দিন এটিকে অনেক বড় সমানের কারণ হিসেবে নিয়েছেন।

১৯
হযরত মৌলিকী নূরউদ্দিন (রা.) - খলীফাতুল মসীহু আউয়াল

মৌলিকী নূরউদ্দিন যিনি এখন যথার্থই এ উপাধির যোগ্য, সে যুগে অনুসৃত শিক্ষা ব্যবস্থায় পুরোপুরি সম্পূর্ণ ছিলেন না। ছাত্রকে তখন জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রথাগত তার নিজের রীতি-পন্থিত উপরেই ছড়ে দেয়া হতো আর প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেয়া হতো না। তিনি (নূরউদ্দিন) পরে বলেন, 'আমি প্রায়শই অনুরূপ করতাম, যদি ছাত্রদের ধর্মীয় এবং জাগতিক চাহিদাকে সামনে রেখে স্কুল বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য চিত্তান্ত করে মুসলমানরা পঠা-পুঠকি নির্দেশনার মুখোপাধ্য পেতো, তাহলে তারা সমাজের অনেক কাজে আসতো। বিশ্বাস এবং অনিয়মমাত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করে। আমি সবচেয়ে বড় যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি তা হলো, পাঠার বিষয় বা পাঠার পুনর্ব্য সম্পর্কে শিক্ষক কোনো সুনিশ্চিত দিকনির্দেশনা দিতেন না, আর ছাত্রদের জীবন এবং মেধা ও যোগাযোগ বিকাশের জন্য নিজেদের পছন্দ মতো জান চার্চ ও বার্থান্ন আছে বলে মনে করতো না। উন্মত্ত নৈতিক মূল্যবোধকে উৎসাহিত করা বা সে অনুশাসন জীবন-যাপনের প্রতি কোন মনন্যোগ দেয়া হতো না। আমি নিজের অভিভাবক থেকে বলতে পারি, সেকালে আমার শিক্ষকদের একজনও তরুণ প্রজনের নৈতিক উন্নতির প্রতি মনন্যোগ দিতেন না। আমি এ শূন্যতার জন্য আজও অংশগ্রহণ করি। আমার কোন শিক্ষক কখনো আমার কথা, কাজ এবং অভ্যাস বা নৈতিক অবস্থার প্রতি মনন্যোগ দেন নি। মতবাদ বা বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়ের দিকেও কোন দৃষ্টি দেয়া হতো না।'

রামপুরের শাহ আব্দুর রাজাক নামে একজন খোদাতীর্থ ব্যক্তি ছিলেন। তার কাছে মৌলিকী নূরউদ্দিন প্রায়ই যেতেন। একবার তার আগমনের মাঝে ব্যবধান অনেক বেশি ছিল। পরের বছর ডিসেম্বর তিনি এলেন, তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, নূরউদ্দিন এতে দীর্ঘ অনুপস্থিতির কারণ কি? তিনি বললেন, 'স্যার! পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম বা হতে পারে কিছুটা ভুলেও গিয়েছিলাম।'

'তুমি কি কখনও কসাইরের দোকানের পাশ দিয়ে গিয়েছো?' নূরউদ্দিন উত্তর বললেন, হ্যা অবশ্যই, বেশ কয়েকবার।

'তাহলে তুমি হয়ত লক্ষ্য করবে, মাস্টার কাছে সময় চার্চ জমা করণে ছুরি ভোতা হয়ে গেলে কসাইচ চার্চ মুক্ত করা এবং ধার দেয়ার জন্য একটি ছুরিকে অন্যটির সাথে ঘষণ করে।'

হ্যা, কিন্তু আমি আপনার কথা বুঝতে পারি নি।

'কথা হলো, তোমার অনুপস্থিতি আমাদের উভয়কে কিছুটা উদাসীন করে তোলে আর সাফাতে আমরা আবার প্রথম ফিরে পাই।'

20
মৌলিক নূরউদ্দিন প্রায়ই বলতেন, শাহু আবদুর রাজাক সাহেবের এ উপদেশে তিনি অনেক লাভবান হয়েছেন। খোদাইরুম মানুষের সান্নিধ্য আধ্যাত্মিক দৈত্যত প্রখ্যাত করে।

তিনি রামপুরে তিন বছর অবস্থান করেন এবং পড়ালেখার জন্য এতবেশি পরিশ্রম করেন যে মারাত্মকভাবে অসুখ হয়ে পড়েন। অসুখের তার মাঝে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা পরিচিতি করে। তিনি খুঁজে বের করলেন, দেশের সবচেয়ে ব্যাপক চিকিৎসা স্থানের হাসপাতাল হোসেন সাহেব। তিনি তৎক্ষণাৎ হাসপাতালের উপর ব্যাপবাদ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। পথিমধ্যে মুরাদাবাদে যাত্রা বিরতি করেন এবং বেবারোর এক বয়ো, মৌলিক আবদুর রশীদ সাহেবের সাথে তার দেখা হয়। তিনি তার এই যাত্রায় সেবা-শ্রেষ্ঠত্ব করেন যে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তিনি সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে ওঠেন। তার পক্ষ থেকে যেহেতু আত্মরক্ষকতা তিনি পেয়েছেন তা সরাসরি তার স্তুরভিতে আত্মান ছিল এবং তিনি তাঁর প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ ছিলেন।

মৌলিক আবদুর রশীদ অবিবাহিত ছিলেন এবং মসজিদ সংলগ্ন একটি কক্ষে অতি সাদামাটা জীবন-যাপন করতেন। কেননা এক পড়া বাইকেল একজন অতিথি এলেন। সে অতিথির খাবারের ব্যবস্থা করা তার জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ালো। তিনি তাকে বললেন, আপনি বিশ্বাস করলেন, খাবারের ব্যবস্থা হচ্ছে। মেহমান শয়ন করলেন এবং স্থানে পড়লেন। মৌলিক আবদুর রশীদ সাহেব নামায়ের জন্য ওয়ু করলেন এবং প্রথম মুহুর্ত হয়ে দোয়া আরম্ভ করলেন। 'আমি আমার করণ বিষয় আল্লাহর হাতে সোপর্দি করবো, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর বাদার অবশ্য সম্পর্কে সম্মুক্ত অবগত (৪০৪৫)। তিনি গভীরভাবে দেয়ায় নিম্ন ছিলেন। খাবার প্রস্তুতির জন্য যতটা সময় লাগতে পারে তিনিই ততক্ষণ পরে তিনি কারা আওয়াজ শুনলেন, যে বললেন, 'দয়া করে তাড়াতাড়ি আসুন আমার হাত পুড়ে যাচ্ছে।' মৌলিক আবদুর রশীদ সাহেব উঠে দেখলেন, এক ব্যক্তি একটি বড় পিঠলের পেট ভরে গরম বিদ্যুৎ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি তা হাতে নিলেন এবং অতিথিকে জানিয়ে তাঁর সামনে সুখদুঃখ খাবার পরিবেশন করলেন। সে পিঠলের থালা তাঁর গুহেই রোয় গেলো, মালিককে নিয়ে খাবার তাপাদা দিয়ে মৌলিক আবদুর রশীদ সাহেবের বার্তায় ঘোষণা সত্বেও তাকে কেউ কান্দিন নিয়ে আসেনি। পরিষদ কুরআনে প্রদত্ত নির্দিষ্ট ঐশ্বী নিশ্চিততা অস্বার্থ চাহিদা অক্ষুন্নভাবে পূর্ণ হবার অসাধারণ ঘটনা মৌলিক নূরউদ্দিনের জীবনে অসংখ্যার ঘটেছে। যেমন, 21
হযরত মৌলিকী নুরউদ্দীন (রা.) - খলীফাতুল মসীহ আউয়াল

'এবং যে আল্লাহর তাকিয়া অবলম্বন করে-তিনি তার জন্য কোন না কোন উদ্ধারের পথ করে দিবেন এবং তিনি তাকে এমন স্থান থেকে রয়েক দিবেন যা তার কল্পনাতে। এবং যে আল্লাহর উপর নির্ভর করে, তিনি তার জন্য যথেষ্ট। (৬৫:৩-৪)

মুরাদাবাদ ছেড়ে যাবার পথে মৌলিকী নুরউদ্দীন কানপুরে তার ভাইয়ের এক বন্ধুর সাথে সাক্ষাতের জন্য এক দিনের সামরিক যাত্রা বিতর্ক দেন। এরপর তিনি লক্ষের উদেশ্যে যাত্রা করেন। রাজকোনালীর রোডের তাপমাত্রা ছিল তখন চরমে আর রা ছিল ধূলো-বালিময়। যখন তিনি তাঁর চুড়ান্ত গত্বর লক্ষ্যে চলেছেন, তিনি ছিলেন ধূলোবুক্ত আর তাকে অবাধিতর ও উক্ষুমুখ দেখাচ্ছিল। গাড়ি থেকে নামার পর পরই তিনি কাউকে জিজ্ঞেস করলেন, হাকিম আলী হুসেন সাহেব কোথায় থাকেন? তাকে বলা হলো, তিনি স্তরের সামনেই থাকেন। কোন প্রস্তুতি ছাড়াই তিনি যেমন ছিলেন সে অবস্থায় মাল-পত্র নিয়ে সোজা সে বাড়িতে প্রবেশ করান। প্রবেশদ্বারের সাথেই তিনি একটি বড় কামরা দেখেন, যার শেষ প্রাদেশ তুর্কি শুক্রমুষিত, সুদর্শন ও আকর্ষণীয় এবং ধ্বসত্বাধি সাদা পোষাক পরিহিত, ফিরিশ্তাতুল্লয়া এক ব্যক্তি গদিতে হেলান দিয়ে বসে আছেন। সামনে তাঁর ব্যবহারের বিভিন্ন জিনিস-পত্র সুপুর্বলভ আছে। দেয়ালের পা থেকে করেকজন সমানীত ব্যক্তি সহ্য বসে ছিলেন। মেঝে সাদা চাদরে আবৃত। পুরো দৃশ্যটি আগ্রহকের কাছে স্পিনিল বলে মনে হলো। তিনি এমন দৃশ্য ইতিপূর্বে কখনো দেখেননি। যাই হোক, ভয়ের কিছু ছিল না। নিজের মাল-পত্র প্রবেশদ্বারের এক পাশে রাখলেন এবং কক্ষ সকলের মধ্যমনি অর্থাৎ হাকিম সাহেবের দিকে সরাসরি সাহসিকতায় সাথে এগিয়ে গেলেন যাকে তিনি যথার্থই চিনতে পেরেছিলেন। মেঝের সাদা-বর্ড আল্লাহনিতে তাঁর ধুলোমাখা পায়ের ছাপ সৃষ্টি হতে দেখে তিনি কিছুটা লজ্জা পেলেন, কিন্তু কিছু করার ছিল না। সম্মানিত বুঝুর্গের সামনে এসে তিনি গাত্রবর্ধ বললেন, আসসালাম আলাইকুম ওয়া রহমতুরহাও ওয়া বারাকাতুহ এবং করমদনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন। হাকিম সাহেব নমমনিতাতার সাথে তাঁর সালামের উত্তর দিলেন এবং হাত বাড়িয়ে তাঁর ধুলোমাখা হাত নিজের দুর্লভ হাতে নিলেন। আগ্রহক হাকিম সাহেবের সামনে বসলেন। উপস্থিত বক্তরা যা ঘটিয়েছিলো তা দেখে যারপরনাই মনোন্মত হলো আর তাঁর সালামও।

২২
তাদের কানে শ্রদ্ধিকেটু ঠেকলো। তাদের নেত্রস্থিত একজন নিজের রাগ সংবরণ করতে পারলেন না। বলেই বললেন, 'আপনি কেনা সত্য দেশ থেকে এসেছেন?' তিনি বললেন, 'আমার এ অনানুষ্ঠানিকতা, আমার সাহসভরা সালাম সেই নির্দিষ্ট নবীর শিক্ষার প্রতিকল্প যিনি আরবের তুলনাত্মক মরুপ্রান্তের জন্য সংযোগ করেছেন, যিনি এক সময় ছাগপাল চরাতেন, খোদার অশেষ কল্যাণরাজি তাঁর উপর বর্ধিত হোক, আমার পিতা-মাতা তাঁর জন্য নিবেদিত।' তাঁর এ উত্তর উপস্থিত লোকদের বদ্ধপাতের মত আয়াত করলে এবং হাকিম সাহেব আরোপাপূর্ত ছিলেন। তিনি প্রশ্নকার্যকে বললেন: 'আপনি রাজদরবারী ছিলেন, কিন্তু কখনো এভাবে কিংকোর্টের বিষাদ হয়েছেন কি?'

সত্যিকার নীরবতায় পর হাকিম সাহেব তাঁকে আগমনের উদেশ্য জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রের জন্য অর্জনের জন্য এসেছেন। উত্তর হাকিম সাহেব করলে: 'আপনি দেখছেন, আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি আর এখন পড়ানোও পছন্দ করি না এবং শিক্ষক করবো না বলে মনস্তির করেছি। আগতক কিছুটা উত্তর ও বেদনাবিহূর করে উত্তর দিলেন, 'তাহলে তো সিরাজী দাশনিকের এ কথা তুল, 'কারো মনে আয়াত দেয়া পাপ।' হাকিম সাহেব এতে গতিরাত্বে আদোলিত হন। তিনি চিন্তা করে বললেন, 'মৌলতী নুর হাকিম একজন দক্ষ চিকিৎসক। আমি তাঁর কাছে আপনার জন্য সুপরি করবো। তিনি আগনাকে উত্তমভাবে পড়ানে।' আগতক আরেকটি ফাসি উক্তি প্রদান করেন, 'খোদার ভূমি একসময় বিস্তৃত আর আমার চলারও শক্তি আছে।' একথা হুলে হাকিম সাহেব পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করলেন আর বললেন, 'আমি আমার সংকল্প পরিহার করছি।'

হাকিম সাহেব ভিতরে গেলেন এবং উপস্থিত ভক্তরা চলে গেলো। মৌলতী নুরুদ্দিন তাঁর মাল-পত্র নিয়ে ভাইয়ের বন্ধু জনাব আলী বন্ধু খান সাহেবের বাড়িতে গেলেন। তিনি তাঁকে সাদর সহায়তা জানালেন এবং তাঁর যাচাইদের বিধান করলেন। পোসল ও পোষাক-আশাক পরিবর্তনের পর তিনি আলী বন্ধু খান সাহেবের দেয়া ঘরে চলে গেলেন। যেখানে তাঁর সকল কাজকর্ম নিজেকেই করতে হতো। তাঁর রুটি বানানোর প্রথম পাত্রটি পুরোটাই বার্ষিকীতে পর্যবেক্ষণ হলো। বিকল্প মনের হয়ে দেয়া করলেন, 'প্রসন্ন! আমি রুটি বানাও আমার রান্না-বান্নার কিছুই জানি না। আমার মত একজনের উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করা শুধু তোমার বিশ্বকের অপচয়।'}
পরিকার-পরিচিত হয়ে ধোপ-দূরত্ব কাপড় পরে তিনি হাকিম সাহেবের কাছে ফিরে এলে হাকিম সাহেব তাকে মৃদু ভর্সনা করলেন । তিনি বললেন: তুমি অনুমতি ছাড়া চলে গেলে ! কোন শিকারনিশের জন্য এটি সন্নিচীন নয় । তোমাকে এখানেই বসবাস করতে হবে, কিন্তু একাত্তরই যদি অন্যে থাকতে চাও তাহলে খাবার কিংবা এখানেই খেতে হবে । তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি চিকিত্সা শাখা কতটা দক্ষতা অর্জন করতে চাও?' তিনি বললেন, 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ হাকিমের সমকক্ষ হতে চাই !' হাকিম সাহেব মুখ্য হেসে বললেন, 'তুমি কোন না কোন লক্ষ্যের অবশেষে পৌঁছে যাবে । তোমার লক্ষ্য যদি এর নিচে হতো তাহলে আমি নিন্তু হতাম !'

হাকিম সাহেব তাকে একটি বিষয়ে পাঠান আরেক করলেন । কিন্তু তিনি দিনে একটি পাঠে সন্তুষ্ট ছিলেন না । তিনি সম্পূর্ক পাঠের ব্যবস্থা করতে চাইলেন, কিন্তু তেমন সাবাসাকাজক কিছু ঘটেনি । যদিও তিনি ফীরোজী মহলের মৌলভী ফকয়লুল-হাসর কাছেও পাঠ নিয়েছিলেন । তখন তিনি রামপুরে ফিরে আসার নিমিত্তে হাকিম সাহেবের অনুমতি নেবার সিদ্ধান্ত নেন । তিনি যখন তাঁর মনোবাসনা হাকিম সাহেবের কাছে ব্যক্ত করলেন, তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, 'আমার মতো একজন মানুষের জন্য চিকিত্সা ব্যবসা ও একটি সুবিধাজনক চাকুরীর মধ্যে কোনটি অধিক উদ্দেশ্য হবে?' মৌলভী নূরউদ্দিন শেখানো কথার পক্ষে মত ব্যক্ত করেন এবং এর স্পষ্টত তাঁর যুক্তি প্রদান করেন যা হাকিম সাহেবের মনে গভীর ঔৎসুক্য সৃষ্টি করে । তিনি তখন মৌলভী নূরউদ্দিনকে রামপুরের জমিদার নবাব কালী খানের কাছ থেকে কিছুদিন পূর্বে প্রাপ্ত একটি টেলিগ্রাম দেখান । এতে তাঁর জন্য একটি সুবিধাজনক চাকুরীর প্রস্তাব ছিলো এবং তাকে দ্বিতীয় রামপুরে পিয়া নবাবের একজন গুরুতর অনুসন্ধান প্রিয় কর্মচারী আলী বক্র-এর চিকিত্সা করার অনুরোধ করা হয়েছিল । হাকিম সাহেব বললেন, 'আমি আপনার উপদেশ মোতাবক্ক নবাব সাহেবের প্রস্তাব গ্রহণ করবো এবং আমরা উভয়ে রামপুরের উদেশ্যে যাত্রা করবো ।'

রামপুরে পৌঁছার পর হাকিম সাহেব মৌলভী নূরউদ্দিনকে আলী বক্রের আরোগ্যের জন্য দোয়া করার অনুরোধ জানান । তিনি বললেন, তিনি এর প্রতি কোন আগ্রহবোধ করেছেন না বরং রোগী মারা যাবে বলে আশঙ্কা করেছেন আর বাস্তবেও তাই ঘটেছে । হাকিম সাহেব আলী বক্রকে যে চিকিত্সা প্রদান করেছেন লক্ষ্যের অধিবাসী ইরাহীম নামে অপর একজন হাকিম নবাবের উপহারিতে তাঁর
জানার সন্ধানে

সমালোচনা করেন আর এতে হাকিম সাহেব সম্মুখ হন। মৌলভী নুরউদ্দীন তাঁকে এ নিষ্ক্যতা প্রদানের মাধ্যমে আশ্রয় করার চেষ্টা করেন, জীবন-মৃত্যু আন্তর্জাতিক হাটে। আলী বক্তের মত রোগে আঘাতে রুগ্ণ হাকিম ইব্রাহীমের চিকিৎসাধীন থেকেও মারা যেতে পারে। অন্য সময়ের মধ্যেই নবাব সাহেবের অপর একজন বেতনভোগীও একই রোগে আঘাত হয়ে হাকিম ইব্রাহীমের চিকিৎসাধীন থেকে আশাবাদকের পূর্বভাগ সড়কে মৃত্যু বরণ করে। এ ঘটনা হাকিম সাহেবের বিরুদ্ধে হাকিম ইব্রাহীমের অবজ্ঞাসূচক আচরণের অবসান ঘটায়।

ধীর পরিষ্কার ও তীব্র মেহরা করণে হাকিম সাহেবের তত্ত্বাবধানে মৌলভী নুরউদ্দীন এর প্রশিক্ষণের দ্বারা উন্নতি হতে থাকে। গুরু তার নিয়মিত পরিক্রমে নিত্যে আর তাঁকে সরবরাহ দেওয়া এবং আচরণের তাঁর মনোনীতকে সমান করত তার উপর নির্ভর করা আরও করলেন। সম্ভবত তার মাত্র নিজের অপব্যবহারকে কেবল বার্তাচ্ছে ও চিকিৎসার মায়ের সীমাবদ্ধ রাখেনি। তার জান-পিপাসা ছিলো বিরোধী এবং আজমের। কোন এক সময়ে তিনি মুহুর্ত সাদ উদ্ভার কাছে 'মুতানবী' অধ্যায়ের জন্য উপস্থিত হলে মুহুর্তের তাঁকে সময়ভাবের অনুভূত দেখি ফিরে দেন।

তিনি তখন এ বলে ফিরে আসেন। 'ঠিক আছে, আমি তত্ত্বীন অপেক্ষা করব যতদিন আপনি যায় আমাকে আপনার কাছে পড়ার মিনতি না করেন।' হাকিম সাহেবের নিকট ফিরে তিনি তাঁর কাছে জানতে চান, 'জান মানুষের কি উপকারে আসে?' তিনি উত্তর বললেন, 'জান মানুষকে উন্নত নেতিতে মূল্যবোধ চর্চা সহযোগ করে।' কিন্তু তিনি এ কথা কেন জিজ্ঞেস করছ? উত্তরে তিনি বললেন, জাননি! আমি মুহুর্ত সাদ উদ্ভার কাছে পিয়েছিলাম 'মুতানবী' পড়ার জন্য, কিন্তু তিনি সময়ের স্নাতকের অনুভূতে আমাকে ফিরে দিয়েছেন।'

হাকিম সাহেব সাহেব সাহেব সাহেব অফিস থেকে বাড়ি ফিরার পথে তাঁর সাথে দেখা করার অনুরোধ করে মুহুর্ত সাহেবের একটি চিঠি লিখেন। নির্দেশিত সময়ে তিনি নুরউদ্দীনকে পাশের একটি কক্ষে অবস্থান করতে বললেন। মুহুর্তের আগমনের পর ক্ষুদ্র বিন্যাস শেষে তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, মুহুর্ত সাহেব! আমি যদি আপনার কাছ থেকে কিছু শিখতে চাই আপনি আমাকে সময় দিতে পারবেন?

'অবশ্বই আমি আপনাকে সময় দিতে সদা প্রস্তুত এবং আপনার সেবার জন্য সুযোগ খুজি।' হাকিম সাহেব প্রশ্ন করলেন, 'যদি এমন কেউ যাকে আমি আমার
হযরত মৌলভী নূরুদ্দিন (রা.) - খলীফাতুল মসীহ আউয়াল

আধ্যাত্মিক গুরু বলে মান্য করি, তিনি যদি আপনাকে একটি অনুরোধ করেন?
মুফতি সাহেব বললেন, ‘সেক্ষেত্রে তিনি যেখানেই থাকুন না কেন আমি স্বয়ং সান্দ্রে তার কাছে যাবো।’

এর কিছুক্ষণ পর হাকিম সাহেব মৌলভী নূরুদ্দিনকে ডাকলেন। তাঁকে দেখে মুফতি সাহেব আহ্বাসি দিয়ে বললেন, ‘আসুন জনাব, আমি এখন আপনাকে আমার সাথে পড়ার জন্য মিনতি করছি।’

একবার একদল ছাত্র এ নিয়ে বিতর্ক করছিল: যারা আধ্যাত্মিক বুঝপতি অর্জন করেছেন তাঁর অর্জিত প্রভা অন্যদের শিখানো পছন্দ করেন কিনা? মৌলভী নূরুদ্দিন এ ব্যাপারে ইতিবাচক মতামত ব্যক্ত করলেন আর অন্যরা নেতিবাচক।

পরিসেপে সিদ্ধান্ত হলো, প্রথম নিপত্তির ক্ষেত্রে তারা আমির শাহী সাহেবের কাছে যাবেনো। তিনি ছিলেন যখন একজন স্বীকৃত আধ্যাত্মিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি উভয় পক্ষের বক্তব্য হুমান নূরুদ্দিনের কথায় সত্যি আধ্যায় দিলেন। যখন মৌলভী নূরুদ্দিন চলে আসিলেন তখন আমির শাহী সাহেব তাঁকে বললেন, ‘আমি তোমাকে একটি কথা বলছি যা তোমার সবচেয়ে না করা উচিত।’ যখন কেউ তোমার কাছে কোন সমস্যা নিয়ে আসে তখন আল্লাহকে স্মরণ করো আর মিনতি করো, হে আল্লাহ! আমি নিজে একে দাকিনি বরং তুমিই তাকে আমার কাছে পাঠিয়েছ। সে যা চায় তুমি যদি তা অনুমোদন না করো তাহলে আমি সে পাপের জন্য তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি যে কারণে আমায় লজ্জিত করার নিমিত্তে তুমি এ পরিস্থিতির অবতারণা করেছো। এইথেনও যদি সে ব্যক্তি তোমার কাছে পরামর্শ চাওয়ার ব্যাপারে অন্যহ্য হয় তাহলে আল্লাহর কাছে দিকনির্দেশনার জন্য মিনতি করো এবং তোমার দৃষ্টিতে যা সুরক্ষিত উপদেশ তা তাকে দাও।’

মৌলভী নূরুদ্দিন আমির শাহী সাহেবের এ উপদেশ থেকে প্রভূতি কল্যাণ লাভ করেছেন। হাকিম আলি হোসেনের তত্ত্বাবধানে দু বছরের কিছু বেশি সময় অতিবাহিত করার পর হাকিম সাহেব তাকে আনুষ্ঠানিক প্রশংসাপত্র প্রদান করেন।

এরপর নূরুদ্দিন তার কাছে বিদায় চান। হাকিম সাহেব তাঁর তোমার ও পরিকল্পনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, তাঁর অমৃত্যুর ভাষা ও হাদিসের উপর পড়াশোনা অব্যাহত রাখার আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। হাকিম সাহেব তাকে প্রথমে মিরাঘে হাকিম আহমদ আলির কাছে এরপর দিলীতে মৌলভী নজির হোসেনের কাছে অধ্যয়নের উপদেশ প্রদান করেন। তিনি নিজেও তাকে উভয় স্থানে পর্যাপ্ত সাহায্যের আমাস দেন।

২৬
মিরাথ পৌছে তিনি জানতে পারলেন, হাফিজ আহমদ আলী কোলকাতায় গেছেন, তাই তিনি দিলীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। সেখানে গিয়ে জানতে পারলেন, মৌলভী নাজির হোসেন রাজনৈতিক কারণে বিরচারের সময়ীন, এছাড়া তিনি অনুপস্থিতও বটে। নিরাশ হয়ে তিনি শুপালের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার মনস্রিত করেন এবং রওয়ানা দেন। গোয়ালিয়ারে একজন সমাজের ব্যক্তিদের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তিনি প্রথমে ক্ষুং হয়ে সহজে আহমদ বেরেলভির শিখায়। তিনি তাঁর সামনে কিছুদিন কাটানোর চিন্তাধার্য নেন। তিনি যখন পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করেন তখন মাহমুদ নামক এক আফগানী যুবক সফরসজ্জা হিসেবে তাঁর সাথে যোগ দেন। ব্যাখ্যাত পা ও ক্রাই-শান্ত দেহে তাঁরা যখন গুরুহ সনানিবাসে পৌছেন তখন তাদের আর চলার শক্তি ছিলো না। তাঁরা তখন অর্ধপরিত্যক্ত একটি মসজিদে আশ্রয় নিলেন। এবং কিছুদিন নামাজ মসজিদে আহ্মদ। তাঁর দেরীতে আসার কারণ জানতে চাওয়া হলে তিনি জানলেন, এক সময় এ মসজিদে অনেক নামাজের সমাগম হতো। কিন্তু সাধারণ কিছু মন্দির-মসজিদে নিয়ে মসজিদের মাঝে বিষয়ের সৃষ্টি হয় এবং মতভেদ এমন মাঝারীর পর্যায়ে পৌছে যে রক্ষপাতের আশ্রয় দেখতে দেয়। এর ওড়ানোর লক্ষ্যে সন্ন্যাস হয়, প্রত্যেকে নিজ নিজ বাড়িতে নামায় পড়বে। এ লক্ষ্য ও বিষয়টি মনে নিতে পারলেন না তাই দেরীতে নামায় জন্য মসজিদে আসলে যখন করার দেখার সময় নেই। মাহমুদ তাঁর করার উদ্দেশ্যে মৌলভী নুরুদ্দিন তাঁকে পরবর্তী দিন সকল মুসলিমের মসজিদে ডেকে আনার প্রস্তাব দেন। সে ব্যক্তি চলে যায় এবং সত্তর গোটা ভরে খাবার নিয়ে ফিরে আসে যা দুজনের জন্য পরিমাণ ছিল। পরবর্তী দিন সে ব্যক্তি নামাযবেহ একটি বড় অংশকে মসজিদে একত্র করে। তারা মৌলভী নুরুদ্দিনের ব্যাখ্যা-বিবেচনায় অন্তত অনুপ্রাপ্ত হয় এবং সন্ন্যাস এগার করে যে তারা পুনরায় নামায়ের জন্য মসজিদে আসা আরম্ভ করবে।
ভূপালে কিছু দিন

গুনাহু সেনানিবাসে পরিয়ে কয়েক মাইল যেতে না যেতেই একজন কৃষক মুসাফিরদের এ বলে সতর্ক করলে, তাদের যাত্রাপথ পরিবর্তন করা উচিত। কেননা সামনের গ্রামে কলেরা মহামারীর আদাীত হয়েছে। মৌলতী সাহেব বললেন, সতর্ক বাণিজ্যিক গুরুত্ব দেয়া উচিত। কিন্তু মাহমুদ মিওয়াতিকে হাঙ্গাতে নিল এ বলে যে এটি কেবল এক বাণিজ্যিক ব্যক্তির মতামত। এর তেমন কোন মূল্য নেই। কয়েক মিনিট পরেই মাহমুদ কলেরায় আক্রান্ত হলে। পাশ্ববর্তী গ্রামে তাদেরকে প্রবেশের অনুমতি না দেয়ায় বাধ্য হয়ে খোলা আকাশের নিচে একটি গাছের তলায় তাদের রাতি যাপন করতে হয়। হাফিম নুরউদ্দিন সাধারণ তার সফরকারির চিকিৎসা ও সেবায় নিজেকে নিয়ে জিতে করেন। কিন্তু দুই তিন দিন অসুস্থ থেকে সে মারা যায়। গ্রাম প্রধান কেবল মোটা অফিসের বিনিয়োগে লাশ দাফনের জন্য কবর খোঁদার ব্যবস্থা করতে সমাপ্ত হয়। হাফিম নুরউদ্দিন লাশ দাফনের নিমিত্তে প্রস্তুতি করে নিজ হাতে একা দাফন কর্ম সম্পন্ন করেন। যে উদ্বেগ-উৎক্ষণ, ক্রুদ্ধি ও কঠোর পরিস্থিতির তিনি সম্মুখীন হন তা তাকে একবারেই দুর্লভ ও অসহায় করে তুলে।

এমন সময় গ্রাম প্রধান হতভাগ্য হয়ে তার কাছে ছুটে আসে। তার একমাত্র ছেলে কলেরায় আক্রান্ত হওয়ায় সে হাফিম নুরউদ্দিনকে তার বাসায় গিয়ে ছেলের চিকিৎসা করতে মিনতি করে। তিনি তা-ই করেন। তার সময় চিকিৎসায় ছেলেটি ধীরে ধীরে আরোপণ লাভ করে। এরপর তিনি সফলতার সাথে আরও কিছু আক্রান্ত গ্রামবাসীর চিকিৎসা করেন। গ্রামের মাতবর ও তার তীর্থ তাকে আদর-আপ্যায়ন ও সেবা-যোগ করা অর্থ করে। গ্রাম প্রধান মাহমুদের কবর খননের জন্য যে টাকা গ্রহণ করেছিল তা ধু ফেরতই দেয়নি, বরং তাকে তার মালপত্তা ভূপালে পৌঁছে দেয়।

ভূপালে পৌঁছে তিনি তার মালপত্তা একটি পাহাড়শালার গেটের বাইরে রেখে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হন এবং শ্রুতমাত্র এক রুপী সাথে নিয়ে শহরের দিকে রওয়ানা দেন। পথে তিনি একটি বেকারীতে আটআনা খাবার করে খাবার খান। শহরের প্রবেশদ্বারে দাড়িয়ে একজন শহরী থেকে অনুমতি নিয়ে শহরে প্রবেশের পর তিনি শীঘ্রই রুক্ত তাকে পারেন, কোনো ভয়ের তার অবশিষ্ট আটআনা হারিয়ে গেছে। সরাইখানায় পৌঁছে দেখতে পান, তার মালপত্তা ঠিকই আছে, কিন্তু টাকা পায়না উদাহরণে। পরিদিন ২৮
মালপনি নিয়ে শহরে প্রবেশ করে যখন তিনি গতদিনের সেই বেকারীর পাশ দিয়ে যাবেন, তখন রুটি প্রস্তুতকারক তাকে ডেকে খেয়ে যাবার আম্বাণ জানান। তিনি তাঁর মালপনি তার কাছে জমা রেখে পেটপুরে খেয়ে নেন।

শহরের এক মনোরম যাত্রায় পুকুর পাড়ে অবস্থিত একটি বিবাহের মসজিদ তাঁর চোখে পড়লো। এ জায়গাটি তাঁর খুব ভাল লাগলো। তিনি বেশিরভাগ সময় এতে অতিবাহিত করা আরম্ভ করলেন। দু' তিন দিন কোন খাবার ছাড়া অতিবাহিত করার কারণে তিনি মারাত্মক ক্রুদ্ধি বোধ করলেন আর আশঙ্কা হলো, তিনি হয়তো আর বেশিক্ষণ বাঁচবেন না। আসরের নামাজের পর তিনি অনেক কষ্ট করে কোনভাবে মসজিদের এক পাশের একটি মঞ্চে ঘুরে পড়েন। তাঁর শরীর থেকে ঠাঙ্গা যাম বাড়িল। সে নামাজে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মুলি জামালউদ্দিন সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। তিনি হয়তো তাকে লক্ষ্য করে থাকবেন। যে কারণে নামাজের পর মসজিদের ইমামকে তিনি তাঁর ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করতে পাঠালেন। সহরের শেষ সীমায় উপনীত ক্রান্ত-ক্রান্ত আগমন্থক ইমামের প্রশ্নের খুব রক্ষণ জরুরি ছিলেন।

ইমামের কথায় একবার ভিত্তি করে মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং তাঁর কিছু সত্যসহ এলেন এবং কিছু প্রশ্ন করার পর তাকে তাঁর নামিত পরিকল্পনা করতে বললেন। তিনি তাই করলেন আর বললেন, তাঁর পরিপক্কের সমস্যা আছে। মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধে তিনি অন্যতম ব্যবস্থা একটি প্রস্তাব করলেন।

মুখ্যমন্ত্রী তখন তাঁর পোষাদের ফিরে যাবার ইচ্ছিত করলেন আর তাকে তাদের সাথে খাবার খাওয়ার আম্বাণ জানালেন। তিনি এ বলে আম্বাণ প্রত্যাখ্যান করলেন, তাঁর খাবারের কোন অংশ নেই। তখন মুলি জামালউদ্দিন তাকে স্বর্ণ করলেন, “বিবি করীম (সাহি) নিম্নলিখিত গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন।” একধারণ জন্য তিনি নিম্নলিখিত গ্রহণ করলেন। অন্য কিছু পর একজন বার্তাবাহক এসে তাকে তাঁর সাথে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে যাবার অনুরোধ করলে। তিনি উত্তর দিলেন, তাঁর হার শক্তি নেই। দু' তাকে পিঠে করে নিয়ে যাবার প্রস্তাব দিল আর তাকে মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে নিয়ে গেল এবং খাবার ঘরে মুখ্যমন্ত্রীর পাশে বসিয়ে দিল।

এরপর যা ঘটল তা মৌলিক সাহেবের নিজের ভাষায় বর্ণনা করা যেতে পারে: “রাতের খাবার পরিবেশন করা হলো। আমি প্রথমে কি খাব তা ভাবছিলাম। পেলাও পাকানো হয়েছে যা আমার খুব প্রিয়। আমি একগুলো পরিবেশন হতে নিলাম। দীর্ঘসময় উপস্থিত করার কারণে আমার আশঙ্কা হলো। তা গলায় আটকে নিল।

২৯
হয়রত মৌলিকী নূরউদ্দিন (রা.) - খলীফাতুল মসীহ আউয়াল

যেতে পারে তাই একপাশে সরিয়ে রাখলাম। এরপর আমি একবার মুরগির স্বপ্ন নিয়ে চুমক পরিমাণ খেলাম। খাওয়ার সাথে সাথে এটি আমাকে উজ্জীবিত করলো। এরপর আরেক চুমক খেলাম আর এভাবে ধীরে ধীরে যেতে থাকলাম।

এতে মেজবান বাবুরচির দেহে পাঠালেন আর জিজ্ঞসা করলেন,'সোসাও একটি কিছু যাব আছে? বাবুরচি বলল, 'তেমন কিছু না তবে এক যায়গায় মুরগি কিছুটা ডেঙে লেগে গেছে আর তা আমি পেয়ালার নিচের অংশে রেখে দিয়েছি।' এরপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, আজকের সর্বময় আলো খাবার কোনটি? বাবুরচি জবাব দিল, মুরগির স্বপ্ন। মোটকথা আমি বেশকিছুটা স্বপ্ন খেয়ে নিলাম এবং শক্তি ফিরে পেলাম।

রাতের খাবারের পর মুশী সাহেব পৃথকভাবে বসে আমার সাথে কথা বললেন এবং বিস্মৃতির জন্য চাইলেন। আমি বললাম, 'আমি পাঞ্জাবের অধিবাসী আলো' স্মৃতিতে এসেছি জন্য অর্জনের উদ্দেশ্য। আমার মনে হল, তিনি ভেবেছেন আমি একজন ধনী ও জনি ব্যক্তি যে বিপদের সম্মুখীন, আর আমার জন্য অস্বেগ একটি অজ্ঞাত মাত্র। তিনি আমাকে বললেন, যদি আমি তাঁর আত্মীয় গ্রহণ করি তবে তিনি আমার জন্য অর্জনের ব্যবস্থা করবেন। তিনি আমার ধারার জন্য একটি ঘর ব্যবহার করলেন আর লাইকেরিয়ানকে নির্দেশ দিলেন যেন আমাকে এই ব্যবহার করার অবাধ সুযোগ দেয়া হয়। তিনি আমার বসি এবং গাটির আলার জন্যও লোক পাঠিয়ে দিলেন। আর মৌলিকী আশুল কাইউম সাহেবকে আমার শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করলেন। আমি তাঁর কাছে সহিষ্ণু বুখারিও ও হেদায়া পাড়া আরুণ প্রচার করলাম।'

মুশী জামালউদ্দিন প্রত্যেক সময়ে যুক্তির শরীফের দরস দিতেন। একদিন মৌলিকী নূরউদ্দিনও দরসে উপস্থিত ছিলেন। সুরা বাকারার ৭৭ নথি আয়াত অর্থাৎ "এবং যখন তারা বিশ্বাসীদের সাথে মিলিত হয় তারা বলে: আমরা ঈমান এনেছি, কিন্তু যখন তারা পরস্পর নিঃসৃতে সাক্ষাত করে" নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল; তখন তিনি একটি বিষয় উক্তচৈতন্য অনুমতি চান। অনুমতি পেয়ে তিনি বললেন, এ আয়াতে এবং ২৪১৫ আয়াতে মদীনার মুনাফেকদের কথা বলা হয়েছে। এখানে (২:৭) তাদেরকে কেবল তাদের সাথী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ২৪১৫ আয়াতে তাদেরকে শাহীতাহ আখ্যা দেয়া হয়েছে। এ পার্থক্যের নিষ্ঠুরই কোন কারণ রয়েছে। মুশী সাহেব সীমার করলেন, তিনি এর কারণ কি তা অস্পষ্ট নন বরং মৌলিকী নূরউদ্দিনকে বিষয়টি স্পষ্ট করার অনুরোধ করেন। তিনি বললেন, মদীনায় দু শ্রেণীর মুনাফেক ছিল। একশ্রেণী ছিল ইন্দীদের মধ্য থেকে আর অপর
ধন গৌণিণিকের মধ্য থেকে। আলোচ্য আয়তে ইহুদীদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর তারা বেহেতু আহলে কিভাব তাই তাদেরকে তাদের মুনাফকে ভাইদের (পৌণিণিক) সাধ্য আখ্যা দেয়া হয়েছে। আয়ত ২৪১৫-তে গৌণিণিকের কথা বলা হয়েছে এবং শয়তান হিসেবে তাদের সমালোচনা করা হয়েছে। এই ব্যাখ্যা থেকে মুন্নী সাহেবের একটি বিশিষ্ট হন যে তিনি তার আসন থেকে সরে বলেন এবং মোলল্লী নুরউদ্দিনকে সেখানে বস দরস অর্থাৎ রাখার অনুরোধ জানান। তিনি আরও বলেন, এখন থেকে নূরউদ্দীন সাহেবই দরস দিবেন, আর তিনি তার পাদিত্ত থেকে লাভবান হবার উদ্দেশ্যে এতে অংশ নেবেন।

মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মুন্নী সাহেবের সভাপতিত্বে একবার একটি সরকারী কার্যক্রম চলাকালে, হয়ত শাহ ইসহাক সম্পর্কে কাজী একটি অসমানজনক মন্তব্য করেন। উপস্থিত মোলল্লী নুরউদ্দিন এতে খুবই অসন্তুষ্ট হন আর তৎক্ষণ্ঠ সে স্থান ত্যাগ করেন। সেদিন তিনি মুন্নী সাহেবের সাথে রাতের খাবারে যোগ দেননি। ফলে মুন্নী সাহেবও না খেয়ে রাত্রি যাপন করেন। পরদিন মোলল্লী নুরউদ্দিন আসনের নামায় কোথায় পড়তে পারেন তা তিনি জানতে চান। তাকে বলা হলো, তিনি খুবই সহায় তার বাসস্থান সংলগ্ন মসজিদে নামায় পড়বেন। মুন্নী সাহেব সে মসজিদে গিয়ে দেখেন মোলল্লী নুরউদ্দিন নামায়রত আছেন। তিনি তার ডান পাশে গিয়ে বসেন। যখন নুরউদ্দিন নামায় শেষে রোয়রি অনুচ্ছেদ ডান দিকে ফিরে 'আলারামামি আলারাকাম ওয়া রহমাতলাহ (আপনার উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্তমান হোক)', বলেন তখন মুন্নী সাহেব উৎফুল হয়ে বলেন, 'তাহলে আপনি আমাকে সালাম করে আনন্দিত।' অতঃপর তিনি হাত ধরে তাকে উঠানেন এবং মসজিদের বাইরে দাড়ানো মৌলানা গাইতের চাড় চালককে শহরের বাইরে নিয়ে যেতে বলেন। যখন তার শহর থেকে অনেকটা দূরে চলে গেলেন তাহলে তিনি অনুযায়ী সুরে বলেন, 'গতকাল আপনি আমাকেও অভিভূত রেখেছেন।' মোলল্লী সাহেব বলেন, 'আপনার উপস্থিতিতে হয়ত শাহ ইসহাক-এর অবমাননা করা হয়েছে অথচ আমি তার একবার একটিই ভক্ত।'

মুন্নী সাহেব জড়দস করেন: 'আপনি কখনো হয়ত শাহ ইসহাকের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন কি? তিনি বলেন, 'না'।

"আমি শাহ সাহেবের নিকট পবিত্র কুরআনের শিক্ষা লাভ করেছি। আমি গৌণিণী ছিলাম। দিনের আমাদের বাড়ি তার কাছাকাছি ছিল এবং প্রায়ই তিনি আমাকে শহরের পাশ দিয়ে যাতায়ত করতেন। এক পর্যায়ে আমি তার দরসে কুরআনে যোগ দেয়া শুরু করলাম এবং এর ফলাফল আপনার চেয়ে সামনে।"
হযরত মৌলভী নুরউদ্দীন (রা.) - খলিফাতুল মসীহ আউরাজ

মুলিদ সাহেব এর পর তার নিজের গৌর্ডা শিয়া থেকে নিবেদিত প্রাণ মুলিদের পরিণত হওয়ার পূর্বে বৃহত্ত বর্ণনা করে বলেন, “সুতরাং আমি শাহ সাহেবকে অভিযুক্ত সমালামের দৃষ্টিতে দেখি। গতকালের ঘটনাটি একটি সরকারি আনুষ্ঠানিক সভায় ঘটেছিল, এজন্য আমি এটা নিয়ে আর কথা বলা সম্ভবনা মনে করি। এ লোকগুলো অত্যন্ত সংকীর্ণ মনের অধিকারী। এদের কথা কে বেশি গুরুত্ব দেয়া উচিত না।”

তারা এক সাথে গত্তিতে চড়ে শহরে ফিরে এলেন এবং রাতের আহার একে করলেন। শাহী পুনর্বিভিন্ন হলো।

যেমনটি পুরুষেই উল্লেখ করা হয়েছে, মৌলভী নূরউদ্দীন (রা): মৌলভী আবুল কায়ম সাহেবের নিকট বুখারি ও হেদায়া এর পাঠ গ্রহণ করেন। সুলায়ের মুক্তি সাহেবের নিকট তিনি রসূলুল্লাহ (সা:)-এর চলিতা হাদিসের তালিম নেন মেরিয়ানা বহু শাহী ধরে বর্ষাকারীদের এর সুধীর সংখ্যার মাধ্যমে মুক্তি বর্ণিত হয়ে আসছে। এ মুক্তি সাহেব এ হাদিসগুলো মুহাম্মদ বিন নাসির হাযরামির নিকট হতে শেখেন। তিনি অত্যন্ত বুঝি ব্যক্তি ছিলেন এবং অন্য সমভিত্ত এক অনুকরণীয় দৃষ্টিতে ছিলেন। মুলিদ জামাল উদ্দীন সাহেবের নিম্নোক্ত ঘটনাটি উদাহরণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন:

“মুহাম্মদ বিন নাসির হাযরামি অসাধারণ পুণ্যবান হিসেবে সুখ্যাত ছিলেন। একবার যখন তিনি আমার কাছে বেড়াতে এলেন, আমি তাঁর সমুম্ব উপহার এক হাজার রূপির একটি থেলে রাখলাম। আমি লক্ষ্য করলাম, তিনি অসন্তুষ্ট। থেলটি দ্রুত আমার দিকে ঠেলে দিলেন। মুক্তি হেসে বললেন, ‘আমি তোমাকে চলিতা হাদিসের পড়ে শোনানোর ইচ্ছা করেছিলাম, কিন্তু যখন তুমি আমার সম্মুখে টাকা রাখলে তখন আমি বিরক্ত হলাম আর ধারণা হলো, তুমি একজন বন্ধুবানী মানুষ। যদি তোমার কাছ থেকে টাকা নিতাম তাহলে আমি তোমাকে হাদিসের শোনাতাম না।’ কিন্তু আমি এখন বুঝে পারলাম, না, তুমি একজন বিচক্ষণ মানুষ, তাই আমি সানদে তোমার কাছে এসে তোমাকে হাদিস শোনাব। আমার টাকার প্রয়োজন নেই। আমার খেজুর বাগানে আমার সকল প্রয়োজন মেটানোর মত পর্যায় খেজুর হয়। আমার কর্যকল উট আছে। আমি প্রত্যেক বছর মক্কায় হজ করতে যাই। একটি উটের গিলে আমি খেজুর বোকাই করে নেই যা আমার চাঁক্র চায়। আরেকটি উট আমি বসি যার গিলে পানিও মজার থাকে। একজন মানুষের আর কি দরকার! সব প্রশংসা আল্লাহরই।”

৩২
মুলী সাহেব বলেছেন, হায়রামী খুব দ্রুত, অনায়াসে এবং অনগ্রল কথা বলতে পারতেন। কিন্তু তার সকল কথাই কুরআন ও হাদিসতত্ত্বের হতো।

মুলী সাহেবের পারিবারিক আয় ব্যয়ের হিসাব ছিল খুব সহজ। একবার তিনি বলেছিলেন, ভূপলে তার পুরো অবস্থানকালে কখনো মাস্ত কেনার পেছনে মোটরের উপর তিন টাকার বেশি ব্যয় করেননি। তিনি দিনে একবারই পেটপুরে খেতেন আর এতেও সাথে কিছু মানুষকে আমহার জানাতেন। দৈনিক কেবল ছাগলের ছিনার এক সের মাঃশের ই প্রয়োজন হতো। প্রতিদিন সকালে তিন টাকা মূল্যে তার জন্য একটি পশ্চা করা হতো। জবাইয়ের পর এক সের মাঃশ তার বালান জন্য পুংক করে রাখা হতো। অবশ্যই মাঃশ সে স্থানে ন্যায় মূল্য বিক্রি ব্যবস্থা করা হতো। মানুষ তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রুত মাঃশ কিনে নিত আর মুলী সাহেবের হাতে বিক্রি পর তিন টাকার বেশি আসতো না। তিনি ঘরের অন্যান্য প্রয়োজন মেটানোর জন্যও অনুরূপ কাজ করতেন। কিন্তু একই সাথে তিনি ছিলেন খুবই উদার ও মুক্তহস্ত। উদাহরণস্বরূপ, তিনি শহরের অস্থায়ীর থাকার জন্য একটি বিদ্যুৎ নির্মাণ করেন। তাদের ভরণ-পোষণ তাঁর নিজ খরচ চলতো। তিনি তাদের কল্যাণে গতির অগ্রহ রাখতেন। তাদের মধ্যেই তিনি তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করতেন এবং সন্তানের মাত্র পুত্র এদের খাতিতে তিনি একটি স্থলে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

ভূপলে থাকা কালে মৌলিক মুরুদাদান একবার প্রচন্ড জুরে আক্রান্ত হলে তার মুখ দিয়ে দুর্গমস্থল কালো লালা বের হওয়া আরম্ভ হয়। তিনি হাকিম ফারসাহা আলীর পরম্পর নেন। তিনি তাকে বলেন, তিনি একটি ঘুরতর দুরারোপণ ব্যাধিতে আক্রান্ত তাই তাকে তাজ্জুড়িকভাবে বাড়ি চলে যাওয়া উচিত। ষড়কাল পরেই তাঁর কাছে একজন সমালিত ব্যক্তি আসেন যিনি ছাত্রদের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন। বয়সের কারণে তার মুখ সবসময় লালায় ভরা থাকতো। তাই তিনি তাকে একটি ব্যবস্থা প্রস্তাবনা অনুরোধ জানান। তিনি তাকে জলপাইয়ের মুর্বব্য, এলাচ দানা ও সর্বপাত সেবনের পরামর্শ দেন। তিনি অশ্লীলকুল্লুক পরেই এক বোটল জলপাইয়ের মুর্বব্য, কিন্তু এলাচটি আর সর্বপাত এনে তাকে উপহার দিলেন এবং বললেন, 'আপনার এবং আমার সমস্যা একই। তাই আমি আপনাকে প্রস্তাবিত থাক আপনার জন্য নিয়ে এসেছি যা সেবন করতে পারেন।' মৌলিক সাহেব তাকে মহানাত্মক জন্য ধননবাদ জানালেন এবং উত্তর সর্ব উপদানের মিশ্রণ সেবনের ফলে তার দ্রুত পূর্ণ আরোগ্য লাভ হয়েছে।
হযরত মৌলভী নুরউদ্দিন (রা.) - খলিফাতুল মসীহ আউরাল

একসময় তাঁর কাছে খুব ভাল কাপড়ের দুটি ওয়েস্টকোট ছিল। সেগুলোর একটি পরিধানের আগেই চুরি হয়ে যায়। তিনি এ ক্ষতিতে কোন দুঃখের বোধ করেননি বরং আল্লাহ তাঁকে আরাম উত্তম দানে ভূমিত করবেন এ বিষয়ে তিনি আন্তরিকভাবে সুরা বাকারার ১৫৭ নং আযাত অর্থাৎ, ‘যারা তাদের উপর বিপদ এলে বলে নিষ্পত্ত, আমরা আল্লাহরই এবং নিষ্পত্ত তারই দিকে আমরা ফিরে যাব’ পড়তে থাকেন আর অন্য ওয়েস্টকোটটি সদরক করে দেন। কিছুদিন পর এক ধনী ব্যক্তির ছেলে গণেরিয়ায় আক্রমণ হলে তিনি তাঁর বন্ধুকে এমন একজন চিকিৎসক নিয়ে আসতে বলেন যার তেমন একটা পরিচিতি থাকবে না। সেইটি হাকিম নুরউদ্দিনকে চিনতেন। তিনি ছেলেটিকে দেখতে যাবার জন্য তাঁকে অন্যরোধ করেন। বিভারিত পরিচয় জানার পর হাকিম সাহেব বললেন, ‘এটি তো আমার হারিয়ে যাওয়া ওয়েস্টকোট!’ তিনি সে লোকটির সাথে রোগীকে দেখতে যান আর তাঁকে একটি বাগানে বসা দেখতে পান। রোগী নিজের উপসর্গ বর্ণনা করে একটি ব্যবস্থাপনার জন্য তাঁকে অন্যরোধ জানান। বাগানে কিছু কলাগাছ ছিল। হাকিম সাহেব তাঁকে কলাগাছের পাদর সাথে চুনের মিশ্রণে মিশিয়ে সেবন করতে বলেন।

এ ছিল সহজলভ্য। রোগী তৎক্ষণ্ত মিশ্রণে তৈরী করে খেয়ে নেয়। হাকিম সাহেব চলে গেলেন, পরদিন হাকিম সাহেব তাঁকে আবার দেখতে এলে রোগী তাঁকে বলল, ঐযুক্তির প্রথম বড়োই তাঁর সুষ্ঠ করে তুলেছে তাই তাঁর আর চিকিৎসার প্রয়োজন নেই। চিকিৎসক বুঝতে পারলেন, পুরো ঘটনাটা ছিল ঐরী অনুগ্রহের ফল। পরদিন রোগীর বড়ু তাঁর কাছে আত্মজ দামী কাপড় জমির নকশা করা কিছু পোষাক ও বেশ কিছু নগদ টাকা নিয়ে ‘আসে যা রোগী ক্ষুদ্রতাতে নিদর্শনশ্রুতি তাঁর জন্য পাঠিয়েছে। চিকিৎসক পুনরায় বললেন, ‘এটিই আমার সেই ওয়েস্টকোট!’ রোগীর বড়ুটি জানতে চান ওয়েস্টকোটের রহস্য কি? চিকিৎসক তাকে পুরো ব্যাপারটি খুলে বললেন। তিনি আরও বললেন, যেহেতু ঐ দামী পোষাক তাঁর কোন কাজে আসবে না, তাই এগুলো বিক্রি করে তাঁকে টাকা ঘুরা দেয়া যুক্তিযুক্ত হবে। কাপড় ভাল দামে বিক্রি হলো ফলে তাঁর হাতে এত পরিমাণ টাকা এসে গেল যে তিনি হজের উদেশ্যে হেজাজ যাত্রার মনস্থির করলেন।

যখন ভূগল তাছাদের সময় হলো তখন তিনি মুসল্লী জামাল উদ্দিন সাহেবের কাছ থেকে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে বিদায় নেন। এরপর তিনি বেশ কয়েকজন আলেম ও অনেক সম্মানিত সাধা-সংগীতম মৌলভী আব্দুল কাইউম সাহেবের কাছে

৩৪
রূপালে কিছু দিন

বিদায় নিতে যান। বিদায়বেলা তিনি তাকে এমন কোন উপদেশ দেয়ার অনুরোধ করেন যা জীবনঘটার পথে সদা তাকে অনুপ্রাণিত করবে। তাকে বলা হলো, ‘খোদা বা খোদার রসূল হবার চেষ্টা করবে না।’ তিনি বললেন, ‘আমি এর অর্থ বুঝতে পারিনি আর আমি মনে করি আমার সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে থেকেও কেউ এটি বুঝে নি।’

“ঠিক আছে! খোদা সম্রাটে তোমার কী ধারণা?”

“জনাব, তাঁর একটি বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি যা চান তা-ই করেন।”

“সত্যি। আমি তাঁই বলতে চাচ্ছিলাম। যখন তোমার কোন পরিকল্পনা বাধ্য হয় তখন তুমি নিজেকে স্বর্ণ করবে, তুমি খোদা নও। খোদার একজন রসূল তাঁর পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট হবে থাকেন এবং জানেন, যারা তাঁকে অমান্য করবে তারা দোষের নিকট হবে। তাই তিনি তাদের অবাধ্যতায় কষ্ট পেয়ে থাকেন। কিন্তু কেউ যদি তোমার পরামর্শ অমান্য করে তাহলে তারা তাঁকে ক্রোধভাজন হওয়া আবশ্যক নয়। সুতরাং তোমার তাঁর জন্য দুঃখিত হবার কোন করণ নেই।”

রূপাল থেকে ফেরার পথে তিনি বুরহানপুরে থাকেন। সেখানে তাঁর পিতার বদুমোল্লী আবুলকাহ তাকে সল্লেহে অভ্যর্থনা জানান এবং উত্তম আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন। বিদায়বেলা তিনি তাকে একবার মিষ্টি দেন। মিষ্টির প্যাকেটটি খুলে তিনি দেখেন, এতে মদার এক সাতগম্বরের নামে এক হাজার রুপির একটি হাতি এবং কিছু নগদ টাকা রয়েছে। তিনি নগদ টাকা ব্যবহার করেন। কিন্তু হাতি ভাঙা হন।

মৌলিকী আবুলকাহ সাহেব থুব মজার কাজ বেছে নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন শাহপুর জেলার সাহিত্যবাদী। কোনভাবে হজ করার জন্য মক্কায় পৌছেন। সেখানে তাঁর জানিবার কোন ব্যবস্থা ছিলো না। তাই ভিক্ষাবৃত্তি বেছে নেন। একদিন তাঁর মনে হল, তিনি যদি অসুস্থ হন তাহলে আর কোন উপায় থাকবে না। তিনি সাথে সাথে কাঁথা শরীফে গেলেন আর কাঁথা গিলাফের একটি গ্রান্ত ধরে কাতরকষ্ট এভাবে দেয়া করেন, ‘হে আবুলকাহ! আমি তোমাকে দেখতে পাই না কিন্তু তোমার এ গুহার গিলাফ ছুঁয়ে তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি, এখন থেকে তোমার কোন সৃষ্টির কাছে কথনা ভিক্ষা চাইবে না।’ এ প্রতিজ্ঞা করে তিনি গিলাফ ছেড়ে দিলেন আর পিছনে এসে রঙে গেলেন। উপস্থিত কেউ এসে তাঁর

৩৫
হযরত মৌলিকী নূরউদ্দীন (রা.) - খলিফাতুল মসীহ আওয়াল

হাতে ছয় পয়সা রেখে গেল। যেহেতু তিনি কারা কাছে চাঁদনি তাই পয়সাগুলো গ্রহণ করলেন। দুপাই দিয়ে রুটি কিনে খেলেন আর বাকি চার পাইয়ের দিয়াশালাই ক্রয় করে তা ছয় পয়সায় বিক্রি করেন। তিনি তাঁর স্বল্প পুত্জি পুনর্নির্মাণ করে আরো দিয়াশালাই ক্রয় করে তা বিক্রি করে নয় পাই লাভ করেন। আর এ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি চার আনা বা মোল পয়সা উপার্জন করেন।

কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর দিয়াশালাইয়ের পুট্টি বেশ ভালী হয়ে যায়। এরপর তিনি মহিলাদের প্রসাধন-সামর্থ্যের ব্যবসা আরো করেন। তাঁর ব্যবসার উন্নতি অব্যাহত থাকে আর কিছু টাকা আর করে তিনি বোধেতে ফিক্রে আসেন। সেখানে তিনি কুরআন শরীফকে তাঁর পার্থিবী গ্রাম ও শহরে বিক্রি আরো করেন। তাঁর এ ব্যবসায় এতটা উন্নতি হলো, একবার তিনি উজ হাজার লুপির কুরআন শরীফ ক্রয় করে তা ভেরোয় এনে পুরোটাই মৌলিকী নূরউদ্দীনের পিতার কাছে ভালো লাভ বিক্রি করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি একজন কাপড় ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। আর বুরহানপুরে একটি বাড়ি নির্মাণ করে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস আরো করেন।

তিনি বলেন, তাঁর নীতি ছিলো খুব অক্স লাভে পণ্য প্রতি বিক্রি করা।

মৌলিকী নূরউদ্দীন বোধেতে মৌলিকী এনায়েতুলাহর সাথে সাক্ষাৎ করেন। আর তাঁকে হযরত শাহ ওয়ালিউদ্দালাহ লিখিত 'ফাউন কবির' নামক পুস্তিকার একটি কোটি সংখ্যা করে দেয়ার অনুরোধ জানান। তিনি তা পড়তে ও সংগঠন রাখতে আগ্রহী ছিলেন। পরবর্তীতে তাঁকে বলা হলো, পুস্তিকা পণ্য শীর্ষে পাওয়া যাবে। তিনি সাথে সাথে পণ্য দেওয়া তাকে একটি নেট দিয়ে বিদের নিয়ে উঠে পড়লেন। মৌলিকী এনায়েতুলাহ তাকে জিজ্ঞেস করেন, তাঁর এ তাড়া কিসের? তিনি বললেন, কোন কোন মহিলার মতামত হলো, যতক্ষণে ছাত্র বিন্যাসের কাছ থেকে বিদায় না নেয় ততক্ষণ পর্যন্ত বিক্রয় সম্পূর্ণ হয় না। তিনি তাঁর ক্রয় সম্পূর্ণ করতে চালু ছিলেন আর কোনোকিন্ত বইটি হাতছাড়া করতে রাজি নন। মৌলিকী এনায়েতুলাহ তাকে তাড়াতাড়ি ফিক্রে আসার অনুরোধ জানান। ফিক্রে আসার পর মৌলিকী তাঁর প্রতি প্রশংসা করে তাঁকে তাঁর পণ্য শীর্ষে ফিক্রে দিলেন যদিও তিনি তাকে জের দিয়ে বলেছেন, তাঁর কাছে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ আছে এবং বইটির জন্য খরচ করার যথার্থ সামর্থ্য তাঁর রয়েছে।

৩৬
হেজাজ গমন

বোধহই থেকে মৌলভী নুরউদ্দীন জেদ্দাগাম্বী জাহাজে চড়লেন। জাহাজে তিনি পাঁচজন হজ্জযাত্রী পেলেন যারা তার নিজ এলাকার অধিবাসী। তারা তাঁর দেখাতনা এবং সকল প্রকার আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করলেন। জেদ্দা থেকে মক্কা পর্যন্ত স্থানপথে সকলের বাহন ছিল উট। তিনি শুনে রেখেছিলেন, কা'-বা শরীফ প্রথম দর্শনে যে দোয়া করা হয় তা সবসময় গৃহীত হয়। তাই মক্কা আসার সময় একটি উচু স্থান হতে যখন প্রথম কা'-বা শরীফের দর্শন লাভ হলো তখন তিনি দোয়া করেন: "প্রভু! আমি সবংস তোমার সাহায্যের ভিক্ষার।" সুতরাং আমি তোমার কাছে যখনই তোমার রহমতের জন্য মিনতি করি তুমি আমার দোয়া গ্রহণ কর।" কা'-বা শরীফ প্রথম দর্শনে করা সব দোয়াই করুন হবে, এ সাধারণ বিশ্বাসটি কার মাধ্যমে প্রচলন লাভ করেছে নে বিশ্বে অবশ্য তিনি পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলেন না। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের আলোকে তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে তাঁর সে দিনের দোয়া গৃহীত হয়েছিলো।

মক্কা তিনি মখদুম নামক এক বয়স্ক ধারিক ব্যক্তির বাড়িতে অবস্থান করেন এবং তিনজন অসাধারণ জানী বাড়ির কাছে হাদিস শিক্ষা আর্থিক করেন। তিনি শেখ মুহাম্মদ খাজুরাজির কাছ থেকে 'আবু দাউদ', সাইদ হাসানের কাছে 'মুসালেম' এবং মৌলভী রহমতুল্লাহ কাছে 'মুয়াত্তা' অধ্যয়ন করেন। এ তিন জনের মধ্যে তিনি সাইদ হাসানের কাছে সবচেয়ে দীর্ঘকালে অধ্যয়ন করেন, যিনি একজন অতি স্মরণীয় মানুষ ছিলেন আর তাঁর আলাপচরিতা হাদিসের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ থাকতেন। মৌলভী রহমতুল্লাহ তাকে বলেন, তিনি সাইদ হাসানকে বিশ বছর ধরে চিনেন কিন্তু তাঁর অন্তর্গত কোন বস্তু আছে বলে তিনি জানেন না। আর তাঁর দৈনিক চাহিদা কিভাবে পূর্ণ হয় তা-ও তিনি অবগত নন। মৌলভী নুরউদ্দীন বললেন, মানুষ যখন দিকনির্দেশনার জন্য সাইদ হাসানের কাছে যেত তখন তিনি আলাহাকে 'হে বাসিদ', 'হে গোলি', 'হে হলীদ' কিংবা 'হে মালিদ' নামে ডাকার অভ্যস গড়ে তোলার পরামর্শ দিতেন। তাঁর এ উপদেশের পিছনে কি প্রজা ছিলো সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন বলে নুরউদ্দীন মনস্থির করেছিলেন। কিন্তু তাঁর স্মরণীয়তার কারণে নুরউদ্দীন সে কুকি আর নিলেন না।

মৌলভী রহমতুল্লাহ ছিলেন একজন বিদ্যমান আলেম, যিনি ধর্মীয় বিদ্যা, বিশেষ করে প্রচলিত থুষ-মতবাদের অসাধারণ প্রমাণের ক্ষেত্রে বিশেষ বিশ্বাস দক্ষতা 37
হযরত মৌলিক নুরউদ্দিন (রা.) - খলিফাতুল্লা মসীহ আউয়াল

রাখতেন। অধিকাংশ আলেমের নয় তিনি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তীর্যক মন্তব্য করতেন না। এমন কি প্রতিপক্ষের নিতান্ত হঠকারিতাপূর্ণ নির্যাস আচরণের মুখেও কখনো ধৈর্য হারান নি বরং হাসি মুখে ন্যূনভাবে কথা বলতেন।

শেখ মুহাম্মদ খায়রাজি সিহাহ সিদ্যার একজন সুদখ্য আলেম ছিলেন। একবার আরু রাল্লাহের পড়া গিয়ে, ইতিকাফের সময় কখন আরস্থ হয়, এ নিয়ে ছাড় ও শিক্ষকের মাঝে সামনা মতপার্থিক দেখা দিলে, শেখ মনে করলেন প্রশ্নটি কল নি। যদি ইতিকাফ একবিংশতম রোয়ার সকল থেকে আরস্থ হয় তাহলে লাইনাতুল কুদরের রাত হিসেবে পূর্ববর্তী রাত বাদ পড়া আশঙ্কা থাকে।

অপর দিকে এটি বিংশতম রময়কের বিকাল থেকে আরস্থ হওয়া সত্য নয় কেননা নয় করীম (সা!); ইতিকাফ সকল থেকে আরস্থ করা পছন্দ করতেন। মৌলিক নুরউদ্দিন মন্তব্য করেন, এতে কোন জটিলতা নেই। ইতিকাফ বিংশতম রোয়ার সকল থেকে আরস্থ করা যেতে পারে। শেখ মন্তব্য করেন: 'এটি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনমতের বিরুদ্ধে যাবে।' মৌলিক নুরউদ্দিন বলেন, জনার আমি মেতেকায় সম্পর্কিত ইমাম আহমদ বিন হাসিলের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি বিন্নভাবে অপনার মনোযোগ আকর্ষণ করছি। এটি শুধু একটি বিষয় দৃষ্টিভঙ্গির সংখ্যাগরিষ্ঠ মুক্তিদের মতামত বে কিছু নয়।' এ কথা শেখকে প্রদর্শ করে এবং তিনি রাজুনের অবশিষ্ট সময় আর কোন কথা বলেন নি। বিকেলে মৌলিক নুরউদ্দিন, মৌলিক রহমতুল্লাহর কাছে পড়তে গেলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কি আম সকলে তোমার শিক্ষকের সাথে কোন বিষয়ে তর্ক করেছ।' তিনি বলেন, 'জনার একজন ছাত্র ও শিক্ষকের মাঝে কোন বিষয়ে বিতর্ক হতেই পারে না। আমি একজন ছাত্র মাত্র। শেখ একজন খোদাতুর্র মানুষ। আমি কেবলমাত্র একটি বিষয় স্পষ্ট করতে চেয়েছিলাম।'

'এটি কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হবে হয়ত। শেখ আমার কাছে এসে বলছিলেন, কিছু ছাড় আছে যারা অতি বেশি সাহসী এবং সমস্তকে সূত্র করে।' এরপর তিনি পুরো ঘটনা আমার কাছে বর্ণনা করেন।

'জনার এটি একটি সামান্য ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান বিষয়ক প্রশ্ন। একবিংশতম রময়কের প্রভাতের পরবর্তে যদি বিংশতম রময়কের প্রভাতে ইতিকাফ আরস্থ করা হয় তাহলে উক্ত বিষয়ে বিভিন্ন হালিস যে অসামঝুস্য দেখা যায় এর অবসান ঘটতে পারে।'।

'কিছু সেটি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনমতের বিরুদ্ধে যাবে।'

'জনার, এ সামান্য বিষয়ে কিবা মেতেকা থাকতে পারে?'

৩৮
হেজাজ গমন

“ঠিক আছে, আজকের পাঠটি আগমীকাল পর্যন্ত মূল্যবিরূপ রাখা হোক। আর চলো আমার বাড়ী যাই!” তারা যখন কাবার আগমন প্রবেশ করলেন তখন মৌলিক নুরউদ্দীন কাবার দিকে ইঙ্গিত করে প্রশ্ন করলেন, “জনাব মানুষ নামায়ে যখন সেজাদা করে খ্রিস্তানুরমুহুর হয় কেন?”

“নবী করিম (সাহ)-এর এরপাই নির্দেশ।” “জনাব, আপনি ইহুদী ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে ভালভাবে অবগত আছেন, আর এটাও জানেন যে, সকল নবীর মতে বনী ইস্রাইলের খ্রিস্ট ছিল জেরুজালেম। প্রশ্ন হলো, আপনি একজন নবীর নির্দেশের জন্য অন্য সকল নবীকে কেন উপেক্ষা করলেন? একটি সামান্য বিষয়ে আমি যদি কোন হাদিসের ব্যাখ্যা দিতে পারি তাহলে আমি কি এমন কৃতি করলাম?”

“আমার এ বিষয়ে কিছু দ্বিধাধন্দ রয়েছে।”

“কিন্তু যার হদয় এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই তার সম্পর্কে আপনি কি বলবেন?”

“যাই হোক, আমি তোমার শিষ্কের কাছে তোমার ব্যাপারে সুপরিশ করেছি আর তাকে আশ্রয় করেছি। তুমি নির্দিষ্ট তার সাথে পুনরায় তোমার পাঠ চালিয়ে যেতে পারো।”

এরপর মৌলিক নুরউদ্দীন শেখ মুহাম্মদ খাযরাজীর কাছে নিসাঙ্গ, ইবনে মাজাহ ও আবু দাউদ-এর পাঠ সম্পর্কে জানলেন। এ সময়ের মধ্যে হযরত শহীদ আব্দুল গনী মুজাহিদের মুখ্যা থেকে মতা প্রভাবগমন হয়।

তাঁর আপনার কথা মজায় ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় এবং তাকে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দেশ্যের সাথে সাদরে অভ্যর্থনা জানানো হয়। মৌলিক নুরউদ্দীনও তাকে প্রস্তাগলি জানাতে যান। তিনি তখন কাবার চত্বরে স্বজনীন তফতকুল পরিবেশিত অবস্থায় বসে ছিলেন। মৌলিক নুরউদ্দীন সালাম জানানোর পর কোন ভূমিকায় না গিয়ে সারা সারা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “জনাব, ইতিকাফ কখন থেকে শুরু হওয়া উচিত?”

তিনি নির্দিষ্ট জবাব দেন, “বিংশতম রনমায়ের সকাল থেকে।”

মৌলিক নুরউদ্দীন এতে যারপরনায় আনন্দিত হন এবং তাঁর মহাত্মা ও সমুদান মর্যাদায় খুরাব অভিভূত হন। তিনি তখন বললেন, “জনাব আমি শুনেছি এ মত সংখ্যাগার্থে মতামতের বিরুদ্ধে যাবে।”

একথা হোন শাহু সাহেব খুব অদুর্ব্যাপে জবাব দিলেন, “অভিভূতা একটি বড় মাৰ্যাত্বক ব্যাধি।” এর পাশাপাশি তিনি হানাফী, মালেকি, শাফী ও হামলী।

৩৯
হযরত মৌলভী নূরউদ্দীন (রা.) - খলিফাতুল মসীহ আউয়াল

মতবাদের বিভিন্ন মুফ্তিয়ের নাম উল্লেখ করেন যারা একই মত পোষণ করতেন।"  

এত ব্যাপক পার্থিবতার উপযুক্ত মন-মানসিকতা মৌলভী নূরউদ্দীনের মনে তাঁর জন্য প্রশংসা ও ভক্তির জন্য দিল। একপাশে সবে গিয়ে তিনি তাঁর সফর সংগ্রহ হিসেবে মদিনায় গিয়ে তাঁর অধিনে ও তত্ত্বাবধানে পড়ার অনুমতি চেয়ে একটি চিরকুট লিখেন। পত্র পাঠের পর শাহু সাহেব উত্তর পাঠান, মক্কায় তাঁর পাঠ সম্পন্ন করেই তবে তাঁর মদিনায় যাওয়া যুক্তিসঙ্গত হবে।

মৌলভী নূরউদ্দীন এসব ঘটনা মৌলভী রহমতুল্লাহের জন্য আর বলেন, "সত্যিকারের জানাজার এমনই হয়ে থাকে। আমাদের শেষে ছিলেন তীরু। কিন্তু শাহু সাহেবের কাছে প্রদান সহজ লোকের সামনে তাঁর নিজের দৃষ্টিভঙ্গী ব্যক্ত করেন আর কেউ তা বাকা চেয়ে দেখেনি।"

মৌলভী রহমতুল্লাহ মন্ত্রা হলো, "শাহু সাহেব একজন অনেক বড় আলম।"

একবার মৌলভী নূরউদ্দীনের এক শিক্ষকের মাতা অসুস্থ হয়ে পড়েন আর রোগ দীর্ঘকাল হয়। রেশ করে তাঁকে জন চিকিৎসক পরিবর্তন করেও কেন কাজ হচ্ছিল না। শিক্ষক তখন মৌলভী নূরউদ্দীনকে তাঁর কোন পরিচিত চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করতে বলেন। তিনি স্বয়ং যে একজন চিকিৎসক সে পরিচয় গোপন রেখে একটি ঈশ্বর প্রতিষ্ঠাতা করেন যা ব্যবহারের ফলে দু’তিন দিনের মধ্যেই রোগী সুস্থ হয়ে উঠে। শিক্ষক কোন দিন সে চিকিৎসকের পরিচয় জানতে পারেন নি।

মদিনায় যাবার প্রস্তুতি যখন সুসম্পন্ন হলো তখন নূরউদ্দীন মক্কায় বসবাসকারী ভেরার একজন সহপাতির কাছে একটি বড় টাকার অর্থ এবং কিছু মালপত্র জমা রেখে যান। টাকাটাতার ব্যবসায় খাটাতে বলেন আর বলে যান, যখন ফিরে আসবেন তখন ব্যবসায় লাভ বাদে তিনি ধূলু তাঁর মালপত্র ও মূলধনতুকু ফেরত নিবন্ধ। মদিনায় তিনি হযরত শাহু আবুল গনিয়ের কাছে উপস্থিত হলে তিনি তাঁর জন্য বসস্থানের ব্যবস্থা করেন। কিছুদিন পরে তিনি শাহু সাহেবকে আয়াতের গুরু হিসেবে তাঁর সমাজে মোতাবেক মোতাবেক করেন। শাহু সাহেব এ শীর্ষে অনুমোদন করেন যে তিনি কমপক্ষে তাঁর কাছে ছয়মাস অবস্থান করবেন। তিনি তাঁকে কুরআনের শরীফের নিম্নোক্ত আয়াতগুলোর প্রতি মনোনিবেশের নির্দেশ দেন; ‘এবং আমরা জীবনশৈলের চেয়ে তাঁর অধিক নিকটতর’ (৫০:১৭)। কিছুদিন পর এ আযাতটিও যোগ করেন; ‘তোমরা
হেজাজ গমন

যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সাথে আছেন’ (৫৭৪৫)। এমন মনোনিবেশের সুবাদে তিনি স্বপ্নে ঘনায়ন নবী করীম (সা২)কে দর্শনের সমান লাভ করতে থাকেন এবং কোন কোন বিষয়ে নিজ আধ্যাত্মিক শৈলীয়ের পরিভাষা সম্পর্কে অবগত হয়েন। তিনি শাহ সাহেরের নিমিত্তে পুরো মায়াপার উপকূল হতে থাকেন।

তিনি বিচ্ছিন্ন, বল্লভারী, অতি দুরদৃশ্যসম্পন্ন ও অগাধ পাপফুলায় অধিকারী ছিলেন। তিনি তাকে বুখারী, তিরিমিয়া, মাওলানা রুমীর মসন্দী ও কাশিয়াগুহ পড়ান। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সজ্জন।

একবার মৌলিক নূরউদ্দীন তাকে জিজ্ঞেস করেন, সুনামদের চার্ট মাজহাবকে তিনি কিভাবে দেখেন। তার জবাব ছিল, “সবচেয়ে বেশি পরিচিত হচ্ছে আবু হানিফার মায়াপার, সবচেয়ে ব্যাপক হচ্ছে মালেকের মায়াপার, সবচেয়ে সুদৃশ্য হচ্ছে শাফিকর মায়াপার, সবচেয়ে সম্পূর্ণ হচ্ছে আহমদ বিন হাজরের মায়াপার।”

প্রতি দিন তার বাধ্যতায় তাক কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করা হতো এবং তার কোন কোন অনুসারী ‘লা ইলাহা ইলাহাও’ দিয়ে উনিশ হাজার বার পাঠ করতেন। তাদের একজন শাহ সাহেরের কাছে অডিয়োগ করলেন, নূরউদ্দীন আধ্যাত্মিক অনুপাতের প্রতি তোতা মনোযোগ নয়। তাছাড়া সেসব নামায় ইমাম জেরে ফাতেহা পাঠ করেন সেসব নামায় তিনি ফাতেহা পাঠ করেন এবং তিনি নামায়ের বিভিন্ন অংশে হাত উঠানোকে সমর্থন করে থাকেন। একথা শুনে শাহ সাহের রাগাপরিত হয়ে বললেন, “বেশ, বুখারী শরীফের যেখানে ইমামের উইচাবারে সুরা ফাতেহা পাঠের পাশাপাশি মুহাদদির সুরা ফাতেহা পাঠ এবং নামােকের বিভিন্ন অংশে হাত উঠানোর প্রমাণ রয়েছে তা ছুরি দিয়ে কেটে বাদ দাও। একই সাথে ‘লা ইলাহা ইলাহাও’ দৈনিক উনিশ হাজার বার পাঠ করার নির্ভরযোগ্য সুত্র যদি থাকে তাকে দেখাও আমি নিশ্চিত তিনি তাই পড়বেন।”

এরুথা সমালোচকদের মুখ বস্ত করে দেয়।

মৌলিক নূরউদ্দীনের পাশের ঘরে মৌলিক নবী বক্তা চিশ্তি নামে জামগুরের এক অন্ত্রালক বসবাস করতেন। নবী করীম (সা২)কে জানাত অবস্থায় দর্শনের (কাশুফ) একলা বাসনাই ছিল তার মদিনায় বসবাসের উদ্দেশ্য। তার মৃত্যুর ঘটনা, দেওয়ার নামায় এক রাকুত পড়া যায় না। মৌলিক নূরউদ্দীন তাকে এর বিপরীতে বুখারী সক্ষম হয়েছে। রহমান পর মৌলিক নূরউদ্দীন নবী করীম (সা২)কে স্বপ্নে দেখেন। তিনি (সা২) তাকে বললেন, ‘তুমি আমার গুহে নিম্নের কিন্তু আমি নবী বক্তাের জন্য অতি উদ্ধুল।’ মৌলিক নূরউদ্দীন বক্তালকপুর ৪১
হযরত মৌলিকী নুরুদ্দিন (রা.) - খলিফাতুল মসীহ আউয়াল

দিন নবীর অবস্থার উপর দৃষ্টি রাখলেন কিন্তু তিনি তার ঘরে গেলেন না।
যখন তিনি তার মুখোমুখি হলেন, তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তার কোন সমস্যা
আছে কি না? তাকে কিছু টাকাও সাথিলেন। তিনি স্বীকার করলেন, তিনি খুবই
কঠিন সময় অতিবাহিত করেন, কিন্তু সম্প্রতি একটি কাজ পেয়ে সৎসামান্য
অর্থ উপার্জন করেছেন, যা তাকে কিছুটা সমস্যাসমূহ করেছে, এখন আর তার
অভাব নেই।

মদীনার একজন তুর্কি নাগরিক যার একটি বিশাল প্রস্থাগার ছিল তিনি
মৌলিকী নুরুদ্দিনের ভক্ত হয়ে যান আর তার কুরআন প্রচেষ্টা সহজ হয়ে তাকে
তার পছন্দের যে কোন বই ধার নিয়ে পড়ার প্রস্তাব দেন। নুরুদ্দিন তাকে এমন
কিছু বই দিতে বলেন যা কুরআন শরীফের, নাসেখ-মনসুখ সম্পর্কিত বিষয়ে তাঁর
জ্ঞান বৃদ্ধির কারণ হবে। তিনি তাকে এমন একটি বই এলে দেন যাতে প্রায়
ছয়শত আযায় রহিত হবার সম্পর্কে দৃষ্টমাত্র ব্যক্ত করা যায়। এতে তিনি মহত্ত্ব
হয়ে যান। তাঁর বদূর তখন তাকে 'এতুতান' দেন যা থেকে তিনি জানতে পারলেন,
কেবল উদ্যোগটি আযায় রহিত হয়েছে। তিনি এতে খুব আনন্দিত হন এবং শাহ
ওয়ালিউদ্দৌহর 'ফাওয়ুল কবর' পাঠের কথা ভাবেন, যা তিনি বোঝতে করে
করেছিলেন, কিন্তু পড়া হয়নি। যখন তিনি আবিষ্কার করলেন যে শাহ
ওয়ালিউদ্দৌহরের মতে কেবলমাত্র পাঁচটি আযায় রহিত হয়েছে, তাঁর মন আনন্দে
ভরে গেল। তিনি নিষ্ঠুর হলেন, নাসেখ-মনসুখের বিষয়টি মানুষের নিজক
ব্যক্তিগত মতামত ও নিজের বোধ-রূপের ফলস্বরূপ তাঁকে খুঁত নয়। পরবর্তীতে তিনি
পুরো ব্যাপারটির সামাধান খুঁজে পেয়েছেন এবং নিষ্ঠুর হন যে কুরআন শরীফের
একটি আযায়তও মনসুখ বা রহিত হয়নি।

মদীনায় সরকারী পদস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যে নিষ্ঠা ও সততার অভাব দেখে
তিনি মর্মহাত হয়েছিলেন। তাঁর একজন বদূর মদীনায় অভ্যাসগতদের সুবিধার্থে
একটি বড় পাশ্চাত্য স্কুলের উদ্বোধন দেন এবং এ কাজে বিপুল অর্থ ব্যয়
করেন। কাজী তার কাছে একশত পাউন্ড ধার। তিনি শাহ আবুল নীরার
কাছে পরামর্শ চান। তিনি তাকে বলেন, টাকা ফেরত পাওয়া যাবে না। তিনি অর্থ
দিতে বিধা করেন। পরদিন কাজীর দপ্তর থেকে তিনি একটি নোটিশ পেলেন
যে পাশ্চাত্য স্কুলটি একটি সড়কে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে যা নবী করিম (Sāhīb)-এর
শিক্ষার প্রতি। তাই পাশ্চাত্য স্কুলের কাজ বন্ধ রাখা হয়। এতে তার
পরিকল্পনা বাধ্যবোধ হলো। তিনি তার এক বদূর পরামর্শ চান যিনি তাকে জেনে উঠে
বৃতিশ দূতের শরণাপন্ন হবার প্রস্তাব দেন। দূত কাজীর কাছে পত্র লিখেন। এর
হেজাজ গমন

প্রেক্ষিতে কাজী এ মর্মে অপর একটি নেটিশ জারি করেন, যেহেতু তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে, উক্ত সড়কটি আর ব্যবহৃত হচ্ছে না তাই প্রতিবন্ধকতার প্রশ্নই উঠে না। সুতরাং পাশ্চাত্য নির্মাণের অনুমতি দেয়া হলো।

একবার এক ব্যক্তি শাহ সাহেবের কাছে এসে অভিযোগ করেন, তিনি মদিনায় হিজরত করেছেন কিন্তু তিনি দেখান যে মদিনার পরিবেশ দুঃখজনক। শাহ সাহেব একাংশ বিবর্তের সাথে বললেন, “আমিও মদিনায় হিজরত করেছি। যদি তেমনি হিজরত নবী করীম (সা)৷-এর সাহচর্যে বসবাসের প্রেরণায় হয়ে থাকে তাহলে তুমি তা পাচ্ছ। কিন্তু যদি হয়ত আয়ু বকর, হয়ত ওমর, হয়ত উসমান ও হয়ত অলাইহ সান্ন্যাস পাবার উদ্দেশ্যে এখানে এসে থাকতে তুমি তাদেরকে পাবে না। তাদেরকে পেতে হবে বরং অন্য কোথাও যাও।”

একবার যুবর নামায বাদ পড়ার কারণে মৌলভী নূরুদ্দিন এতটা মর্মান্ত হন, যেন তিনি ক্ষমার অযোগ্য কোন কবিরা গুনাহ করেছেন। তিনি ভ্রম ও ব্যাধিত হদের দিশায় ‘ছাউমের ঘর’ পথে মসজিদে প্রবেশ করলেন যার উপরে এ আবার লিখেছি; ‘তুমি বল! হে আমার বাণ্ডারা যারা নিজেদের প্রাণের ওপর অন্যায় করেছে, তারা আবাহ্ত হয়ে থেকে নিরস্থ হয়ে না। নিচ্ছয়া আল্লাহ সকল পাপ ক্ষামা করেন। নিষ্ঠা তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু’ (৩৯৫৪)।

এমনকি এ ঐ নিশ্চয়তাতেও তার মনকে আহ্বান করতে পারেনি। তিনি মিধর ও নবী করীম (সা)৷-এর কামরার মধ্যে একটি স্থানে দাঁড়িয়ে নামায পড়া আরম্ভ করলেন। রুক্ষতে তার মনে পড়ল, নবী করীম (সা)৷ মিধর ও তার কামরার মধ্যে হৃদের কেহেশ্টের বাগানের অংশ তুল্য আখ্যায়িত করেছে। আর এভাবে তিনি বেহেতে অবস্থান করিয়েছেন। আর এভাবে তিনি আকাঙ্ক্ষা করেন তাই পাবেন। সুতরাং তিনি তাঁর ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

মক্কা থেকে মদিনা সফরকালে তিনি লক্ষ্য করলেন, প্রায়শই বেদুইন উচ্চালক ও তাদের ভারতীয় যাত্রীদের মধ্যে মহিলাদের যুগ্ম হয়ে, যা তাদের মধ্যে অপ্রতীক পরিলম্বিত সৃষ্টি করে। তবে-চিতে তিনি এর দুটি কারণ বুঝে পেলেন যা এ পরিলম্বিত জন্য মূলত দারী। প্রথমত ভাবের আদান প্রদানের উপযুক্ত মাধ্যমের অভাব। ভারতীয় হাজীদের আর্বী ভাবে জানো না থাকার মাত্র। অপরদিকে বেদুইনরাও ভারতীয় ভাবা বুঝতো না। দ্বিতীয়ত আরবের প্রথা অনুসারে সকলেই খাবার জন্য আম্বিকা হতো। তাই প্রায়ই যা ঘটত তাহলে কোন যাত্রী কর্তৃক চালককে দেয়া সীমিত খাবারে কয়েকজন ভাগ বা সাত যার ফলে কেউই পেতে পেতে না। আর সবই ক্ষুধার্থ থেকে যেতো এবং বিশ্বাসঃ হয়ে যেতো।

৪৩
হযরত মৌলিকী নূরউদ্দিন (রা.) - খলিফেতুল মসীহ আউয়াল

প্রথম সমস্যাটি মৌলিকী নূরউদ্দিনের কেন্দ্রে প্রয়োজা ছিল না। দ্বিতীয় সমস্যাটি এড়ানোর জন্য মদিনা থেকে ফিরতি যাত্রায় তিনি সতর্কতাবর্ধন গ্রহণ পরিমাণে খেতে সাথে নেন। প্রত্যেক মাঝারে তিনি তাঁর উট চালককে দুঃখ ভরে দূবার খেতে দিয়ে দিয়ে। এড়ে তাঁর খাওয়া ভালই চলতো আর মন মেজাজ প্রফুল্ল থাকতো। ফলত সে তাঁর আরাম ও প্রয়োজনকে আচ্ছ করে আত্মরক্ষাতে তাঁর সেবা করতো।

মকর কাছে আসার পর তাঁর মনে পড়লো, নবী করিম (সাহে)-এর হাদীসে উল্লেখ আছে, তিনি (সাহে) 'কাদা'র দিক দিয়ে মকরা প্রবেশ করেছেন। কিন্তু যখন দেখলেন, মালপত্র বোঝাই উট ও গাঢ় সে পথে আগাতে পারবে না তখন তিনি তাঁর উট থেকে 'বী তাওয়া'(স্থানের) একটি আগেই নেমে গেলেন আর 'কাদা'র পথ ধরে মকরা প্রবেশ করলেন। তিনি দেখলেন, খুব অল্প সংখ্যক লোকই এমন করেছ।

মকর তিনি যখনই উমরাহ করতে চাইতেন তখন গৃহেই ইহরাম (হাজির নিদর্ধ বস্ত পরিধান) বেঁধে নিতেন। এটা সেখে তাঁর মজবুত শূলাস্পদ মখদুম তাঁকে পরমশ্র দেন, তাঁর 'তানুম'এ গিয়ে ইহরাম বাঁধা উচিত।

তিনি বলেন, হাদীসে সেখানে নির্দি রয়েগা সূত্র উল্লেখ আছে যে, মকরবাসীরা মকরাতেই ইহরাম বাঁধতে পারে সেখানে শহরের বাইরে ছয়-সাত মাইল যাওয়াটা অপ্রয়োজনীয়। এ কথা তাঁন মখদুম দুখ গেলেন আর বললেন, “আপনি শহরবাসীর রীতি বিহিত কাজ করছেন এবং তাঁদের বিরুদ্ধে যাচ্ছেন।” তিনি মন্তব্য করেন, তিনি শহরবাসীর বিরোধিতা করতে চান না; কেবল গাঢ় চালকদের বিরোধিতা হবে,তাদের আর কিছুটা কমে যাবে। এতে মখদুম হেসে ফেললেন, ফলে উমরা দূর হলো।

হজু সম্পন্ন করে তিনি তোরার সহায়ি কাছে গিয়ে মালপত্র ও অর্থ ফেরৎ চাইলেন। তাঁকে দুইকরার কোষশে এড়ানোর চেষ্টা করা হলেও তাঁর দুঃখতার কাছে নিতে বীরী করে অবশেষে সে তাঁকে একটি বিরুদ্ধ তালাবদ্ধ বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে বলল, “আমি তোমার মালপত্র আর অর্থ এ বাড়ীর মালিকের কাছে প্রত্যাহার রেখেছিলাম। এখন আমি জানি না সে কোথায় গেছে।” তারা যখন কথা বললেন, তখন একজন আরব এসে জিজ্ঞেস করল, “কি ব্যাপার?” মৌলিকী নূরউদ্দিন বললেন, “আমার মালপত্র এ বাড়ীর মালিকের কাছে প্রত্যাহার আছে। আর এটা আশ্চর্যজনক বিষয় যে এতবড় বাড়িটা তালাবদ্ধ।” আরব লোকটি জিজ্ঞেস করল, “এ ভারতীয় কেন এখানে দাড়িয়ে আছে?”

88
হেজাজ গমন

"সে-ই আমার মালপত এখানে রেখেছে।" এটা শুনে আরব লোকটি ক্রোধাধিত হয়ে বলল, "এ ব্যক্তি একজন মিথ্যাবাদী আর প্রতারক। সে তোমার অর্থ আর মালপত আত্মসাৎ করেছে। এ বাড়ির মালিক একজন সমানিত নাগরিক, তিনি তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে তাদের বসবাসের বিদায় জানাতে জেনে গেছেন, আর যতদিন না সকল হাজি নিজ গুহার উদ্দেশ্যে রয়েন। হবে ততদিন তাঁরাও ফিরবেন না।"

আরব লোকটি মৌলভী নূরউদ্দীনের সাথে ভদ্রতাও হ্রদ্যতা বজায় রেখে কথা বলল আর তাঁর সহপাঠীকে চরমভাবে অপমান করলে। সে লজ্জায় মাথা নে করে নিষ্পুঞ্জ দাঁড়িয়ে ছিল। আরব লোকটি বলল, "মক্কায় এমনটিই হয়। এ ভারতীয়রা আমাদের দুর্নীতি করে রেখেছে আর সংশোধনের কোন ইচ্ছা এদের নেই। জনাব, এই ব্যক্তি আপনার সকল অর্থ আর মালপত এক বাঙালি মহিলার পিছনে নষ্ট করেছে আর এ ধরনের কাজের পিছনেই ছটছে। আপনি কোন কিছুই করেছ পাবেন না।"

পরবর্তীতে তাদের উভয়ের শিক্ষক যখন হজ্জের উদেশ্যে রওয়ানা দিয়েছিলেন, মৌলভী নূরউদ্দীন তাকে সতর্ক করে দেন, অন্য কারা উপর বিশ্বাস না করে নিজের মালপতের দেখাতেন তার নিজস্বই করা সম্ভব হবে। হজ্জ থেকে ফিরে সে শিক্ষক মৌলভী নূরউদ্দীনের প্রতি তাঁর উপদেশের জন্য কৃতজ্ঞতা জাপন করেন যা তাঁকে তাঁর প্রাক্তন ছাত্রের প্রতিকূল থেকে রক্ষা করেছে।

মদুমদ সাহেব একজন বয়ঃ মানুষ আর তাঁর স্ত্রী ছিলেন অন্য বয়ঃ একজন খুব সুদৃষ্ট মহিলা। একদিন মৌলভী নূরউদ্দীন তাকে বললেন, "আমি আপনাকে দুটি প্রশ্ন করতে চাই। প্রথমটি হলো, 'আপনি কি আপনার অসংখ্য সৌন্দর্য সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত?'

"নিষ্ক্রিয়ই। আমি এটাই সচেতন যে পুরো মহিলাতে আমিই একমাত্র মহিলা যে কোন প্রকার রুপচার করে।""

"আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, 'আমি লক্ষ্য করেছি আপনি মদুমদ সাহেবের সুখ-সাধনের বিধানকল্পকে কেনের পরিশ্রম করেন। তিনি যথেষ্ট বয়ঃ আর আপনি কম বয়সী। তাঁর প্রতি আপনার প্রাপ্তি ভক্তি আমাকে বিস্ময়াবিভূত করে।'"

"তিনি যদি বয়ঃব্যূঢ় না হতেন তাহলে আমি এটা পরিশ্রম করতাম না। স্বামী হিসেবে তিনি যেহেতু আমার জন্য খোদার দান, তাই তাঁর প্রতি সর্বনাশ আচরণ আর তাঁর আরাম-আয়শের ব্যবস্প করা আমার দায়িত্ব।'"
হযরত মৌলভী নুরউদ্দীন (রা.) - খলিফাতুল মসীহ আউয়ালান

মৌলভী নুরউদ্দীন বর্তমান, যুবকতার মহিলাটি পৃথ্বী ও কল্যাণের শিখরে উপনীত। তিনি মধুম সাহাবকে জিজ্ঞাসা করেন, “আপনি কি আপনার ক্রীর প্রতি পুরোপুরি সক্রিয়?” তিনি জবাব দেন, “আমি তাঁর সত্যতার কসম খেতে পারি। তিনি আমার আরাম-আয়নের প্রতি খুবই সচেতন আর তিনি তাঁর সাদেকা (পুনর্বার) নামের প্রতি পুরোপুরি সুবিচার করছেন।”

মৌলভী নুরউদ্দীন বইয়ের বিষাল ভাষার নিয়ে বোঝাতে পৌঁছলেন। তিনি বই বোঝাই বাঁকুলো লাহোরের উদ্দেশ্যে পোষ্ট করলেন, যার পরিবহন মাধ্যম পরিশোধ করার কথা ছিল বই বুঝে নেবার সময়। তাঁর চিকিৎসাবিদ্যার শিক্ষক দিলীতে অবস্থান করছেন জেনে তিনি দিলীতে যাত্রা-বিরতি করেন। তিনি প্রডার নিদর্শনস্বরূপ তাঁর সাথে দেখা করতে গেলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, “তুমি হেজাজ থেকে কি এনেছ?” তিনি তাঁর সম্পূর্ণ কিছু বইয়ের নাম উল্লেখ করলেন। তাঁর শিক্ষক বললেন, “সেগুলো আমার কাছে নিয়ে আস।”

“জনাব আমি সাংসদে তা করবো। কিন্তু সেগুলো লাহোরের উদ্দেশ্যে পোষ্ট করা হয়ে গেছে। লাহোর পৌঁছে আমি তা আপনার কাছে পাঠাবো।”

তিনি বললেন, “আমিও লাহোর দেখতে চাই, চল আজই একবার লাহোর যাই।”

তিনি সাংসদে তাঁর সাথে লাহোর গলেন এবং লাহোরের যুগে দেখালেন। মহানভর শিক্ষক উপলব্ধিত বইগুলো নিজেই পরিবহন মাধ্যম পরিশোধ করে গ্রহণ করলেন এবং তাঁর ঘিরি প্রাক্তন হাতের হাতে এ বলে হস্তান্তর করলেন, “আমি এখন ব্যবস্থা নিয়েছি মেনে এ বইগুলো তোমার হাতে আসার ক্ষেত্রে আমারও একটা ভুমিকা থাকে।”

আসালে মৌলভী নুরউদ্দীনের কাছে সে সময় পরিবহন মাধ্যম পরিশোধের মত অর্থ ছিল না। তিনি যখন তাঁর শিক্ষককে বিদায় জানাতে গেলেন, তখন সড়ক পরিবহনের কয়েকটি ইউনিটের মালিক, ভরোসাসী এক হিন্দুর সাথে তাঁর দেখা যিনি ভ্রমণে গিয়ে পরিবহন মাধ্যম গ্রহণের শর্ত তাঁর সব মালপত্র ভরায় পৌঁছে দেয়ার প্রস্তাব দিলেন।
ভোরায় চিকিৎসা পেশা

ভোরায় পৌছায় মৌলভী নূরউদ্দিনকে শহরের হিন্দু ও মুসলমানদের এক বিশাল জনতা কর্তৃক স্বাগত জানানো হয়। তিনি খুব পিয়ত্রই হাড়া হাড়া টের পেলেন যে উপরতা, চক্রান্ত এবং অবিবাহ শহরের পরিবেশ সর্বম ছেয়ে আছে। মুসলমানদের মধ্যে বাহিকায় ও প্রথাগত আচার-অনুষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট তুচ্ছ বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দেয়ার জোর প্রবৃত্তি রয়েছে। কিন্তু উন্মত্ত নৈতিক গুণাবলী ও আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রচেষ্টা সম্পূর্ণভাবে হরিয়ে গেছে। তাকে ধর্ম সম্পর্কে বহুবার বিভিন্ন অনুপ্রাণিত, বৃত্তি, বৃহত্তে ও অত্যন্ত মূল্যবান আলোচনায় জড়ানো হয়েছে, যে কারণে তার বুদ্ধিভূমি উদার দৃষ্টিকোণে মায়াকর্ম অপরাধীবোধে জরায়ুরিত হয়। তাকে সতর্ক করা হয়, তিনি যদি এসব বিষয় প্রচ্ছদিত ও জনপ্রিয় ধারণায় সাথে খাপ না খাওয়ান তাহলে তার জন্য জীবনের দুর্বিষাদ করে তোলা হবে। তাকে প্রায়শই কৌশলে চরম বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে ঢোলে দেয়া হতো যেখান থেকে তিনি খোদাইপ্রদত্ত বিচার-বুদ্ধি, দক্ষতা, সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধির মাধ্যমে নিজেকে মুক্ত করতেন। অনেকেই ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য তার কাছে আসতে তিনি তাদেরকে কোন বিনিময় ছাড়াই সর্বোত্তম শিক্ষা দিতেন। কিন্তু এসব সম্ভবে বিতর্ক এবং চক্রান্তের জাল বিস্তৃত হতে থাকে।

বর্ষে বর্ষে তিনি চিকিৎসা পেশা আরো করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি একজন হারাজী হারাজীর পরামর্শে নিলেন যিনি ইতিমধ্যে সেখানে সুলভ হয়েছিলেন। তিনি তাকে এভাবে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিলেন। আমি ফিস নিয়ে কোন মতে সাদা মাঠে জীবন-যাপন করে যাছি। আমি জানি আপনি কোন ফিস চাইবেন না। কিন্তু সেখানে আপনার কাজের জন্য কোন মূল্য নেই। এটাই আপনি সত্বর সাধারণ এবং সম্ভাব্য প্রদান করবেন। আমি করলে আপনার পন্থায় আপনাকে শৈল্যবিদ ও ইতিহাস বিদ্যালয়ের কাছে গ্রন্থ মূল্যায়ন দিবে না। উল্লম্ব আপনার প্রতি বন্ধুভাবে নয়। মেটারের উপর লক্ষ্য উৎসাহবিস্মৃত নয়।

সম্প্রতি তিনি বিয়ে করেছেন তাই ভাবলেন, কোন পেশায় জড়িত হবার যাতে যথাপ্রয়োজন নয়।

এ পর্যন্ত তার অভিজ্ঞতা যদিও সীমিত এবং বিকির্ণ-বিচিত্র, তবুও তিনি তার যোগ্যতার চাকরি রেখেছেন। তার রোগ নির্ণয় এবং আধুনিক-উদ্দালনী
হযরত মৌলভী নূরুল্লাহ আলী (রা.) - খলিফাতুল মসজিদ আওয়াল

চিন্তাধারাও সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। দৃঢ়ভিত্তি এবং হোসাইন উপর পরিপূর্ণ নিঃসৃতিতা তাঁর সহায়তা হয়েছে। তাঁর দিদিরা তাঁকে উসারণিত করেছেন এবং একটি বড় বাড়িতে তাঁকে কোন খোলার পরামর্শ দেন। তিনি এটা তাঁর স্বাতন্ত্র্য করেন। তাঁর সদস্যতা চিন্তাক্ষর পঞ্চক সেরা রোগীদের দ্রুত আর্কর্ষণ করতে লাগল। সারাজীবন তিনি কখনো কোন ফিস দান নি। খেদা বা কিছু দিতেন এতেই তিনি অতি সম্ভব থাকতেন। তিনি তাঁর রোগীদের মাঝে কোন প্রকার পার্থক্য করতেন না। তাদের প্রত্যেকেই তাঁর পুরা মনোযোগ পেতো। গরীব ও অক্ষমরা তাঁর বিশেষ জন্যের পাত্র ছিলো। প্রয়োজনে তিনি আর্থিক সহায়তাও দিতেন।

তাঁর পিতৃ বিষয়ের সম্প্রদায়ের বয়স্ক বলা বলতেন, যে বাড়িতে তিনি তাঁর কোন ক্রিয়াখানা তা তাঁর টাকার ক্রয় ও সংস্কার করা হয়েছে। তাঁর কাউন্সিলিঙ এর সান্দ্রপে সেই মোড়ের কাজে লিখে দিতে হবে। তিনি তাঁর কর্মক্ষেত্রের সান্দ্রীতি সেই মোড়ের কাজে বিষয় প্রায় ঘরে হোসায়ার নির্দেশ দিলেন। তাঁর অতি দ্রুত তা সম্পাদন করল। যখন তাঁর মাতা বিষয়টি জানতে পারলেন, তিনি তাঁকে বলেন, তাঁর ভাই তাঁকে ঘর ছেড়ে দিতে বলেন নি এবং বিষয়টির পুনর্নির্দেশ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনি ইতিমধ্যেই ঘর ছেড়ে দিয়েছেন।

তিনি ভেরা সৌরভভার মালিকানাধিন একটি উপযুক্ত জায়গা পান এবং একজন নির্মাতাকে সেখানে একটি উপযুক্ত বিভিন্ন নির্মাণ করতে বললেন এবং পরিচিত এক হিদু রাজীর তোহাদিয়ার এক বাড়ি পাঠালেন, পৌরসভার জায়গায় কোন বিভিন্ন নির্মাণ করা যাবে না, বিশেষ করে নকশা অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত পৌরসভার জায়গায় কোন ঘর নির্মাণের প্রশ্নই উঠে না। তিনি আনা বলেন, হাকীম সাহেবের প্রতি সম্পাদন দেখতে গিয়ে তিনি প্রতিবাদ করেছেন না, এমনকি বিষয়টি বিবেচনা করে পৌরসভার কোন সদস্যোন্ন প্রতিবাদ করেছেন না। কিন্তু বিষয়টি ডেপুটি কমিশনারের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি উক্ত কমিশনারের সভাপতি হিসেবে নির্মাণ কাঠামোর অধিকারে ফেলার নির্দেশ দিয়েন। নির্মাণাতর্ক একই আশঙ্কা ছিল, কিন্তু তাকে কাজ চালিয়ে যেতে বলা হলো। ডেপুটি কমিশনারের সামনে রিপোর্ট উপস্থাপন করা হল তিনি বললেন, সত্ত্বেও কোন এক সুযোগে তিনি স্বাতন্ত্র্য পরিদর্শন করবেন এবং পরিষেবা খাতিয়ে দেখেন।

৪৮
ভেরায় চিকিত্সা পেশা

ডেপুটি কমিশনার এসে নির্দেশ দিলেন, তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না পাওয়া পর্যন্ত কাজ বন্ধ রাখতে হবে। মৌলিক নূরউদ্দিন যখন ডেপুটি কমিশনারের সাথে দেখা করতে এলেন ততক্ষণে তিনি সেখান থেকে চলে যাচ্ছিলেন কিন্তু তাঁর আগমনের খবর দেন ফিরে এলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি কি জানেন, এ জায়গাটি সরকারী সম্পত্তি?”

“হাঁ, আমি জানি। কিন্তু পুরো শহরটি সরকারী সম্পত্তি।”

“তা কিভাবে?”

“সরকার যদি শহরের কোন স্থানে সেনানিবাস প্রতিষ্ঠা সিদ্ধান্ত নেয়, তবে কেউ কি এতে বাধা দিতে পারবে?”

“অবশ্যই না।”

“আর এভাবে পুরো শহরই সরকারের আয়তাধীন বিবেচিত হতে পারে।”

আর কোন কথা না বলে ডেপুটি কমিশনার জানতে চাইলেন, “আপনি যা চাইছেন তা করতে এ জায়গার কতটুকু অপেক্ষ আমার দক্ষতার?”

“এই জায়গাটি একটি মহাসড়ক ও পথের পাতায় পথে অবস্থিত। এর পুরোটাই আমার দক্ষতা।”

ডেপুটি কমিশনার ঠহরিদার এবং সৌরসভার অন্যান্য সদস্যদের দিকে যুব্র জিজ্ঞেস করলেন: “আপনাদের কোন আপত্তি আছে কি?” তাঁরা বললেন, “প্রত্যাশিত তবেই বিন্যাস কাজে ব্যবহৃত হবে তাই আমাদের কোন আপত্তি নেই।”

ডেপুটি কমিশনার নির্দেশ দিলেন, মাটিতে যুটা গেঁট জামির নির্ধারিত অংশ চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে। এটা করা হলো। এরপর তিনি চলে গেলেন।

ঠহরিদার মৌলিক নূরউদ্দিনের উদ্দেশ্যে মন্ত্র করলেন, এত সহজে সৌরসম্পত্তি হস্তান্তর করার অধিকার ডেপুটি কমিশনারের নেই।

কিছুদূর চলে যাবার পর ফিরে এসে ডেপুটি কমিশনার মৌলিক নূরউদ্দিনকে বললেন, “আমি দেখতে পেয়েছি, এ পথটি বরং একটি বেঁধা নরমা বেঁধে যাচ্ছে। এটি আপনার জন্য অবতার কারণ হবে। আপনি একজন বিজ্ঞ মানুষ। এ বিষয়ে হয়ত আপনি কোন পরামর্শ দিতে পারবেন।”

“আমি মনে করি, ওপাশে আপনার ভবনের দেয়াল থেকে সৌরসভার একটি ভেরি বাধ তৈরি করা উচিত।”
হযরত মৌলিকী নূরউদ্দীন (রা.) - খলীফাতুল মসীহু আউয়াল

পৌরসভার কমিশনারদের লক্ষ্য করে তিনি বললেন, “আপনাদের কেন আপনি আছে কি?”

তাদের কেন আপনি ছিল না। তিনি মৌলিকী নূরউদ্দীনকে বললেন, “ভালে বিষয়টির নিপত্তি হলো। আপনি ভবন তৈরীর কাজ চালিয়ে যেতে পারেন না।”

তিনি চলে যাবার পর, একজন পৌরকমিশনার বিড়ি করতে লাগলো, “এটা একটা অত্যন্ত সমাধান। পৌরসভাকে শুধুমাত্র একটি মূল্যবান বুকিবন থেকেই বক্তা করা হয়নি বরং বাই তৈরীর জন্য অতিরিক্ত এক হাজার রুপি ও জরিমানা হলো।” মৌলিকী নূরউদ্দীন মন্তব্য করলেন, “এ বিষয়ে আপনাদের বোধশক্তির উদ্ধে।”

নির্মাণ ব্যায় বারশ রুপি তে দাড়াল এবং তিনি ভাবছিলেন কিভাবে তা পরিশোধ করা যায়। ইত্যাদিক একদিন তার বন্ধ মালিক ফাতেহ খান এলেন এবং বললেন, একটি প্রাদেশিক দরবারে যোগদানের জন্য তিনি রাওয়ালপিডি মাঝে আর একই সাথে দিল্লীতেও রাজ প্রতিনিধিদের একটি দরবার অনুষ্ঠিত হচ্ছিল।

মৌলিকী নূরউদ্দীন জানলেন, তিনি তাঁর সাথে যাবার আগ্রহ রাখেন। সেই মৌলিকী তাঁকে তাঁর পাশপাশি বাহনে বসার আমন্ত্রণ জানানো হলো। তিনি যেমন ছিলেন ঠিক সে অবস্থায় রোগীদের রেখে এবং তাঁর তীরে কিছু না জানিয়ে টাট্টু ঘোড়া চড়ে বললেন। জিলামে মালিক ফাতেহ খান রাওয়ালপিডির ট্রেন ধরলেন এবং মৌলিকী নূরউদ্দীন দিল্লী যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁর কাঁপড় পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল। তাঁই তিনি তহলিলদার মালিক হাকিম খানের কাছ থেকে একটি কেট, পাগড়ি এবং পাজামা ধার করলেন। লাহেরগমী ট্রেন ধারার জন্য তিনি টেশনদের দিকে ধীরে ধীরে এগে দিলা লাগলেন। তিনি দেখলেন, জিলাম থেকে মৌলিকী পর্যায় তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া হলো। পনের আনা এবং ধার করা কোটের পকেটে হাত দিয়ে দেখেন, এতে সমপরিমাণ পয্যসা রয়েছে। এ পয়সায় তিনি লাহের পৌঁছে দেখেন যাত্রীদের তীরে টেশন লোকে লোকার্য। এরা সবাই দিল্লীর দরবারে যাবার জন্য অপেক্ষামান।

তাঁর কাছে ভাড়ার কোন টাকা ছিল না। আর থাকলেও ভিড়ের কারণে বুঝিক অফিসের জানানায় পৌঁছা কষ্ট্যার্য ছিল।

এসময় রেজারেড গোলাকে নাথ তাঁর সাথে গায়ে পড়ে আলাপ জমান। তিনি তাঁকে জানান। তিনি যখন জানলেন যে মৌলিকী নূরউদ্দীন দিল্লী যেতে চাচ্ছেন, তখন তিনি তাঁর জন্য একটি টিকেট নিয়ে এলেন। তাকে পকেটে হাত দুকাতে দেখে রেজারেড প্রতিবাদ করে বললেন, তিনি উক্ত টিকেটের মূল্য গ্রহণ করবেন না।

৫০
বিবেকে তিনি দিল্লী পৌছেছেন এবং কৌতুহল তাকে শহরের বাইরে ফ্রমতাসীন প্রধানদের ক্যাম্পের কাছে নিয়ে গেল। কয়েক মাইল হাটের পর তিনি খেয়াল করলেন, সুর্য অবতর্ন তাই শহর ফিরে আসার কথা তার ছিল। এমন সময় ভূপালের মুসলিম জামাল উদ্দীন সাহের একজন খাদেম ছুটে এসে তাকে বললেন, মুসলিম সাহেব তাকে হাটতে দেখে ভেঙে আনার জন্য পাঠিয়েছেন। তিনি বললেন, তার দেরী হয়ে যাচ্ছে তাই তিনি সকালে মুসলিম সাহেবের সাথে সানেদে দেখা করবেন। কিন্তু লোকটি ছিল নাহেড় বাদাতা এবং বললেন, মুসলিম সাহেবের ক্যাম্প যেহেতু তাই অসুখীদার কথা তাঁর নিজেরই মুসলিম সাহেবকে জানানো উচিত হবে। মুসলিম সাহেব তার চিন্তারিত হেলের সাথে তাকে স্বাগত জানানলেন এবং বললেন, "আমার দোহাতে মুহাম্মদ উর্দু অসুস্থ। আমার ইচ্ছা আপনি তাকে পরিক্ষা করুন।" তিনি বললেন, সকালে এসে তিনি রেগাকে দেখে যাবেন। মুসলিম সাহেব রাতটি থেকে যাত্রার উপর জের দিলেন এবং তার জন্য একটি বাড়ি খাদেম। দেখানি তিনি আরামে রাত্রি যান করেন। পরের দিন যেহেতু শুক্রবার ছিল তাই মুসলিম সাহেবের রাত তাঁর জন্য এক জোড়া কাপড় দৈর্ঘ্যের রেখেছিলেন।

পরের দিন জুমুআর নামাজের পর মুসলিম সাহেব তার মালপত্র নিয়ে আসার জন্য তার আরামসহচ্ছে যেতে চাইলেন এবং ঠিকানা জিজিয়ে করলেন। তিনি একটি সরু রাস্তা দেখালেন যা দিয়ে কোন টমটম যাওয়া সহজ নয়। মুসলিম সাহেব মালপত্র নিয়ে আসার জন্য তার সাথে দুজন কর্মচারীকে পাঠিলেন। তাদের সাথে তিনি গলিস্থতে চুকে পড়লেন এবং বিশিষ্টের কোন উদ্দেশ্য সামনে রেখে হাটতে হাটতে একটি বাড়ি দেখালেন যাতে মানুষদের বাচার প্রবেশ ও বিহিংগ্রাম ব্যক্তি করলেন।

তিনি নিজে এতে প্রবেশ করলেন এবং দেখালেন বেশির ভাগ মানুষই দ্বিতীয় তলায় যােছে। তিনি তাঁর দুজন সাথেই নিজে আপেক্ষা করেন বলে উপরের তলায় গেলেন। তিনি কোথায় আছেন সে সম্পর্কে তাঁর বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না। স্বতন্ত্র অভ্যস্ত কোন এক শিক্ষার প্রবেশ তিনি সমুদ্রে এগাতে ঢাকেন।

উপরের অসংখ্য মানুষের সাথে তিনি 'তোহফাফুল হিদের' লেখক মোল্লী ওবায়দুল্লাহের হেতু পান। দেখে মনে হলো, তিনি তাকে দেখে প্রীত হয়েছেন এবং বললেন, "আপনার আগমন খুবই সৌভাগ্যের বিষয়। আমার সাথে বেশ কয়েকজন তুমি রয়েছে। এরা ইসলামে নবদীক্ষিত আর এদের জন্য উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা সম্পর্কে আমি উৎকৃষ্ট। আপনি কি তাদের নিয়ে গিয়ে দেখানো করতে পারবেন?" তিনি জানানলেন, এটা করতে পারলে তিনি খুবি
হয়রত মৌলিকী নূরউদ্দীন (রা.) - খন্ধিকাতুল মসীহ আউয়াল

হবেন। মুসলিম সাহেবের কর্মচারীরা তাদের মালপত্রের দায়িত্ব নিলো এবং তারা সবাই মুসলিম সাহেবের সাথে তার ক্যাম্পে গেলেন।

মুহাম্মদ উমরকে পরীক্ষা করে হাকিম নূরউদ্দীন টিউমার নির্ণয় করলেন যার দীর্ঘ মেয়াদী চিকিত্সার প্রয়োজন। মুসলিম সাহেব তাকে তার সাথে ভূপাল যাবার অনুরোধ করলে তিনি বললেন, তিনি হঠাৎ করে বাড়ি ছেড়ে যেয়েন। তাই দীর্ঘ দিন বাইরে থাকতে পারেন না। মুসলিম সাহেব তাকে বাড়ীতে পাঠানোর জন্য পাঁচশত রুপি প্রদান করলেন এবং তার সাথে ভূপাল যাবার জন্য গীড়াপড়ি করেন। উক্ত অর্থ তিনি তার হিন্দু পাওনাদারকে প্রেরণ করলেন এবং তাকে নিয়ে দুঃখিত না করার জন্য স্বামীকে পত্র পাঠালেন। এর কয়েকদিন পর মুসলিম সাহেব তাকে আরও সাতশ রুপি প্রদান করলেন তাও তিনি তার পাওনাদারকে পাঠালেন। আর সকল প্রকারের দুঃখিতামূলক হয়ে তিনি উৎফুল্লমনে মুসলিম সাহেবের সাথে ভূপাল গেলেন।

ভূপালেও তিনি ঈর্ষাপরায়ণতা এক চর্চাতে শিকার হয়েছিলেন এবং ভয়াহব বিপদের সময় পীর আলি আহমদ মুজাদ্দী কর্তৃক তাকে ঘৃতপূর্ণ সাহায্য প্রদান করা হয় যার কাছ থেকে প্রথমবারও ভূপালে অবস্থানগ্রাহী হন। তিনি অনেক সহানুভূতি পেয়েছিলেন। অবশেষে মুহাম্মদ উমরের বাস্তব বহাল হয় এবং তার চিকিত্সক ভরা ফিরে আসেন।

তার চিকিত্সা পেয়ে প্রসার লাগ করতে থাকে এবং তার দক্ষতা ও মোজ্যতা বীরূপি পায়। এর ফলকদত্তস্বরূপ, তিনি পেশাগত হিসাবে শিকার হন। তার খুবই সম্পদগ্রাহী একজন রোগী টাইফোনেড জুরে আঘাত হয়েছিলেন। তিনি পাম যাবে সাথে তার চিকিত্সা করেন কিন্তু জুরের তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণ করে স্তম্ভ দিনে তিনি বুঝতে পারলেন, সম্ভাব্য আসন্ন। সংকটের পূর্বকালে এই দিন সন্ধ্যায় প্রকাশ পেল। কিন্তু চিকিৎসা আশ্বাসিত ছিলেন। রোগীর পরিবার উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে এবং পিঠদান কলে থেকে অধিক অভিজ্ঞ এক চিকিত্সক ডেকে পাঠায়, যিনি গতির রাতে পৌছেন এবং টফান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে বললেন, রোগীর তেমন কিছু হয়নি আর তার কাছে এর সাথে চিকিৎসা রয়েছে এবং হাকিম নূরউদ্দীনের প্রতি অবজ্ঞাসূচক মুদ্রিত হেসে রোগীকে পাউডারের একটি সাধারণ মিশ্রণ প্রদান করেন।

পরের দিন রোগী শক্তি ফিরে পেলে বাহিরাগত চিকিৎসার সুনাম তুলে পৌছে কিন্তু হাকিম নূরউদ্দীন রোগীর পরিবারের চেকে অপমানিত হন। তারা সান্নে বাহিরাগত চিকিৎসকের তার দাবী অনুযায়ী মোটা অংশের ফির প্রদান করে।

52
নূরউদ্দীনের অশীতিপর নিকটস্থ বন্ধ মালিক ফাতেহ খান তার একজন ভক্ত ছিলেন। তার অনেক অনুগ্রহ তিনি দেখেছেন। তিনি তার বিয়ের পরামর্শ দিলেন, কিন্তু তার বিয়ের বয়াস পেরিয়ে গেছে এখানকার করে তিনি খুব একটা অগ্রহ প্রদর্শন করলেন না। নূরউদ্দীন তাকে উৎসাহিত করেন এবং তার জন্য আর্কেনিক, পার্দা ও আর্কেনের একটি মিশ্রণ তৈরী করলেন যাতে প্রয়োজনীয় গুণাগুণ ছিল। তিনি তার বন্দুক পরামর্শ দিলেন। এক বছরের ভিতর উপর দম্পতির ঘরে একটি কন্যা সন্তান জন্ম নেয় এবং এ এক বছর পরে তাদের একটি পুত্র সন্তানও হয়। নূরউদ্দীন একটি উদার ও বড় সম্মানিত আশা করলেন। যদিও উন্ন পিতা তার কাছে খুবই কৃতজ্ঞ ছিলেন আর তাদের বন্দুকের ভিত্তি আরও দূর হয়েছিল কিন্তু তার এ প্রত্যাশা পূর্ণ হয়নি। এসব ঘটনা তার এ বিশালকে আরও দূর করে যে আল্লাহর তালীব সন্তান নিয়ন্ত্রণের উৎস আর মরণশীল মানুষের কাছে কারো কোন প্রত্যাশা রাখা উচিত নয়। তিনি নিশ্চিত ছিলেন, আল্লাহর তালীব দায়র নির্দশনকের ভিত্তি তার সকল চাহিদার পুরোন করলেন। একই সাথে তিনি দূর প্রতিজ্ঞা হয় যে ভিত্তি অন্যের বিনিময়ে কাউকে পরামর্শ বা ঔষধ প্রদানের কথা তিনি আর তার ওপর না। এটিই তার জন্য সম্মানের পথ উন্মুক্ত করে।

সেই দিনগুলোতে তার ইবদন খাল্দুনের লেখা ইতিহাস পড়ার গতির অগ্রহ জন্মে। একবার বিক্রেতা সতর রূপী বিনিময়ে তার কাছে বইটি বিক্রি করার ইচ্ছা প্রকাশ করল। তিনি তাকে বললেন, সম্পূর্ণ অর্থ তিনি নগদ পরিশোধ করতে পারবেন না বরং কিন্তু তিনি আদায় করবেন। বিক্রেতা সমর্থ হয়নি। একই দিন বিকেলে যখন তিনি এলেন তখন তিনি বইটি তার টেবিলে দেখতে পেলেন। তার খোঁজ-খবর নেয়ার পরও উদাহরণ হলো না যে বইটি কিভাবে তার কাছে পৌঁছেলো। একদিন এক রোগী বললেন, তিনি একে শিখ ব্যক্তিকে তার টেবিলে বইটি রাখতে দেখতে। রোগী বললেন, তিনি তার নাম জানেন না, কিন্তু তাকে চিনেন। কয়েকদিনের পর তিনি সেই শিখকে তার কাছে নিয়ে এলে তিনি বললেন, বই বিক্রেতার কাছে মন্তব্য হলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে তার কাছ থেকে বইটি রাখ্য করে এনে তার টেবিলে রেখে দেন। তিনি আরও বললেন, তার মালিক তাকে সে অর্থ ফেরৎ দিয়েছেন যিনি তাকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন, নূরউদ্দীনের যা কিছু প্রয়োজন তা তার পক্ষ থেকে বেন তাকে সরবরাহ করা হয়। কিন্তু ইতোমধ্যে তিনি সতর রূপী খোঁজ করার সামর্থ্য অর্জন করেন তাই তিনি তার সুখদের অর্থ ফেরৎ পাঠালেন। তিনি এতে মনের হুমকু হয়ে নূরউদ্দীনের বড় ভাইয়ের কাছে
হযরত মৌলিক নূরউদ্দিন (রা.) - খোলুফাহুল মসীহ আউয়াল

অভিযোগ করলেন। বড় ভাই টাকা ফেরৎ নিতে সমষ্ট হলেন এবং ভাইকে মুদ্র ভর্সনা করলেন।

প্রায় সে সময়ই তাকে পশ্চাৎতের একটি বিরল উপসর্গের চিকিৎসার জন্য ডাকা হলো যার কোন দৃষ্টিতে তিনি পূর্বে দেখেন নি। পশ্চাৎতে রোগের সাধারণ নীতি অনুসারে তিনি চিকিৎসা আরোগ করলেন কিন্তু এরপর নিজের উপস্থিত জন মোষ্ঠকে কিছু ঔষধ বারিয়ে চিকিৎসা অব্যাহত রাখেন যার ফলে রোগীর অবস্থার উন্নতি হলো এবং রোগী পুরোপুরি আরোগ্য লাভ করল। এ অসাধারণ চিকিৎসা। বহুল আলোচিত হলো এবং তার চিকিৎসা পেশা প্রসার লাভ করতে লাগল।

তিনি এক বিধবার সংবাদ পেলেন এবং তার অবস্থা দৃষ্টিতে তিনি মনে করলেন, এ মহিলা তার যথাপ্রযুক্ত সঙ্গী হতে পারেন। তিনি তার কাছে প্রস্তাব দিলেন। সে বিধবা সমাজে প্রকাশ করলেও একই সাথে আশঙ্কা ব্যক্ত করলেন, কারণ বিধবার পন্য বিবাহকে সাধারণত ভাল দৃষ্টিতে দেখা হয় না। অবস্থার একটি পছন্দ করবে না এবং মত দেবে না। এতদৃসত্ত্বেও অবস্থার বললেন, নিকাহ সেবে নিলে হয়তো তার অভিভাবক মত প্রদানে সময় হতে পারেন। তিনি মনে করলেন, এক বিধবার পন্য বিবাহের বিরোধীতা একটি ইসলাম বহিস্কৃত আচরণ, যা অগহণযোগ্য। আনুষ্ঠানিক সমন্বয় হয়। একইসাথে অভিভাবকের ইতিবাচক মতামতের অপেক্ষা করা হচ্ছিল। এমতাবস্থায় মৌলিক নূরউদ্দিন হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে যথেষ্ট শুভ্র ও গৌরী কামানা এবং ফ্যাকাশে চেহারায় দেখতে পেলেন।

তিনি এই স্থলে এ ব্যাখ্যা করলেন যে নিকাহ হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সুলভ সময় হয়নি। নিষ্ঠা হাবার লক্ষ্যে তিনি দিল্লীর মিয়ার নজরীর হোসাইন এবং বাইতালর মৌলিক মোহাম্মদ হোসাইনের কাছে বিষয়টি লিখে তাদের পরামর্শ চান।

তাদের মধ্যে থেকে কেবল একজন পক্ষ থেকে তিনি এ উত্তর পেলেন, এবং ক্ষেত্রে মহিলা অভিভাবকের মতামত উপেক্ষা করে বিয়ে করতে পারে। তিনি আরও বললেন, 'মহিলা অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করতে পারে না'-এ হাদিসের বর্নকারীরা নির্দেশযোগ্য নয়। এটি তার মতামতের অনুকূলে ছিল তাই তিনি নববধুকে ঘরে আনার প্রস্তুতি নেয়া আরোগ করলেন।

তিনি তার পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘর থেকে বের হলেন। বাড়ীর গেটে এক লোকের সাথে দেখায়। তার হাতে হাদিসের একটি বই ছিল আর তাকে 'ফিকাহবিদরা বৈধ আখ্যা দিলেও যা মনে
সন্দেহের উদ্বেগ করে তা পাপ” -এ হাদিসের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলেন। তিনি হতভাগ্য হয়ে গেলেন এবং তাকে চলে যেতে বললেন। তিনি নিষিদ্ধ হলেন, খোদাতা’রা তাকে এ মর্মে সতর্ক করলেন, ফিকাহবিদদের মতামতকে গুরুত্ব দেবে না। তিনি গেট বন্ধ করে ঘরে ফিরে এলেন এবং পরিস্থিতি নিয়ে ভাবতে লাগলেন।
আর ভাবছিলেন, হাদিসটা সন্দেহহৃদ্য এবং ফিকাহবিদ কর্তৃক সমর্থিত নয়। এখন পরিস্থিতিতে তার যুম পাচ্ছিল। তিনি তুলে পড়লেন এবং তদৃশ ভাব হলো।
পুনরায় হযরত মুহাম্মদ (সাৰ্ক)-কে খণ্ডে দেখলেন। তিনি তার সামনে পচিশ বছরের যুবকের চেহারায় আত্মরক্ষা করলেন। তার (সাহ) বাম পাশের দাঁড়ি ছুট করে ছুট এবং ডান পাশের দাঁড়ি ছিল ঘন ও লম্বা। তিনি ভাবলেন তার দাঁড়ি যদি উভয় পাশে সমান হতো তবে তাকে কত সুদর্শন দেখাতো। তিনি অনুভব করলেন, হযরত মুহাম্মদ (সাৰ্ক)-এর দাঁড়ির যে চিত্র তিনি দেখেছেন তা সত্যিকারতে উক্ত হাদিস সম্পর্কে তার মনে যে সন্দেহ ছিল এরই একটি প্রতিফলন। তিনি তাত্ত্বিকভাবে মনে নির্গোত করলেন, এ হাদিসের সত্যতা সম্পর্কে সবাই সন্দিহান হতে পারে কিন্তু তিনি এই হাদিসকে সত্য বলে গণ্য করবেন। তাত্ত্বিকভাবে হযরত মুহাম্মদ (সাৰ্ক)-এর উভয় পাশের দাঁড়ির মধ্যে সুদর্শন সমাজস্বরূপ ফিরে এলেন। হযরত মুহাম্মদ (সাৰ্ক) হাসলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কি কাশীর যাওয়া পছন্দ করবে?” তিনি উত্তর দিলেন, “অবশ্যই হে আল্লাহর রসূল!”
তখন তারা উভয়ই বানিহালের পথে কাশীরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। এতে তার ভেরা ছেড়ে কাশীর চলে যাবার দিকে ইসির ছিল।

ভেরায় তার এক প্রতিবেশী লালা মাধ্যমাস্ত জমু-কাশীরের পুলিশ অফিসার ছিলেন। তিনি যদিও ভুগলেন এবং তার কাছে চিকিৎসার জন্য আসেন। তিনি দ্বৃত আরাগ্ন লাভ করলেন। প্রায় একই সময়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দেওয়ান কৃপারাম পিয়ত্তদান খানের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি হাকিম নূরউদ্দিনের যশ্চিন্তা কথা খন কাশীরের মহারাজার কাছে তা উল্লেখ করেন। এভাবেই তিনি কাশীরের মহারাজার সহকারী চিকিৎসক নিযুক্ত হন।

---

৫৫
মহারাজার চিকিৎসক

মহারাজার প্রধান চিকিৎসক ছিলেন হাকিম ফিদা মুহাম্মদ খান। তিনি অল্প কিছুদিন পরেই অবসর গ্রহণ করেন এবং হাকিম নূরউদ্দিনকে তার জায়গায় প্রধান চিকিৎসক হিসেবে পদায়ন দেয়া হয়। পদাধিকার বলে তাকে রাজ্যের সকল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়। তখন তার বয়স ছিল ৩৬ বছর। তিনি ১৫ বছর প্রধান যাবতীয়কর্মকর্তার পদে নিযুক্ত ছিলেন।

প্রথম অবসর রাজ্যে তার অভিজ্ঞতা খুব একটা উৎসাহবদ্ধ ছিল না। সর্বদা চক্রান্তের জাল বিস্তৃত ছিল তাই তিনি বুঝতে পারলেন, তাকে খুব সাবধানে পা ফেলতে হবে। দুজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা প্রকাশ্যে তার প্রতি শক্তিতা আরও করলো।

তিনি বসবাসের জন্য রাজ্যের মালিকানারী একটি সাদামাটি ঘর ভাড়া করলেন। এটা সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত ছিল। তাকে সাবধান করা হয়েছিল, ব্যবস্থাপক একজন বয়স্ক মানুষ, খুব একটা নির্ভর্যোগ্য নয় তাই তিনি যেন ঘর ভাড়া সম্পর্কে লিখিত চুক্তি করেন। পরামর্শ অনুসারে তিনি এক বছরের জন্য সেই ঘর লিজ নেয়া বাবদ একটা লিখিত চুক্তি করলেন এবং বসবাস আরও করলেন।

কেনাবিন্যাসের মাধ্যমে সে ব্যাক্তি তাকে ডাকলেন এবং বললেন, ঘর খালি করে দিন। কেননা অপর একজন বিভূত ভাড়া দিতে সম্মত হয়নি। তাকে লিখিত লিস্টের কথা সম্মত করানো হলো। কিন্তু সে ব্যাক্তি তাঁটিলের সাথে তাঁর কথায় অর্থহীন বলে উঢ়িয়ে দিলো এবং ঘর খালি করার উপর জোর দিল। এভাবে বাধা হয়ে ভাড়াটিয়া তাঁর অক্ষরায় চুক্তিপত্র বর্তমানে নির্ধারিত ভাড়ার দিঘুল ভাড়া দিতে বাধ্য হলেন। বিষয়টি এখানেই শেষ হয়নি। অন্ততিবিবেচনা ভূমি ব্যবস্থাপক আবার ফিরে এলো এবং বলল, ঘর খালি কর। কেননা তৃতীয় এক ব্যাক্তি চুক্তিপত্রের উল্লেখিত ভাড়ার চার গুণ ভাড়া দিতে সম্মত হয়নি। এভাবে অপমানিত ভাড়াটিয়া চাপের সামনে নতি স্পষ্ট করলেন এবং বললেন, তিনি অতিরিক্ত ভাড়া দেয়ার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু এর ফলে কর্মকর্তার ধূসরা আরও বেড়ে গেল আর সে গুণ দুই বা একদিন পর এ কাহিনী শুনতে থাকলো যে তাকে নির্ধারিত ভাড়ার ২৬০ বেশি ভাড়া দেয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। ভাড়াটিয়া বিরক্ত হয়ে গেলেন আর যেখানে সততা ও সাধুতার এই অভাব যে এমন নগরী ছড়ে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন।

৫৬
মহারাজার চিকিৎসক

তিনি তার চাকরকে মালপত্র বেঁধে প্রস্থানের উদ্দেশ্যে সবকিছু নিচে নামাতে বললেন।

তার জিনিসপত্র রাস্তায় ক্রীপুক্তিতে অবস্থায় ছিল। তখন শহরের একজন গণ্যমানু নাগরিক শেখ ফাতেহু মুহাম্মদ সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং চাকরকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ মালপত্র কার? তখনই মালিক নিচে নেমে এলেন এবং বললেন, তিনি শহর ছেড়ে যাচ্ছেন। তিনি বললেন, “আপনি মাত্র অনেক করেন দিন হলো এখানে এলেন, এত শীতে কেন চলে যাচ্ছেন?” তিনি বললেন, “যে জায়গায় সত্তার কোন মূল্য নেই সেখানে থাকার আমার কোন ইচ্ছা নেই।”

শেখ ফাতেহু মুহাম্মদ সাহেব ঘটনা বুঝতে পারলেন এবং বললেন, “ভূমি ব্যবপারক তার প্রতিজ্ঞার জন্য কুখ্যাত। আমি আপনাকে অনুরোধ করব, আপনি আমার সাথে অবস্থান করুন।” তিনি বললেন, “আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ কিন্তু আমার এখানে থাকার কোন ইচ্ছা নেই।” তিনি বললেন, “না না! আপনার কথা আমি শুনছি না।”

তিনি তার লোকদেরকে হাকিম সাহেবের জিনিসপত্র তার ঘরে নিয়ে যেতে বললেন। তখন ফাতেহু মুহাম্মদ সাহেবের কাজিতে অথবা তাকে নিরুদ্ধ করার মানস বললেন, তার অতিথিপরায়ণতা তাকে অবশ্বই সমস্যায় ফেলবে। কেননা রাজ্যের দুজন বড় কর্মকর্তা তার প্রতি চরম শত্রুভাবাপন এবং তিনি হয়তো তার প্রতি আতিথেয়তার কারণে তাদের প্রতিহিংসার শিকার হতে পারেন। তিনি এটিকে কিছু নয় বলে উত্তরে দিলেন আর মহারাজার চিকিৎসক হাকিম সাহেবের শেখ ফাতেহু মুহাম্মদের বাড়িতে বসবাস আরম্ভ করলেন। তিনি তার বাড়ীতে দশ বছর অবস্থান করেন। পুরো অবস্থানকালে তার জন্য সকল যাচ্ছিলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কেবল মেজবানই নন বর্ণ পরিবারের প্রতিটি সদস্য তার সুযোগ-সুবিধা কিছু এবং তার ইচ্ছা কি তা বুঝাতে ক্ষেত্রে নিজেদের মাঝে একটি নীরব প্রতিযোগিতা করেন। তিনি এবং তার কাছে যে সব হাসতে তারাও কোন সময় কোন কিছুর অভাব অন্তর্ভুক্ত করেন নি। সত্যিকার অর্থে এত বড় হদয়ের অধিকারী বুঝে পাওয়া ভার। মেজবান প্রকৃতপক্ষে অর্থিতের আতিথেয়তার যোগ্য ছিলেন। এ শহরে যেখানে ভূমিব্যবস্থাপকের নিয় প্রাক্তন রয়েছে সেখানে শেখ ফাতেহু মুহাম্মদ এবং তার পরিবারের লোকদের নিয় অবমানাধিক আছে।”

দুজন রোগীর সুদৃশ্চিক্তার ফলে তিনি চিকিৎসক হিসেবে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন। জমিউর একজন সমাজিত ও সম্পদশালী বাছি মিয়া লাল দীন সাহেবের মেয়ে আমাশয়ে আকাশ্য হলে পিতা যে সকল ভাঙ্গার শরণাপম
হযরত মোল্লা নূরউদ্দিন (রা.) - খেলিফাতুল মসীহ আউয়াল

হয়েছিলেন তাদের সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বে মেয়ের অবস্থার অনন্ত হতে থাকে ।
মেয়ের পিতা মহের হাকিম নূরউদ্দীন সাহেবের কোন কোন ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির সাথে
একমত ছিলেন না তাঁ তাঁর শরণাপাল হওয়ার ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহ ছিলেন
না । কিন্তু মেয়ের অবস্থার কারণে তাঁর দুঃখিতা যখন বাড়তে থাকে তখন তিনি
হাকিম সাহেবকে এসে মেয়ের চিকিত্সা আরম্ভ করার অনুরোধ করেন।

তিনি তাঁর এলাঘাটার জন কাজে লাগান এবং সেই মাতারকে উদ্ধ
প্রস্তাব করলেন আর মেয়ের চিকিত্সা করেন। চিকিত্সার ফলে তৎক্ষণাৎ রোগীর
অবস্থার উন্নতি হয় এবং দু'তিন দিনের মধ্যে পুরা আরোপ্য লাগ করে। কৃতজ্ঞ
পিতা হাকিম সাহেবকে সমানসূচক গাউন (জোকা) এবং সুসজ্জিত একটি
ইয়ার্কান্ডি টাটি ঘোড়া উপহার দেন।

মারাত্মক শুনুনেন আলাউদ্দীন নগরুন্দি বিভাগের একজন কর্মকর্তা
রাজদের তাঁকে ঘুড়ে পাঠালেন। হাকিম সাহেব তাঁকে কয়েকটি উপদেশ এক
সূচনা মিশ্রণ খাওয়ালেন। ফলে তখনই তিনি নিরাময় লাগ করলেন।

রাজা কলেরা মহামারী আক্রান্ত নগরুন্দি বিভাগের একজন কর্মকর্তা
রাজদের তাঁকে ঘুড়ে পাঠালেন। হাকিম সাহেব তাঁকে কয়েকটি উপদেশ এক
লোকের সম্পর্কে পড়লো। মহারাজা জলবায়ু

নিরাময় সম্পর্কের উদ্দেশ্যে বাহুদূরে চলে গেলেন। তাঁর সাথে যাওয়া হাকিম নূরউদ্দিনের
জন্য আবশ্যক ছিলো। মহারাজা এক নিকটদীঘী রাজা মহারাজার
আক্রান্ত হলেন। রাজার চিকিৎসায় চিকিৎসায় তিনি আরোগ্য লাভ করেন। ফলে
তাদের মধ্যে বর্জ্যুগুণ সম্পর্কে গড়ে উঠে। তিনি তাঁকে একটি মোটাটার অংক
উপহার দেন তাঁর বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত তাঁকে এভাবে উপহার দেয়া অব্যাহত

রাজত্ব। রাজা মহারাজার সম্পর্কে তত আত্মরক্ষা ছিলো না।
একজন রাজকুমারের বিয়ের সময় ঘটিয়ে এলে সে সময়ে অন্তর গ্রহণ করা ঠিক
হবে কি-না সে বিষয়ে তিনি হাকিম সাহেবের সাথে পরামর্শ করেন। তাঁর বিয়েতে
যোগ দেয়া উচিত বলে তিনি পরামর্শ দেন। কেননা, এর ফলে হয়তো রাজার সাথে
তাঁর সম্পর্কে পুনঃবহাল হতে পারে। এটি একটি অনেক বড় উৎসব ছিলো। বিয়েতে
রাজা মহারাজা মহারাজার রাজকুমারের পুনর্বাহিত্য আছে জেনে মহারাজা বেশ আনন্দিত

বিয়ের উদ্দেশ্যে এ রাজকীয় শোভাযাত্রা প্রায় এক মাস সময় লেগে যাবার
কথা। একটি হাতির পিঠে হাকিম নূরউদ্দিনের সাথে দরজায় হাওয়ায়
(হাতির পিঠে মহারাজার কন্যা) দুর্গনের সাক্ষাত্তে সন্তান জায়গা ছিলো। কিন্তু একটা
মৃত্যু সত্ত্বকে লাগানো ছিলো না এবং সেটি তাঁর শরীরের সাথে বার বার

৫৮
মহারাজার চিকিৎসক

ঘর্ষণের কারণে তিনি সফরের প্রথমভাগ বর্ধ করে অতিবাহিত করেন। সফরের দ্বিতীয়ভাগে তিনি এমন মারাত্মক কষ্ট ভোগ করেন যে তিনি ভাবলেন পরবর্তী দিন সফর অবশ্যই রাখা তার পক্ষে সত্ত্ব হবে না। ইতেমম্বরে রাত অনেকটা কেটে যায়। তিনি আশাঁ করলেন, তার পায়ে একটি কোম্প্রয়কা পড়েছে। তিনি সফরশীল একজন সাজনকে ডাকলেন এবং তাকে ফোসকাল অনুপাত করে পরিক্ষার করার অনুরোধ করলেন। সাজন এ মৌম্ব আপনি করলেন, রাতের কাজ সেরে তিনি তার সব যত্নপূর্ণ হচ্ছিলেন তাই ওঁহু সকল বেশায় আপারিশন করা সম্ভব। যাই হোক রোগীর পীড়াপীড়িতে তিনি একটি পকেট ছুরি দিয়ে ফোসকাল যাচ্ছেন তাই বে চেরি-কেটে পরিক্ষার করলেন। পরবর্তী সময়ে কৃত্রিম কিনারায় জোড়া লাগতে দেখা যায়। এর অর্থ হলো সেটি আরাগুপ্তের সূচনা। রোগী ভাবলেন, তিনি যদি সাবধান থাকেন তার ক্ষতিসারে বেশি চাপ না দেন তাহলে জোড়া চালাতে পারবেন কিন্তু ওঁহু কয়েক মাইল সফরের পরেই ক্ষতিসারের ব্যাধি অসহ্য হয়ে উঠবে। তিনি জোড়া থেকে নেমে সাহায্যের অপেক্ষায় করছিলেন। তৎক্ষণে সিংহাসনের উন্তরাখিত যুবরাজ নিজ কাছে যায় সেখানে পৌঁছলেন আর তাকে অভ্যন্তরীণ জানিয়ে দাড়িয়ে থাকার করণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, তাঁর ভাল লাগছে না আর জোড়া চালাতে পারছেন না। যুবরাজ সহানুভূতি প্রকাশ করলেন এবং বললেন, তুই-তিন মাইল দূরবর্তী সফরের পরবর্তী গতিবেদন পৌঁছার চেষ্টা করলেন, সেখানে সাব্যস্তকরণ ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে বলে তিনি চলে গেলেন। অপর দূজন যুবরাজের সাথেও একই ধরনের সংলাপের পুনরাবৃত্তি হল। এদের একজন দেবনা-কাতর রোগীর একাংশ অশুশ্চিনি বুঝেছিল। রাজা মতি সিং-এর সাথেও একই ধরনের কথা হল। তিনি একাংশের সাথে উদ্দেশ্য ও উৎক্ষেপ প্রকাশ করলেন। অবশেষে ক্যাম্পের সুপারকে সে পথে গেলেন এবং একই ধরনের সুলাপের আদান-প্রদান হল। হাকিম নুরউদ্দীন ভাবলেন, মানবীয় প্রচেষ্টার এখানেই শেষ। তাদের উপর নির্ভর করার আসলে তাঁর ভুল ছিল। সাহায্য ওঁহু আলাহুর পক্ষ থেকেই আসতে পারে।

তাকে বেশিরক্ষণ অপেক্ষা করবে না নি। অন্ত কিছুই মধ্যে সমাধিক কর্তাকে অধিষ্ঠিত দেওয়ান লক্ষ্য দাস তার জোড়া চালু সেখানে এলেন। তাকে দেখে তিনি তৎক্ষণাৎ জোড়া থেকে নামলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, "কি হয়েছে?" হযরত নুরউদ্দীন বললেন, "একটা ফোকাল কারণে আমি জোড়া আরেখান করতে পারছি না। আপনি চলে যেতে পারেন।" তিনি বললেন, "আমি আপনাকে অচলাবস্থায় ফেলে কিভাবে যেতে পারি।"
হযরত মৌলভী নুরউদ্দিন (র.া.) - খলিফাহুল মসীহ আউয়াল

তিনি তাঁর সাথে সেখানে বসলেন আর কিছুক্ষণ তাঁদের দুজনের মাঝে কথাবার্তা হলো। ততক্ষণে তিনি পাঁচ এসে উপস্থিত হলো। তিনি তাঁর লোকদের কাছে গিয়ে তাঁদের কিছু দিকনিদর্শনা দিয়ে পুনরায় বাহনে আরোহণ করে চলে গেলেন। বাহকরা পাঁচটি হাতী নুরউদ্দিনের কাছে নিয়ে এসে তাঁকে আরোহণ করতে বললো এবং তাঁরা জানালেন, তাঁর জম্মু ফেরৎ যাওয়া পর্যন্ত এটি তাঁর কাছেই থাকবে। তিনি দেখলেন, পাঁচটি প্রয়োজনীয় সব কিছুই সুস্থিত করে। তিনি আরামে যেয়ে পড়লেন এবং খোঁদা তাঁদেরকে কাছে তাঁর দয়া ও কৃপার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে পরিগণিত কুরআন তেলাওয়া আরোহণ করলেন। কৃত্রিত তাঁদের শক্তি গেলে।
তিনি পাঁচ ফেরৎ দিতে চাইলেন। কিন্তু বেহারারা তাঁকে বললো, জম্মু না পৌছাও পর্যন্ত তাঁদেরকে তাঁর সাথে থাকতে নিষেধ দেয়া হয়েছে।

একমাস দীঘি এ সফরে মৌলভী নুরউদ্দিন প্রায় অর্ধেক কুরআন কর্মী মুখ্য করে ফেললেন। একবার আরোহণ করার পর যতক্ষণ পুরো কুরআন মুখ্য হয়নি তিনি অভ্যাস মনযোগ সহকারে মুখ্য করা অব্যাহত রাখেন। এভাবে মৌলভী হাকিম হাজী নুরউদ্দিন হাফেজ হিসেবেও যাত্রি লাভ করেন।

বিয়ের এ সফরের শেষে জম্মু পৌছে পাঁচ বাহকরা তাঁর যে যত্ন নিয়েছে এর জন্য তিনি তাদের ধন্যবাদ জানান এবং তাদের উপযুক্ত বসিশত দিয়ে চাইলেন। তারা কোন কিছু হ্রেদে অধীনতা জানালো বরং বলল, দিওয়ান সাহেব তাদেরকে সফরের পুরো খরচ এবং বসিশতের জন্য পর্যন্ত অর্থ দিয়েছেন আর তাঁর কাছ থেকে কোন কিছু নিতে নিষেধ করেছেন। তিনি তাদেরকে নিশ্চয়তা দেয়ার চেষ্টা করলেন যে যা ঘটেছে দিওয়ান সাহেবের জানার প্রয়োজন নেই। তাতার তথ্যের মানেই না বরং কিছু রূপী বের করে তাঁর সামনে রাখলে এবং বললেন, দিওয়ান সাহেব আমাদেরকে যে টাকা দিয়েছেন এথেকে এ টাকাগুলো বেঁচে গেছে। আমারা আপনাকে অনুরোধ করবো এ রূপীগুলো গ্রহণ করুন। কেননা আমরা তাঁকে এই রূপীগুলো ফেরৎ দেয়ার চেষ্টা করার দৃষ্টিতে পারি না। তিনি তাদের দায়িত্বপালন এবং মালিকের প্রতি বিশ্বস্ততা ও সত্য দেখে গৌরবের অভিভূত হলেন। এরপরেও বহুবার তিনি দিওয়ান লক্ষ্য দাসের অনেক অনুগৃহোত ও মহানেত্রীতা দেখেছেন।

কিছুকাল পর দিওয়ান লক্ষ্য দাস কাশীরীরের প্রধান মসজিদ নিয়ুক্ত হয়েছেন। তিনি পশ্চিম ভারতে যাব পছন্দ করতেন আর তাঁর সকল আরদালী পশ্চিম ভারতীয় ছিল। তিনি নির্দেশ জারি করেছিলেন, কেউ যেন তাঁর সাথে দেখা করতে ঘরে না আসে। কেউ তাঁর সাথে ঘরে দেখা করতে এবং তাঁর পাঠান চাকরিগত তাকে কোন

৬০
মহারাজার চিকিৎসক  
অভাব্যন্ত না জানিয়েই বিদায় দিয়ে দিতো। এক সন্ধ্যায় শেখ ফাতেহ মোহাম্মদ সাহেব বললেন, প্রধান মসীর সাথে তার কিছু কাজ আছে কিন্তু তার পাখতুন কর্মচারীদের কারণে তিনি প্রধানমসীর ঘরে যাওয়ার সাহস পাচ্ছেন না। তার অতিথি তাকে তখনই গিয়ে প্রধান মসীর সাথে দেখা করার অনুরোধ করেন কিন্তু তিনি বললেন, তার ঘরে কর্তব্যরত পাখতুন আরদালীর কারণে তিনি ধৃঢ়তা দেখতে পাচ্ছেন না। তখন মৌলিক নূরউদ্দিন বললেন, তিনি এখনই প্রধান মসীরকে লিখবেন। তার মেজবান তাকে নিরুদ্দৃষ্টি করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনি কাজ করার নিয়ে নিম্নলিখিত পত্র লিখলেন:

“আমি প্রচেষ্টা আপনার আপনার দর্শনার্থীদের তাড়িয়ে দেয়ার জন্য দরজায় শক্তিশালী পাখতুন পাহারাদার নিয়ুক্ত করেছি। নাগরিকরা রাস্তার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে তাদের বাসভবনে দেখা করে থাকা। দয়া করে আপনার দর্শনার্থীদের সুবিধায় বাসভবনের একটি বড় কামরা ঈসানী কার্পেটে সজ্জিত করুন। আপনার সুবিধায় আপনি তাদের বাস্তুর জন্য জানাতে পারবেন বা যার সাথে দেখা করার ইচ্ছা হবে না তাকে আপনি না বলতে পারবেন। কিন্তু দর্শনার্থীদেরকে আপনার পাখতুন পাহারাদারগণ এভাবে তাড়িয়ে দেবে তা আপনার মহান পদোন্নাতিক পরিপক্ষী।”

তখনই চিঠি লেখার কথা হল। অন্য সময়ের মধ্যে দিওয়ান সাহেবের ব্যক্তিগত সচিব একটি হারিকেনের হাতে নিয়ে এলেন এবং হাওয়াম নুরউদ্দীনকে বললেন, দিওয়ান সাহেব তাকে ধরে নিয়ে যাবার জন্য পাঠিয়েছেন। এভাবে তাত্ক্ষণিক ডাক পড়তে শেখ ফাতেহ মোহাম্মদ কিছুটা শক্তিত হলেন এবং তাকে রাতের এ প্রহরে মেঝে বারণ করলেন, কিন্তু তিনি গেলেন। তিনি বাইরে কোনো পাহারাদার দেখতে পেলেন না। দিওয়ান সাহেব তাকে হাদতাপূর্ণ আত্মীয় অভাব্যন্ত জানায় এবং বললেন, “আপনি দেখে থাকবেন দরজায় কোনো পাহারাদার নেই। আমি তাদের সকলকে বিদায় করে দিয়েছি। অমুক অমুক কামরা দর্শনার্থীদের জন্য ঈসানী কার্পেটে সজ্জিত করা হয়েছে।”

দর্শনার্থী সংঘাত তার প্রস্তাবের এত দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য ধন্যবাদ জানালে উত্তরে তিনি বললেন, “একটি রাজ্যে আপনার মত মানুষের অনেক প্রয়োজন রয়েছে যারা পরিকার কথা বলতে জানে। আমি আপনাকে পাতিরভাবে শ্রদ্ধা করি তাই এখন থেকে আর কাউকে ফিরিয়ে দেয়া হবে না। আর আপনার জন্য কোনো বিধি-নিষেধ নেই আপনি যখন ইচ্ছা আসতে পারেন।”

৬১
হয়রত মৌলভী নূরউদ্দীন (রা.) - খলিফাতুল মসীহ আউয়াল

রাজ্যে তার কর্মকান্ড ছাড় চিকিত্সার মায়েই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি ইসলামের একজন নিবেদিতপ্রাণ সেবক ছিলেন। রাজ্যের মহিলা ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মাঝে ইসলাম সম্পর্কে এমন ভূল ধারণা ছিল তা দূর করার জন্য সকল সুব্যাপারে তিনি কাজ লাগাতেন। একাদিন সম্ভবত পরিবর্তন রাধা করলেন, পরিবর্তন লেখক ইসলামের উপর এমন কিছু আপত্তি করেছে যার কোন উত্তর নেই। তিনি পর্যবেক্ষণের তার দৃষ্টিতে সম্পর্কে বড় আপত্তিটি উল্লেখ করার পরিবেশ বললেন? তিনি বললেন, হযরত মুহাম্মদ (সান্নি) এর তীব্র খলিফা হযরত উমরের নির্দেশে আলেকজান্দ্রিয়ার প্রথিত লাইব্রেরীটি জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। হাফিজ নূরউদ্দীন, ইসলামের প্রথম যুগের সময়ের নির্দিষ্ট লিখিত তাম্মল নাম উল্লেখ করতে বললেন? গভর্নর বললেন, "গভর্নর বললেন, 'পিবনস-এর রোমান সাহারাম্বের উদাহরণ ও প্রতীক' বইটা আনা হলো এবং গভর্নর এর দৃষ্টি আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরী দ্বারা যে বিষয়ে লেখক বিশ্বাস করেছেন যে দিকে আকর্ষণ করা হলো। এ থেকে প্রতিষ্ঠান হলো পেলার, এর সাথে হযরত উমরের কোন প্রকার সম্পর্কে ছিল না।

gভর্নর লজিত হয়ে বললেন, "আমরা ইসলামের প্রতি চরম শুভভাবাপন একটি পরিবেশে ভাব হয়েছে তাই ইসলামের সমালোচনামূলক কোন কথা পেলাই তা আর নেই।"  

তিনি মহারাজার বিশেষ ও ব্যক্তিগত পরিচয়করী উদ্দেশ্যে পবিত্র কুরআনের দরস দেয়ারও সুযোগ পেয়েছেন, যা তারা প্রতিদিনের মূল্যায়ন করত। মহারাজার তাই রাজা আমর সিং তার কাছে পবিত্র কুরআন শিখেছেন এবং তিনি তাতে গতির থাকিতে চেষ্টা করতেন। মহারাজা নিরাপত্তা তার কাছে প্রায় অর্থে কুরআনের অর্থ শিখেছেন।

তিনি তার পেশায় প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। তার কোন কোন চিকিত্সা সফলতা সত্যিকার অথবা আশ্চর্যজনক ছিল। কিন্তু তিনি কখনো মনে করেন নি, সফলতা তার যোগ্যতাবাদ বলে অর্জিত হয়েছে। তিনি প্রতিটি মুহূর্তে এ চেতনায় সম্মুখ থাকতেন যে আল্লাহর দয়া ও কৃপা ছাড়া কোন কিছু অর্জন করা সম্ভব নয়। আর খেদার দুর্বল সৃষ্টিকে সৃষ্টিব এ বিষয়ে সচেতন প্রথম উচিত মনে চিন্তা, কথা বা কোন মাধ্যমে খেদার স্বীকার করে ও কোনোর সৃষ্টি আমরা না জানাই।

চিকিত্সার ক্ষেত্রে তিনি নিজেকে একটি প্রচলিত ইন্দুনামি চিকিত্সা পদ্ধতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতেন না। তিনি মিশর থেকে এলোপ্যাথি চিকিত্সা পদ্ধতি সম্পর্কে আর্বী ভাবায় অনুরূপ করেন এই আনুভূতি তা সম্পর্কে পড়েছেন। তিনি
মহারাজার চিকিত্সক

একজন বয়েরুদ্ধ হিন্দু চিকিত্সক, পতিত হারমান দাসের কাছে হিন্দী চিকিত্সা পদ্ধতির শিক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং তার সাথে ‘অমৃত সাগর’ ও ‘সারসাত’ গাঢ় করেছেন। তিনি তাঁর সমানীন্দ্র শক্তিকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন। বিভূতিভূষণে তাঁর সেবা করেছেন এবং সমান দিয়েছেন যদিও রাজ দরবারে তাঁর পদবৃত্তি তেমন কিছুই ছিল না। কেউ মহারাজার কাছে বলল, নূরউদ্দিন চিকিত্সক হিসেবে খুব একটা গণনায় মধ্যে পড়ে না। কেননা এখন পর্যন্ত তিনি পতিত হারমান দাসের মত একজন সামান্য লোকের কাছে শিক্ষাদাতা। একদিন মহারাজা জিজ্ঞাস করলেন, “আপনি হারমান দাসকে এত শ্রদ্ধা করেন কেন?” তিনি বললেন, “আমি তাঁকে আমার শিক্ষক হিসেবে শ্রদ্ধা করি।” মহারাজা এ উত্তরে গভীরভাবে প্রভাবিত হলেন এবং তাঁর মনে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধারোধে আরও বেড়ে গেল।

মিয়ার লাল দীনের ছেলে ফিরোজ দীনের অসাধারণ শিক্ষালীলায় কারণে তিনি তাঁকে খুবই পছন্দ করতেন আর সে যুবকদের তাঁর জন্য একাধার নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। তিনি হিন্দু বসতে আক্রান্ত হলে তাঁর সমানীন্দ্র বন্ধু তাঁর চিকিত্সার ভিত্তি কোন লাভ হয়নি। ফলে প্রত্যেক চিকিত্সকের সামনে কোনো অবস্থার অবশ্যই হতে থাকে। এ হামিদাবাদিকের ঘটনায় তিনি যার পার্থক্য বুঝিয়ে হন এবং আরেকবার তাঁর এ উপলব্ধি হয়ে যে সবচেয়ে খোদার করণ্ডা ও দয়ার উপর নির্ভরশীল।

আমাশয়ে রোদে ভেরায় তাঁর এক ভাগ্যে মারা যায়। এর অঙ্গ কিছু দিন পর তিনি কোন কারণে জম্মু থেকে ভেরা আসেন। আমাশয়ে আক্রান্ত অপর এক ব্যক্তিকে তাঁর ভাইয়ের চিকিত্সায় আরোগ্য লাভ করতে দেখে তাঁর বোন বললেন, “আমার ছেলে যখন অসুস্থ ছিল তখন তুমি যদি এখানে থাকতে তা হলে সে মারা যেত না।” তিনি এ কথা শুনে কেপে উঠেন এবং বোনকে নস্তহত করলেন, “তোমার আর একটি ছেলে হবে যে আমাশয়ে আক্রান্ত হবে আর আমার চিকিত্সা সত্ত্বেও সে এ রোদে মারা যাবে।” নিদিট মেয়াদাতে তাঁর ঘরে একটি সুদর্শন সত্তার জন্য হয় আর সে আমাশয়ে আক্রান্ত হয়। তাঁর ভাই চিকিত্সা করতে থাকেন। বোন ভাইয়ের কথা উপর করলেন এবং ভাইকে আরোপ্যের জন্য দোয়ার অনুরোধ করলেন। তিনি দোয়ার করলেন এবং বোনকে জানান, বাচ্চা মারা যাবে কিন্তু তাঁর ঘরে আর একটি বাচ্চা হবে সে ভয় হবে এবং উন্নতি করবে। পরবর্তীতে তাই হয়েছে।

মহারাজা হাকিম নূরউদ্দিনের মেধা এবং উন্মত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষায়ক প্রশংসা দিতে দেখতেন এবং প্রায় সময় তাঁর প্রতি ভক্তি প্রকাশ

৬৩
হযরত মৌলভী নূরউদ্দীন (রা.) - খলীফাতুল মসীহ আউরাল

করতেন। একদিন সমাজে মহারাজার পক্ষ থেকে জরুরী ভিত্তিতে তাকে ডাকা হলো। যখন তিনি বের হতে যাচ্ছিলেন ঠিক তখন এক মেঘরাপী একান্ত আকৃতি ভরা কঠোর তার সাথে গিয়ে তার ব্যাখ্যা জরিত ধ্যানের পরিক্রমা করার অনুরোধ জানান। তিনি মহারাজার বার্তাবাহিককে বললেন, আপনি যান এবং মহারাজাকে নিষ্ঠুরতা দিন যে আমি এখনই আসাচি। দূরত আশ্চর্য হলো এবং বললো, "এক মেঘর রাজার উপর প্রাধান্য পাবে!" হাকিম সাহেবের কোন সদস্যের ছিল যে দূরত রাজার কাছে সে মাঝাই বলে যাকে সে স্পর্ধা ভেবেছে। কিন্তু তার মানবতারোধ একজন তুচ্ছ মেঘরের কঠিন কথনে উপস্থিত করতে পারে না। তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন তুর্কির মারাত্মক কোষ্ঠকাঠিন্য হয়েছে। তিনি রোগীকে এনিমা দিলেন ফলে রোগী তখনই আরাম বোধ করলো। সে ব্যক্তি ব্যবহার নিঃশ্বাস নিল এবং এভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল, "আল্লাহ আপনাকে অশেষ দানে সৃষ্টি করুন এবং তাকেও যিনি আপনাকে এখানে আমাদের নাগালের মাঝে রেখেছেন!" এ দোয়া একটি নয় নিঃশ্বাসের ছিল যে হাকিম সাহেব নিঃশ্বাস ছিলেন, মহারাজার কষ্ট যাই হোক না কেন তিনি তা থেকে অবশ্যই আরেগ্য লাভ করে থাকবেন। কেননা তাকেও এ কল্যাণের অর্ণ আখ্যা দেয়া হয়েছে।

তিনি রাজ প্রাসাদে এসে দেখলেন যে ঘটনা অবিকল তাই। মহারাজার
চিকিৎসার আর কোন প্রয়োজন নেই। মহারাজার বিলম্বের হেতু জিজ্ঞাসা করলে তিনি মহারাজাকে পুরো ঘটনা খুলে বললেন এবং বললেন, নেচারা মেঘরের কল্যাণেই তার কষ্ট দূরীভূত হয়েছে। মহারাজা তার আচরণকে একজন সত্যিখারের
চিকিৎসাকালীন চাহিদা আখ্যা দিয়ে তাকে দুটি তারী স্বর্ণের বালা উপহার
dিলেন। রাজ প্রাসাদ থেকে বের হবার পূর্বে তিনি সে দূরতকে ডেকে তাকে একটি
বালা উপহার দিলে সে বিশ্বাসিত হলো এবং পুরো ঘটনা জানতে চাইলো।
উত্তরে তিনি বললেন, "যদি আপনি মহারাজার কাছে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ না
করতেন তাহলে আমি এই বালা পেতাম না। সুতরাং একই কারণে আপনিও
পুরুষকের অংশীদার।"

একবার মহারাজা এ নির্দেশ জারী করলেন, সমস্ত উচ্চপদস্ব কর্মচারীর একটি
আনুষ্ঠানিক ইউনিফর্ম পরা উচিত যার মূল্য এক মাসের বেতনের কম হওয়া উচিত
নয়। সবাই নির্ভর কাপড় পরলেও মুখা চিকিৎসক সাহেব তাঁর সাদামাটা
অনাড়ুড়ি বেশ-ভূষায় কোন পরিবর্তন আনলেন না। কেন তা মহারাজার কাছে
মহারাজার চক্তিত্সক

উল্লেখ করলে মহারাজা বললেন, “হাকিম সাহেব যথাকর্ম করেছেন। কেননা আনুষ্ঠানিক পোষাক তাঁর চিকিৎসা কার্য সম্পাদনে ব্যাঘ্র ঘটাতে পারে। তাছাড়া তাকে মহিলাদের মাঝে দাঁড়িয়ে পালনের জন্য প্রায় সহিত রাজপ্রাসাদে যেতে হয়। তাই এমন ব্যক্তির জন্য সাদামাটা গোপাকাই তাল।”

রাজা যখন সর্বসাধারণের দর্শনদান করতেন তখন সকল উচ্চপদস্থ কর্মচারিকে একটি রৌপ্য মুদ্রা উপহার দিয়ে রাজার প্রতি সমান প্রদর্শন করতে হতো আর মহারাজারা এই যোগাযোগ নিদর্শনের মাধ্যমে তার দুই আঁধার দিয়ে তা সম্পর্কে করতেন। হাকিম সাহেব এভাবে শুদ্ধ প্রদর্শন করতে লজ্জাবোধ করতেন। কিন্তু তিনি তা কোনভাবে এড়ানের উপায় চাইলেন না। যখন তাঁর পালা এলো তখন রাজা দেখলেন, তিনি হাতের মুদ্রা নিয়ে ভাবতেন। কাছে এলে মহারাজারা জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনি কি সমান প্রদর্শনের কথা ভাবতেন না কি মুদ্রার কথা ভাবতেন?” তিনি বললেন, “মহামায়, আমি এই মুদ্রার কথা ভাবতেন না আপনার প্রতি আমার সমান প্রদর্শনের প্রতীক।” রাজা মুখচি হেসে বললেন, “আপনার এ বিষয়ে কোন বাধ্যবাধকতা নেই, আপনি স্বাধীন।”

কেউ মহারাজাকে বললে, হাকিম নূরউদ্দিন এমন এক ব্যক্তির অধিকারে যে হয়তো মুহাম্মদ (সা) এর খিলাফতের অন্যায়ভাবে কুটিকাটি করেছে। একদিন মহারাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “মুহাম্মদ (সা) এর নিজের আওলাদ কেন তাঁর স্বল্পতিও হননি?” তিনি বললেন, “মুহাম্মদ (সা) এর স্বল্পতিও হবার বিষয়টি কোন জ্ঞাপনের বিষয় নয়, এছাড়া তাঁর কোন পুরুষ সত্ত্ব ছিল না। আর তাঁর দৌহিত্রীর উত্তরেই অপ্রশ্ন বয়স্ক ছিল।” তখন মহারাজা বললেন, “আলী মুর্তজাতো তাঁর পুত্র ছিলেন আর হয়তো উমর ক্ষমতা জবাব দেবলেন।” তিনি বললেন, “আলী তাঁর পুত্র নন বরং তিনি তাঁর জমাতা ছিলেন আর হয়ত উমর তাঁর তিরোধানের অব্যবহিত পর খুলুক ছিল নি। তিনি তাঁর দ্বিতীয় খলিফা ছিলেন।”

“তাহলে কি হয়ত আলী তাঁর পুত্র ছিলেন না?”

“না, তিনি তাঁর জমাতা ছিলেন। যে ভাবে সে রাজা (তাঁর দিকে ইচ্ছিত করে) আপনার জমাতা।”

“আচ্ছা, এখন আমি পুরো বিষয়টি বুঝলাম। আমরা এমন কোন ব্যক্তির কাছে মেয়ে বিয়ে দেই না আর আমরা এমন কোন ব্যক্তিকে মাত্র নিয়ুক্ত করি না।

65
হযরত মৌলিকী নূরুদ্দিন (রা.) - খলীফাতুল মসীহ আউয়াল

যে হুলাহুলিয়াতের হবার সম্পূর্ণ দেখা। আমাদের এ জামাুতার পরিবার ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহে ইংরেজদের বিরোধিতা করেছে এবং তাদের আদামান যীশু দেশান্তরিত করা হয়েছে। আমারা ইংরেজদের সাহায্য করেছিলাম যার বীরসিদ্ধির বৃত্তি আমাদেরকে অতিরিক্ত এলাকা দেয়ার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু আমরা কোন ভুমি না নিয়ে রোয়ার দুর্গ থেকে এ রাজা ও তার পিতাকে মুক্ত করি এবং তাদের রাজ্য তাদের ক্ষেত্রে দেই আর আমাদের মেয়েকে এ রাজার কাছে বিয়ে দেই। তারা যদি কন্তুন্মাত্র আমাদের বিরুদ্ধে যায় তাহলে রোয়ার দুর্গ এখনও আছে। প্রধান মশীকে যদি আং তার পদ থেকে অপসারণ করি তাহলে মুদি দোকান চালিয়ে তাকে জীবিকার ব্যবস্থা করতে হবে।”

এক পর্যায়ে হাকিম নূরুদ্দিনের ‘যে আমাকে বদখ হিসেবে পেতে চায় সে মন আংতীকে বদখ হিসেবে অবলম্বন করে’-এ হাদিসের তুর্কী ‘তবকাতে আনোয়ার’ পড়ার ইচ্ছা হলো। এটা মহান হোসাইন করতুক লিখিত সাতশত পঞ্চার একটি বই। সুনামে এর মীর নবাবের কাছে এ বইয়ের একটি কপি ছিল আর তিনি নিজেও একজন চিকিসত হিসেবে জম্মুতে কর্মরত ছিলেন। তিনি তাঁকে সে বইটি ধার দেয়ার অনুরোধ করলেন। তিনি বইটি ধার দিলেন এই শর্তে, বইটি রাত দশটায় দিনের আর ফরৎ দিতে হবে সকাল চারটা বাজে। হাকিম নূরুদ্দিন বইটি রাত জেগে পড়ে নোট নিলেন এবং যথা সময়ে ফেরৎ পাঠালেন। পরে তিনি নোটগুলো পড়ে বিষয়টি নিয়ে ভাবলেন, তিনি কোন এত শ্রমসাধ্য গবেষণা করলেন যদিও সে বিষয়ে তার কোন ধারণা ছিল না।

এর কয়েকদিন পর শেখ ফাতেহু মুহাম্মদ তাকে বললেন, তাদেরকে শহরের একজন সম্মানিত নাগরিক মিরাল লাল মুহাম্মদ বধশ সাহেবের সাথে রাতের খাবার বেঁধেছিলো। যখন তারা মেজবানের বাসায় যাচ্ছিলেন তখন শেখ ফাতেহু মুহাম্মদ তাকে বললেন, তাদের মেজবান একজন অতি সক্রিয় শিয়া আর তার সাথে শিয়া মতবাদ নিয়ে বিতর্ক করার জন্য তিনি একজন শিয়া মুজটাহাইদকে ডেকেছেন। বিতর্কের শর্ত হলো, যদি তিনি শিয়া মুজটাহাইদের মুখ্য ক্ষমাতে না পারেন তাহলে তিনিসহ উপাধিত সকল মুল্লীকে শিয়া মতবাদ গ্রহণ করতে হবে। ধরে নেয়া হয়েছিল, উপাধিত আলোচনা বয় মজার হবে। হীরাক নূরুদ্দিনকে এবিষয়ে পূর্বে জানানো হয়নি। তিনি শেখ ফাতেহু মুহাম্মদকে এমন হাস্যকর বিমোচন মত দেয়ার জন্য বকা-বকা করলেন। কিন্তু শেখ সাহেব তার প্রতিবাদকে খুবই হালকা ভাবে নিয়েছেন।

৬৬
মহারাজার চিকিৎসক

মিয়া এলাহী বখশের ঘরে আসার পর শেখ ফাতেহ মুহাম্মদ সাহেব তাঁর স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী শিয়া প্রতিষ্ঠানে আলোচনায় আমাদর জানালেন। প্রতিষ্ঠানটিত না এসে তাকে একটা বই ধরিয়ে দেয়া হলো। তিনি বইটি দেখে আনন্দিত হয়েছিল পাশাপাশি আমারও হলেন এবং লক্ষ্য করলেন, এটিতে ‘তবকাতুল আনোয়ার’। তিনি তাদাদাতি পড়া উলটিয়ে তা মিয়া এলাহী বখশের সামনে রেখে বললেন, কি সিদ্ধান্ত হলো। তাকে বলা হলো, আপনি পুরো বইটি পাঠ করুন। তিনি বললেন, তিনি বইটি পড়েছেন। তারা যদি চায় তা হলে তিনি এই বইতে প্রতিপাদ্য বিষয় সংগঠন বর্ণনা করে তা খবরও করতে পারেন। সেখানে উপস্থিত কতক শিয়া আলোম তাঁর কথা ধরার আগ্রহ প্রকাশ করলো। তাঁর বক্তব্যের দায়িত্ব পর তারা সবাই বাইরে গেল এবং সকলেই মতেক্ষে পোছেছিলো যে তারা বিতর্কের তাঁর প্রতিযোগী করতে পারবে না। মিয়া এলাহী বখশ চাকরকে খাবার পরিবেশন করার নির্দেশ দিলেন কিন্তু শেখ ফাতেহ মুহাম্মদ চিত্রক করতে থাকলেন, “আমরা খাবার চাই না আমরা বিতর্ক ঘন্তে চাই। আপনাদের মুক্তাভিত্তিকে নিয়ে আসুন。” কিন্তু কেউ এগিয়ে আসেনি। এর ফলে কেন বিতর্কই হলো না।

যেহেতু পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, মিয়া লালদিন জমুর একজন ধনবান এবং অতিসমানিত নাগরিক ছিলেন। কিন্তু তাঁর খুব একটা শিক্ষাদীক্ষা ছিল না। হাকিম নূরউদ্দিনের সাথে তাঁর খুব একটা বন্ধুত্ব ছিল না। শাইহোক, কিছুদিন পর রীতি-বহির্ভুক্তভাবে তিনি তাঁর সাথে দেখা করতে তাঁর বাড়ি যান। তিনি তাকে জানালার পাশে একটি বড় ককে একটি উচু আসনে উপবিষ্ট দেখলেন আর ককটি এমন মানুষের ভার ছিল যাদের সাথে তাঁর ব্যবসায়িক লেনদেন ছিল। তিনি পালিকামে তাদের কথা ধরে তাঁর করানিকে দিকনির্দেশনা দিচ্ছিলেন। হাকিম নূরউদ্দিন ধৈর্য ধরে সবার কাজ শেষ হওয়া এবং তাদের প্রহ্রানের আপেক্ষা করতে থাকেন। করানিকে ভাবলে, তিনি হয়ত তাঁর মালিকের সাথে এককাক্তিতে আলাপ করতে চান তাঁই বাইরে চলে গেলেন। হাকিম নূরউদ্দিন মিয়ালালদিনের বললেন, “আপনি এত বড় পদমর্যাদার একজন মানুষ যে একজন সাহারণ আলোম আপনাকে নসীহত করার সাহস রাখে না এ সত্ত্বেও সব মানুষেরই একজন হিতেপদেশদাতার প্রয়োজন। আমি জানতে এলাম, কে আপনার পরমশ্রদাতা?”

তিনি বললেন, “মৌলিক সাহেব! আপনি জানেন আমার শিক্ষা-দীক্ষা নেই তাই আমি সৃষ্ট ইশারা-হিতেপদেশে রুখি না।”

৬৭
হযরত মৌলভী নুরউদ্দিন (র.া.) - খলিফাতুল মসীহ আউয়াল

“ঠিক আছে, সহজভাবে বলছি। প্রত্যেক শহরের পার্শ্বে একটি পুরনো শহরের ধ্বংসাবশেষ থাকে, আর কোন স্থানে একজন ধনবান ব্যক্তির বাড়ির পার্শ্বে এমন দরিদ্র ব্যক্তির জীবন কুটিরও থাকতে পারে যে কেন যুগে ধনবান ছিল। এটা তাঁর জন্য শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে কাজ করতে পারে।”

“আপনি কথা উঠালেন তাই আপনাকে অনুরোধ করব, একটি বুঝে এ জনালা দিয়ে বাইরে তাকান। সেখানে আপনি একটি পুরনো দরজা দেখছেন যা আমার হিতোপদেশদাতা হিসেবে কাজ করতে পারে। আমি এ জনালার পাশে বসি, সরস্ময়ে সেটিকে সামনে রাখার জন্য। এ বাড়ির মালিক একাংশ ধনবান এবং এত উচ্ছম্বরাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন যে মহারাজার সামনে লাল ছাতা ব্যবহারের সম্মান তাকে দেয়া হতো। আমি এমন যার একটি কাল ছাতা ব্যবহারেরও অনুমতি নেই। এখন তিনি দারিদ্রের এমন সীমায় পৌছেছেন যে তাঁর স্ত্রী আমাদের রান্নাঘরে ধোয়া-মোছার কাজ করেন।”

“সতিকারের অর্থেই আপনার অন্য কোন হিতোপদেশদাতার প্রয়োজন নেই।”

হাকিম নুরউদ্দিন এ কাহিনী রাজার কাছে বর্ণনা করলে রাজা বললেন, “আমার বেশ কয়েকজন উপদেষ্টা আছে। যে স্থানে একজন মহারাজাকে অভিষিক্ত করার জন্য ধর্মীয় অনুশাসন হয় এর চারপাশে সেই সকল মানুষের জীবন শীর্ষ বসতি রয়েছে যারা এদেশের পূর্ববর্তী শাসকদের বংশধর। তারা আমাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে বাধা নয়। আমি যে স্থানে দরবারে বসি এর সামনে ধরনা দেখায় নামে একটি প্রসিদ্ধ শহর ছিল যা এখন ধ্বংসাবশেষ। বাহুদূর্গে সে সময়কার শক্তিশালী শাসকদের ক্ষমতার কেন্দ্র ছিল। আমার জন্য এর তুলনায় উত্তম উপদেশদাতা আর কে হতে পারে? সতিকারের অর্থে যাদের হাত থেকে আমরা ক্ষমতা গ্রহণ করেছি তারাও ভাল নসীহতকারী হিসেবে কাজ করছে।”

৬৮
অন্বেষণকারী - যাঁর অন্বেষণ

সুপণ্ডিত আলেম, দক্ষ চিন্তিলক, বিচিত্র সূক্ষ্ম ও আদর্শ মুমিন হিসেবে মৌলিক নূরউদ্দিন ইতিমধ্যে যথেষ্ট যশ ও খ্যাতি অর্জন করেছেন। দীর্ঘকাল ধরে তিনি একজন কামেল আধ্যাত্মিক অভিভাবক ও ধর্মীয় ধৃতর সমাজে ছিলেন। তিনি এমন ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাতের মৌলিক লাভ করেছিলেন যা একজন জানী, পরিশ্রম ও খোদাভূতির মাধ্যমে জীবনে অতিবাহিত করেছেন। তাই সিদ্ধান্ত এবং কল্যাণকর ব্যক্তি ছিলেন কিন্তু ইসলামের সুরক্ষা এবং অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলামের প্রশংসার ব্যাপারে তাদের উভয় একটি মাত্রায় ছিল না। তিনি মুসলমানদের মাঝে এমন একজন বীর পুরুষের আবির্ভাবের জন্য বিগলিত চিত্রে দোয়া করেছিলেন।

পরবর্তীতে তিনি তার জীবনের এই পর্য্যন্ত আরো ভাবায় লিখিত একটি স্রুতি পুনর্নিবেদন করেন। এর অনুবাদ নিম্নরূপ:

“আলাউর খানের যিনি অভ্যাচরণের প্রবৃত্ত অসীম দাতা, অনুষ্ঠিত দয়ালু এবং পুনর্নবীকৃত ধর্ম আলাউর যিনি বিশ্ব সত্যের প্রথম, পরম কর্মকার্য, অসীম দয়ালু এবং বিচার দিবসের মালিক। মানবকৃত নেতা, নীলী ও রূপোর শিরোমণি, নবীর মুহাম্মদ (S.A.W) এবং তার বংশধর ও তার সকল সাহাবীর উপর কল্যাণ ও পরিকল্পনা হয়েছে। সর্বশক্তিমান ও বিশ্বকর্তা খোদার এ দুর্বল ও অধ্যাত্ম দাস নূরউদ্দিন (খোদা তাকে সকল অর্জন থেকে রক্ষা করেন এবং তাকে এমন বাদামের অত্যন্ত করুণা যাকে তিনি নিরাপদ দিয়েছেন এবং তাকে তার নামের অর্থানুসারে সত্যির অর্থে ধর্মের ভূমিতে রূপান্তরিত করেন) তাঁর সমীপে নিবেদন করছে, যখন থেকে আমি সমসাময়িক যুগের মানুষ যে পাপে লিপ্ত সে সম্পর্কে অবগত হলাম আর ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে যে বিবর্তিত ঘটেছে তা লক্ষ্য করলাম আমি উত্তীর্ণ হিসাব দেওয়া ও করলাম যেন মহান আলাউর আমাকে এমন এক ব্যক্তির পানে পরিচালনা করেন যিনি ইসলামের পুনর্নবীকরণ করবেন আর ইসলামের দুর্জীবিধায় শ্রদ্ধা উপর আধ্যাত্মিক বোধ বর্ণ করবেন। এ আত্মীয় বাসনা পুরো হবার ব্যাপারে আমি একটি আশাবাদী ছিলাম।

কেননা মহামহামায়া খোদা যিনি সবচেয়ে বড় সত্যায়িত্য তিনি তার সুষ্টিতে এ শুদা সংবাদ দিয়েছেন, তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান অনে এবং সংকুচিত করে, আলাউর তাদের সাথে প্রতিফলিত যে তিনি অশুদ্ধ তাদেরকে পৃথিবীতে খলিফা নিযুক্ত করবেন যেভাবে তিনি তাদের পূর্বকালদেরকে খলিফা নিযুক্ত করেন।

৬৯
ফয়দত মৌলভী নূরউদ্দীন (রা.) - খলিফাতুল মসীহ আউয়াল

করেছিলেন। এবং তিনি তাদের জন্য সেই ধর্মকে সুদৃঢ় করবেন যা তিনি তাদের জন্য মননাীত করেছেন এবং ভয়-তীর্থিতপূর্ণ অবস্থার পর তিনি তাদের শাস্তি ও নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কোন কিছুতেই শরীক করবে না।' (সূরা নূর:৫৬)

তিনি হযরত মুহাম্মদ (সাহ) সম্পর্কেও বলেছেন, তিনি কামনা-বাসনার বশবর্তী হয়ে কোন কথা বলেন না, এটি খোদার তীর্থ। মহানবী (সাহ) সবচেয়ে সত্যবাদী এবং সবচেয়ে বিশ্বস্ত ছিলেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে তার অনুসারীদের মধ্য থেকে এমন লোক প্রেরণ করবেন যিনি তার ধর্মকে পুনরায় বিবেচিত করবেন। সুতরাং আমি এমন লোকদের অন্তর্ভুক্ত যারা তাঁর এ রহমতের অপেক্ষায় নেই। এ উদ্দেশ্যে সত্য ও নিষ্ঠার জোয়াতি যে স্থান থেকে

প্রকাশ পেয়েছে আমি সেখানে গিয়েছি অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্র ঘর পরিদর্শন করেছি। আমি খোদাজুরদের মাঝে তাঁর অবহেলণ বন-জল অতিক্রম করেছি এবং মরুপথ পাড়ি দিয়েছি। প্রবিত্ত মাহ নগরিয়ে আমার সবচেয়ে পবিত্র ও খোদাজুর ব্যাক্তি ইসরায়েল হেসাইন সাহেবের সাথে দেখা হয়েছে এবং প্রত্যেক শেখ মোহাম্মদ খায়রজী সাহেবের সাথেও দেখা হয়েছে। মদিনাতে আমার সম্মানিত মহান শিক্ষক শেখ আবদুল গনি মুজাফরী সাহেবের সাথে সহযোগ করায়ের মাহা নোভাড হয়েছে। তাদের সকলকে আমি মুতাকী ও পুণ্যবান মানুষ পেয়েছি। আমার প্রিয় মহানবীর জন্য মহান আল্লাহ তাঁদেরকে পুরুষ করেন (আমিন)।

পাঁচতা ও খোদাজুরদের দিক থেকে তাদের পদার্পণ অনেক বড় ছিল কিন্তু তাঁরা ইসলামের শরীরের বিরূদ্ধে দাবায়মান হন নি তাঁর সঙ্গে নিরসনের চেষ্টা করেন নি। তাঁরা নিরুত্তে ইবাদতে মন ছিলেন এবং নির্জনে তাদের খোদার কাছে দোয়া করতেন।

আমি একজন আলেমকেও খুম্বান, আর্ফ, ব্রাক্স, নাটিক, দার্শনিক, সন্দেহবাদী ও অন্যান্য ইসলাম বিশ্বাসীদের সামনে ইসলামের প্রচুর শিক্ষা তুলে ধরার কাজে নিয়োজিত পাইনি। অপরদিকে আমি দেখলাম, তাঁদের দশ লক্ষের অধিক মুসলমান ছাড় ধর্মশিক্ষা পরিত্যাগ করে পশ্চিমা বিষয়ের ও ভাষা বেছে নিয়েছে আর মুসলমানদের পরিবর্তে অমুসলমানদের সঙ্গে প্রাধান্য দিয়েছে।

ইসলামের বিরুদ্ধে প্রায় ছায়া কোটির বেশি লিফলেট, সাময়িকী ও বই-পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। এ কারণে প্রস্তাবঘন আলেমদের আমারা বললে চলি, অনেকরকমের ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো যা তাদের সাথে ধর্মীয় বিতর্কে লিপ্ত হওয়া উম্মতের প্রসিদ্ধ আলেমদের রীতি বহির্ভূত করূ।

70
আমাদের বেশিরভাগ আলেম জানেই না আসল চিত্র কি? আমাদের গবেষকদের সবচেয়ে বড় কাজ হলো প্রায় খোদাইচূড়া-এর বৃহা বিতর্কের লিপ্ত হওয়া যে আল্লাহ মিথ্যা বলতে পারেন কি পারেন না। সুতরাং তাদের কাছে ইসলামের শরীফদের মুখ বন্ধ করা বা তাদের যজ্ঞযুক্তকে নস্যাং করার মত সময় নেই।

আমাদেরকে এক্ষেত্রে অপরন্ত শেখ রহমতুল্লাহ, ডাঃ উলীল খান, দিল্লীর ইমাম আবুল মনসুর ও তনহীম কুরআনের লেখক সৈয়দ মোহাম্মদ আলি সাহেব এবং তাদের নয়ায় অন্যান্যদের অবদানকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করতে হবে। আল্লাহ তাহের প্রচেষ্টায় কল্যাণমূলক করুন। তিনিই সর্বমুক্ত মূল্যমন্ত্রকারী। কিন্তু তাদের সমুদ্র প্রচেষ্টা শুধু ইসলামের শরীফদের একটি শ্রেণীর বিবেকের পরিচালিত হচ্ছিল যার পিছনে ঐশ্বরিক নিদর্শনের কোন সমর্থন বা যার পক্ষে কোন ঐশ্বরিক শত্রুসংঘাতও ছিল না।

আমি সমস্যামূলক লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে কামনা ব্যক্তির সাক্ষাতের জন্য ব্যাকুল ছিলাম যিনি কবর মাঝে অনন্য হয়েন এবং যিনি ইসলামের সমর্থনে শরীফদের মুখ বন্ধ করার নিমিত্তে পুরো প্রতিষ্ঠা নিয়ে মহাদেব বাপিয়ে পড়বেন।

হেজাজ থেকে ফিরে এসে আমি চরম হত্যাকাণ্ডের ছিলাম। এক খোদাইব্যক্তিকের আহবানের অপেক্ষায় আমি একাকী আকুল হয়ে সহান অব্যাহত রাখি।

এমতাবশ্যক আমি এমন এক মহা সমাজের ব্যক্তির আগমনের সংবাদ পেলাম। যিনি একজন মহাদেবী পাঠিত, শমকুর মুজাহিদ এবং যুগের মহাদেব ও মহের এবং বারাহীনের আহমদীয়ার লেখক। কারণমণ্ডপ না করে আমি স্বয় তার সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলাম এবং তৎক্ষণ্ট বুদ্ধে পারলাম, তিনিই প্রতিক্ষিত হাকেম (মীমাংসাকারী) এবং তিনিই সেই ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা ধর্মকে পুনর্জীবিত করার লক্ষ্যে যাওয়া নিয়ূক্ত করেছেন। আমি তৎক্ষণ্ট খোদার ডাকে সাড়া দিলাম এবং খোদার দরবারে এ মহান পুরুষার জন্য কৃতজ্ঞতার নিদর্শনাত্মক সেজুন করলাম। তে মহা দয়ালু খোদা! সমস্ত প্রশংসা তোমার এবং তোমার অনুগ্রহের জন্য আমার বিনয়বন্ত কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করো। আমি যুগের মাহুকার চরণে নিজেকে নিবেদন করলাম এবং আত্মস্ফুরণ ও নিশ্চিত সাথে তার হাতে বর্যাত করলাম।

তার রেখে ও অনুরূপ আমার উপর চেয়ে গেল। আমি পুরো অতুলনিবেদনের চেতনা নিয়ে তাকে ভালবাসলাম। তিনি আমার সকল সম্পদ, আমার স্নেহ, সত্ত্ব-সহত্ত্ব, পিতামাতা, সকল আত্মীয়-জন এবং আমার প্রাণের চেয়েও আমার কাছে বেশি প্রিয়। তার জান, পাতিভূত এবং অধ্যাত্মিক বোধ-বুদ্ধি আমার হৃদয়কে জয় করেছে। আমি খোদার কাছে একান্ত কৃতজ্ঞ যে তিনি আমাকে
হযরত মৌলভী নূরুদ্দিন (রা.) - খলিফাতুল মসীহ আউয়াল

এ ব্যক্তির পানে পথ প্রদর্শন করেছেন। এটি আমার সৌভাগ্য যে আমি তাকে অন্য সবকিছুর উপর প্রাধান্য দিয়েছি এবং একজন বিশ্বস্ত সেবকের ন্যায় নিজেকে তার সেবায় উৎসর্গ করেছি যিনি নিজে কোন সমাজের মুখার্জক ছিলেন না। সমস্ত প্রশংসা পরম দয়ালু আল্লাহর যিনি আমার উপর বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন।”

ঘটনা যা ঘটেছে তা হলো, পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা মৌলভী নূরুদ্দিনের সাথে নবুওয়াত সম্পর্কে একটি দীর্ঘ আলোচনা করেন, যে বিষয়কে সে ব্যক্তি অবজ্ঞার সাথে অধিকার করতেন। কিছু অবশেষে তিনি ঘোষণা করলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা) সত্ত্বার অর্থেই খাতামানবীর্তা এবং তিনি আলোচনা আর দীর্ঘ করতে চান না। মৌলভী নূরুদ্দিন বললেন এটি খুব সহজ একটি ঘোষণা মনে হচ্ছে তিনি তাকে পরিক্ষা করার জন্য বললেন, আপনি এ কথার পক্ষে কোন যুক্তি দিন। তিনি উত্তর দিলেন, ‘আ-হযরত (সা) একাং বিজ্ঞ ও দুরদাসী ছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে মানুষের বোধ ও বুদ্ধির যেহেতু খুব দ্রুত উন্নতি হচ্ছে তাই মানুষ ভিত্তিতে আর নবুওয়াতের বিষয়ে বিশ্বাস করবে না তাই তিনি খাতামানবীর্তার হবার দাবী করে বসছেন।’ মৌলভী নূরুদ্দিন প্রচণ্ড ধাক্কা খেলেন এবং এ ধরনের চরম কান্দাজানহীন ও লাভ উভয় তার প্রচণ্ড ঘৃণা হলো। কিছুদিন পর রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী তাকে কান্দাজানের হযরত মির্যা গোলাম আহমদের একটি বিজ্ঞাপন দিলেন। এতে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তার সকল আপত্তির যথাযথ উত্তর ছিল, যে আপত্তি তাকে একাং মসীহীর্য দিয়েছিল। তিনি তখনই সেটি নিয়ে তার কাছে যান এবং বললেন, “নিন, ইনি এমন এক ব্যক্তি যিনি ওই লাভের দাবী করেন এবং বললেন, আল্লাহ তার সাথে কথা বললেন।” এককালীন উত্তরে সে ব্যক্তি বললেন, “এটি তেজে দেখার বিষয়।”

হযরত মির্যাসাংহের ঘোষণায় মৌলভী নূরুদ্দিন এমনভাবে আনেলিয়া হন যে তার সাথে সাক্ষাৎ ও বিষয়টি স্বয়ং যাচাইয়ের জন্য তিনি কান্দাজানের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। পুরো সকাল তাকে খোদার দরবারে পথপ্রদর্শন হবার জন্য বিনয়বর্ধন দোয়া করতে থাকেন। তার দূর্দণ্য লাভের পর তিনি নিম্নোক্ত তথ্যযুক্ত তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন, “তাকে দেখা মাত্রই আমার হৃদয় সাক্ষাৎ দিল যে, ইনি মির্যা। এবং আমি আমার জীবন তার জন্য উৎসর্গ করলাম।” এখনই তার অনুসারীদের সমান্তরালে তিনি যা অন্তর্ভুক্ত করছিলেন তা পেয়ে গেছেন। তখন তার বয়স ছিল তেতাহঁদি বছর।
অষ্টণব্দকারী - যার অষ্টণব্দ

তিনি হযরত মির্যা সাহেবের হাতে বয়ানাত নিতে চাইলেন কিন্তু হযরত মির্যা সাহেব উভয় দিলেন, "আমাকে এখনও বয়ানাত নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়নি। ঐশী দিকনির্দেশনা ছাড়া আমি কোন পদক্ষেপ নিতে পারি না।"

"তাহলে আমি কি এ নিষ্ঠয়তা পেতে পারি, যখন অনুমতি প্রাপ্ত হবেন তখন আমি বয়ানাত করার জন্য সর্ব প্রথম তাক পাবো?" তিনি বললেন, "এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিৎ থাকতে পারেন।"

"খেদার তালবাসা লাহের উদ্দেশ্যে আমি কি বিশেষ কোন সংগ্রাম করতে পারি?"

"হুমায়নেরা ইসলাম ধর্মের যে সমালোচনা করছে তা বুদ্ধন করে একটি পুনর্গঠন চান করুন।"

তিনি নির্দেশ পালনের মনস্ত করলেন, যদিও তিনি হুমায়ন সম্পর্কে খুব একটা জানতেন না। আর হুমায়ন নেতারা ইসলামের যে ধরনের সমালোচনা করতো, তা- ও তার বিশেষ একটা জানা ছিল না। অধিকতর তিনি জমরুতে বেশ বস্ত থাকতেন।

তিনি প্রেমজ্ঞাত পাড়াশোনা, গবেষণা ও উদ্দেশ্য লেখার সময় কোথায় পাবেন তা তেমন পেলেন না।

কাদিয়ান থেকে বিদায় নেবার পর জন্ম যাওয়ার পূর্বে তিনি তার নিজ গ্রাম ভেরা গেলেন। সেখানকার মসজিদের ইমাম তার সহপাঠী এবং কুরআনের হাফেজ ছিলেন। তিনি তখন সম্পর্কে তার সাথে আচর্জনক লুটিতপূর্ণ আলাপ- আলোচনা আরম্ভ করলেন। অন্যদিকে তখন চলে গেল এবং তিনি ইমামকে একা পেয়ে বললেন, "হাফেজ সাহেব! আমি দেখতে পাচ্ছি আপনার উপর হুমায়নের প্রভাব পড়ছে।" তিনি উত্তর দিলেন, "হুমায়নের কর্তৃ কি?" তিনি প্রায় দিলেন, যে পাঠত্র সাথে ইমাম সাহেবের পরিচয় আছে তার কাছে গিয়ে আলোচনা করা উচিত। ইমাম সাহেব একমত ছিলেন। তিনি তাকে পিঁদাদান করে ইসলামের ইউরোপিয়ান মিশনারীর কাছে নিয়ে গেলেন, যেখানে তাদেরকে সাধারণ জানালেন এবং আতিথেয়তাসূচি ব্যবহার করলেন। কিন্তু তাকে আলোচনায় সম্মত করা গেল না। শেষের দিকে তিনি বললেন, ইসলাম সম্পর্কে তিনি তার আপনির লিখে পাঠিয়ে দেবেন। মৌলী নবীউদ্দিন ইমামকে বললেন, "হাফেজ সাহেব! আপনি কি বাংলায় (হুমায়নের দীক্ষিত হওয়া) হবার পূর্বে আপনি অপরিচূরুলো ও তার উত্তর পড়ার অপক্ষা করবেন?" ইমাম সাহেব বললেন, ভাল কথা। পাঠ্য সাহেবও এ বিষয়ে মতভেদ্য প্রকাশ করলেন।
হযরত মৌলভী নূরউদ্দীন (রা.) - খলীফাতুল মসীহ আউয়াল

মিশনারীর ঘর থেকে বিদায় নেয়ার সময় মৌলভী নূরউদ্দীন ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, “আপনার মত একই অবস্থায় আম এলাকায় আস কেউ আছে কি?” তাঁকে বলা হলো, স্টেশন মাঠারও একই চিত্র-ভবন রয়েছে। তাঁরা উভয়ই স্টেশন মাঠের কাছে গেলে তিনি বললেন, আজ কোন ধর্ম কৃত্তিকের মোকাবিলা করতে পারবে না। তিনি অবশ্য এটি শুনে আশ্চর্য হলেন যে মিশনারী মৌখিক আলোচনায় করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন আর তিনি পাঠীর আপত্তিগুলো ও তার খগন পড়ার জন্য আপেক্ষা ব্যাপারে একমত হলেন। আপত্তি বহুমুখী ও ব্যাপক ছিল। এটি স্থির হলো, এর উত্তর প্রস্তুত করতে এবং ছাপতে এক বছর সময় লেগে যাবে।

সে বছর পাহাড়ি এলাকায় একের পর এক তুষিকম হতে থাকে। এতে যে ভীতির সংগ্রাম হয় পুকুরের রাজপুত্র এতে পাগল হয়ে যায়। রাজা জমুর মহারাজকে যুবরাজের চিকিৎসার জন্য কোন দক্ষ ডাক্তার পাঠানোর অনুরোধ করেন। মহারাজা হাজারীম নূরউদ্দীনের নাম প্রস্তাব করলেন এবং তিনি পুঞ্জ গেলেন। তাঁকে শহরের বাইরে থাকার জন্য আরামদায়ক বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেয়া হলো। একমাত্র সে রোগীর দেখানিয়ার ছিল তাঁর দায়িত্ব। সেই সুবাদে কুরআন ও বাইবেলের তুলনামূলক অধ্যয়ন এবং খৃষ্টান মিশনারীর আপত্তি খননের নিমিত্তে নেট প্রস্তুত করার জন্য তাঁর কাছে যথেষ্ট সময় ছিল। পুরো প্রস্তুতি সম্পন্ন করে তিনি চার হেম সে আপত্তিগুলোর উত্তর লিখেন। তিনি এর নাম রেখেছেন 'ফসলুল খেতাব'। যখন পাপুলিপির কাজ সমাপ্ত হয় হয় তিড়ক সে সময়ে যুবরাজের পুরোপুরি আরোগ্য লাভ করেন। পুকুরের রাজা কৃতজ্ঞতার নিন্দনিষ্কর্ষ হাজারীম সাহেবকে করে হাজার রূপীর একটি থালি উপহার দেন। যখন জমুর আসেন মহারাজা তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, রাজা আগনাকে কত টাকা দিয়েছেন? তিনি পুরো টাকার থালিটি রাজার সামনে রেখে দেন। মহারাজা তাঁকে অতি সামান্য পরিশ্রমিক দেয়া হয়েছে দেখে প্রচণ্ড কুটুর হন। মহারাজা বলেন, জমুর কোষাগার থেকে এর সাথে তাঁকে পুরো এক বছরের বেতন-ভাগ্ন প্রদান করা হোক। তিনি পুরো টাকা এবং বই এর দুটো খাল, ছাপর জন্য দিল্লীর একজন প্রকাশকের কাছে পাঠান। মুদ্রণ কাজ শেষ হবার পর তিনি অন্যান্যের পাশাপাশি বই এর এক একটি কপি স্টেশন মাঠের এবং ভেরার ইমামকে পাঠান। তারা প্রত্যেকে লিখেছেন, বইটি মন দিয়ে পড়ার ফলে তাদের সকল ভূল ধারণা দূরীভূত হয়েছে। আর তাঁরা এখন পুরো আনুষ্ঠানিক সাথে ইসলামের সত্যতায় বিশ্বাস। অন্য কোন কিছুর আর প্রয়োজন নেই।
হযরত মির্জা গোলাম আহমদের সাথে মৌলিক নুরুদ্দিনের সীমিত যোগাযোগ ছিল। তিনি তার পত্র ও লেখনী মাধ্যমে অব্যাহত নিদর্শন ও অনুপ্রেরণা নিয়ে কথা করতে থাকেন। সকল বিষয়ে তিনি তার পরামর্শ চাইতেন। মৌলিক নুর উদ্দিনের রেশম কর্তকজন সত্যান শেখরের সুন্দর স্বরাগ একের পর এক মাত্র যায়।

প্রত্যেকবার হযরত মির্জা সাহেব তার বেলান লায়ন করা, সাহিত্য প্রাদেশ, খোদার সত্যান উপর তার দৃঢ় ঈমানকে আরও দৃঢ় করা এবং খোদার উপর নির্ভরশীলতার মানকে আরও উন্নত করার পরামর্শ দিয়ে তাকে পত্র লিখেন। একটি প্রস্তাবিত পত্রে তিনি তাকে নিম্নলিখিত তত্ত্বাবধায়নে ঢাকা দেওয়া করার উপরের নিয়ম দেন। 'হে আমার প্রভু! কুপাশীল খোদা, আমি তোমার এক অযোগ্য সৃষ্টি, দৃঢ়প্রানু পাপী এবং উদাসীন। তুমি আমার হাতে অন্যায়ের পর অন্যায় হতে দেখেছ কিন্তু তোমার পক্ষ থেকে তুমি অনুগ্রহের পর অনুরাগ করেছ। তুমি আমাকে পাপের পর পাপ করতে দেওয়া আর পুরুষকারের পর পুরুষকার দিয়েছ। তুমি সদা আমার দেশ-ক্রমে দেওয়া বেঁচে এবং আমাকে তোমার অন্তর্গত পরুষকারে ভূষিত করেছ। আমি অনুরোধ করছি আমার অস্মত পাপীর প্রতি পুনরায় সর্বকাল এবং তার অযোগ্যতা ও অক্ষতত্ত্বকে ক্ষমাসূচনা দূরবর্তী কর। তুমি দয়া প্রবর্তন কর আমার এ দুঃখ থেকে আমাকে মুক্ত কর। কেননা তুমি ছাড়া অন্য কোন পাপের নিষেধাজ্ঞা নেই।'

মৌলিক নুরুদ্দিন নিজেও সম্পূর্ণভাবে হযরত মির্জা সাহেবের জন্য নিবেদিত ছিলেন আর কোনো কিছুই তার কাছে গোপন রাখতেন না। একবার তিনি তার পক্ষ থেকে একটা দায়িত্ব প্রাপ্ত হন, যা নিম্নলিখিত ভাবায় প্রকাশ করা হয়: "পঞ্চিত লেখক আমার বই বারীনে আহমদের কথার মন্দিরে সম্প্রতি একটি বই ছাপিয়েছ, এতে সে আমকে অপলাপ করেছে আর সে এর নাম রেখেছে 'তরকমী বারীনে আহমদের কথন'। মিশ্যাচরিতায় এ পুটি এবং এ ভেষজের অনবিকলতে উদ্ধৃত দেয়া এবং এর অর্থবুদ্ধি করা আবশ্যক। আমি 'সিকালে মুনিন' নিয়ে অভিযুক্ত ব্যবহার করি আমার কাছে এর উত্তর দেয়ার কোন অবকাশ নেই। আবার তাতালা আমার হাতে এ বিশ্বাস গেটে দিয়েছেন, ইসলামের ধর্ম তার মত এর উন্নয়ন এবং আমাকে এ কাজে সাহায্যের এমন আগ্রহ আপনি ছাড়া আমি অন্য করো মাঝে দেখি না। আমি যে একটাটি বলছি তা বাড়িয়ে যা আপনার প্রশ্নের আদিশেষ বলছি না। অধিক আমি বলব, আপনি কোথা করে এ বইটি আদোগাপাট প্রণীত পানু আর লেখক ইসলামের বিরুদ্ধে যেন আপনি উদাহরণ করেছে এর একটি তালিকা প্রস্তুত করব এবং প্রতিটি আপনির সবচেয়ে মুখ্যতের কি হতে পারে তা নিয়ে চিন্তা করব। এরপর আবার আপনাকে যে উত্তর শিখাতে এর এক-একটি আলাদা-আলাদাভাবে লিপিবদ্ধ নয়।
হযরত মৌলিক নূরউদ্দিন (রা.) - খলীফাতুল মসীহ আউয়াল

করুন এবং আমার কাছে প্রেরণ করুন। যে সকল আপনি আমার সাথে সম্পর্ক রাখে সময় বের করে আমি এর উপর আলোকপাত করবো। এটি একান্ত ওকুন্তপূর্ণ একটি কাজ। তাই আমি আপনাকে আত্মরক্ষক অনুরোধ করবো। আপনি পুরো মনোযোগ, উদ্দিনান্দীনা ও তার গুরুদের প্রেরণ নিয়ে এ কাজটি করুন। আপনি যেরূপে আমাকে আত্মরক্ষক সাহায্য করেছেন ঠিক সেভাবে আপনার খোদা-প্রধান যোগ্যতা এবং বুদ্ধি দ্বারা আমাকে সাহায্য করা উচিত।

আমাদের শক্রা সকলেই আজ আমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ এবং ইসলামের দুর্নাম রটানোর সকল অপেক্ষায় লিপ্ত। আমার মতে যে এখন ময়দানে এসে ইসলামের পক্ষে সংঘর্ষ করবে সে নবীদের কাজ করবে। আমার প্রেরণ সতর্ক উত্তর দিবেন। আল্লাহ আপনার সাথী হোন এবং আপনাকে সাহায্য করুন।’

মৌলিক নূরউদ্দিন ‘তসদীক বারাহীনে আহমদীয়া’ (বারাহীনে আহমদীয়ার সত্ত্যায়ন) প্রণয়ন করে এ দায়িত্ব খুবই সুদর্শনভাবে সম্পাদন করেছেন।

একবার তিনি জুব ও মারা একের মাথা ব্যাপক যায়ের আচেত হন আর তার রোগ দীর্ঘমুহুৰ্ত্ত হতে থাকে। তার রোগের কথা জানতে পেরে হযরত মিরদা সাহেব তাকে লিখলেন, তিনি তাকে দেখার জন্য জমিয়া আসছেন এবং লিখেছেন: তার জন্য দোয়ার উৎক্ষেপ আল্লাহ তাকে জানিয়েছে, তিনি যখন আসবেন তাকে সুস্থ পাবেন আর কাষ্ট তা-ই হয়েছে। হযরত মিরদা সাহেব জমিয়াতে তিনি দিন অবস্থান করেছেন।

জমিয়া ও কাশীরের কয়েক বছর অতিবাহিত করার কল্যাণে মহারাজা ও পুঁজীবন রাজার সাথে মৌলিক নূরউদ্দিনের অতি আত্মরক্ষক সম্পর্ক গড়ে উঠে। রাজ প্রাসাদের অভ্যাসক্রিয় কিছু মজার বিভিন্ন সম্পর্কের তার ধারণা হয়। কিন্তু তিনি সাধারণের এর সাথে দুর্নাম বজায় রাখতেন। মহারাজা সম্পর্কে তার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের সকল প্রচেষ্টা তিনি দৃঢ়ঢাঁই সাথে প্রত্যাহার করেছেন। কেন বিধাশীল ছাড়া রাজার প্রতি বিশ্বস্ততার কথা তিনি এভাবে প্রকাশ করতেন, ‘রাজা আমাকে বিশ্বাস করেন তাই আমি বিশ্বাসগায়ত্তক করব না।’

পুঁজীবন রাজা তার জন্য বাংলার ভাষা নিদর্শন করেছিলেন। তিনি যখন জমিয়া আসতেন তিনি তার পরিচয় করতেন। এমন এক দিন রাজা কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়েন। মৌলিক নূরউদ্দিন তাকে দেখে একটি ব্যবস্থাপনা লিখে দেন। যখন তার ফিরে যাবার সময় হলো তখন কেউ তাকে বললো, রাজার একজন কর্মচারী তাকে তার সাথে দেখা করার অনুরোধ করছেন। মৌলিক সাহেব বললেন, “আমার

৭৬
বাসস্থান তাঁর বাড়ির পথে, তিনি পথে যাত্রা বিরতি দিয়ে আমার সাথে দেখা করতে পারেন।” একথা যখন কর্মচারীকে জানানো হলো তিনি ক্ষেপে গেলেন এবং বললেন, “মনে হয় নূরউদ্দীন অহংকারী হয়ে উঠছে। আমি তাঁকে আর রাজার চিকিৎসা করতে দেবো না।” এরপর কনয়েন্দ্র তাঁকে রাজার কাছে ডাকা হয়নি।

এরপর একবার মহারাজাকে লাহোর যেতে হয়, তাঁর সাথে পুরুষ রাজাও ছিলেন যিনি লাহোরে অসুস্থ হয়ে পড়েন। যেহেতু সাথে অন্য কোন চিকিৎসক ছিল না তাই তিনি দুপুরে মৌলভী নূরউদ্দীনকে লাহোরে ডেকে পাঠান। তিনি যখন এলেন তখন রাজা তাঁকে বললেন, “আপনার চলমান বছরের ভাতা আপনাকে দেয়া হয়নি আমি বলবো মেন দুবছরের ভাতা আপনাকে অনন্তিবিলেম পাঠিয়ে দেয়া হয়।” মৌলভী নূরউদ্দীন সাহস করে বললেন, “আপনি এ অসময়ে হয়ত আমাকে এজন্য ভাবিয়েছেন পাচ্ছে আপনার বেতনভোগী কর্মচারী জেলে না যায় যে আমি আপনার কাছে এসেছি। সে দেখা করতে না যাওয়ার কারণে আমার প্রতি অস্তিত্ব। তাই যদি হয় তাহলে আমা ধরা আপনার চিকিৎসাকে সে পছন্দ করবে না আর আপনার কোন ক্ষতি করতে পারে।” রাজা শীকার করলেন, “আমাদেরকে এদের ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে। এমন পিশাচদের জন্য বিষের আশয় নেয়া অসম্ভব কিছু নয়।”

তিনি রাজার চিকিৎসা করতে থাকেন কিন্তু রাজার স্বাস্থ্যের ক্রমান্তর হতে থাকে আর পুনর্বার সামান্য কিছুদিনের মাধ্যমে তিনি মারা যান। কেউ মৌলভী নূরউদ্দীনকে সাবধান করলেন, মুহুর্ত রাজা যার তিনি দীর্ঘ অসুস্থতার সময় চিকিৎসা করেছেন এবং যিনি তাঁর সাথে সবসময় বদক্ষাবাদপন্ন ছিলেন, তাঁর স্বাস্থ্যের প্রতি সঠিক মতচ্ছলক ভূল চিকিৎসা প্রয়োগ এমনকি বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে সন্দেহে তাকে বিচারের কাঠ গড়া দাড় করানোর কথা ভাবছেন। তিনি অনুভব করলেন যে ক্রুদ্ধ কর্মচারী হয়ত যুবরাজের কাছে তাঁর বিিুদ্ধে বিমোচক করেছে। যাহোক বিষয়টি আর এগেনি।

মৌলভী নূরউদ্দীন যোগ্য ও মেধাবী ছাত্রদের মেধা বিকাশের জন্য সাহায্য করার ক্ষেপে ছিলেন উদারহত্য। একবার তিনি প্রায় এক ডজন ছাত্রকে ইসলামি সেবার জন্য আর্থিক, পুরুষ, সংস্কৃত এবং ইংরেজীর মত ওরোপুরুষ ভাষায় এক, দুই বা কয়েকটিটে দক্ষতার নিমিত্তে প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা হতে লিলেন। এ প্রজেক্টের জন্য তিনি বেশ বড় অংশ খরচ করলেন। কিন্তু সম্মেল নির্বাচিত ছাত্ররা

77
হযরত মৌলভী নুরুদীন (র.া.) - খলীফাতুল্লাহ মসীহ আউয়াল

যখন তাদের প্রশিক্ষণ শেষ করলো তাদের এক জনের মধ্যেও সে কাজ আরম্ভ করার আগ্রহ দেখা গেল না যা তাদের পৃষ্ঠপোষকের অভিপ্রায় ছিল । তিনি নিরাশ হলেন কিন্তু তাদের প্রতি কোন আক্রমণ প্রকাশ করেন নি আর তিনি হতে দিলে বিধানগুলো হন নি।

১৮৮৬ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী হযরত মির্যার সাহেব এক স্তন্নের জন্য সম্পর্কে বিজ্ঞাপন অসাধারণ একটি বিবিধতাবিশিষ্ট প্রচার করেন। আল্লাহর বিশেষ কৃপায় যাদের বিরল সুমহান গুণাবলী ও মেধাসম্পন্ন হবার কথা এবং সেসব গুণাবলীর একটি অংশ ইহলামে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে “সুন্দরন, নয়নমণি, সুমহান, সমাঙ্গ, অন্যান্য ও অন্য খোদার বিকাশ এবং চিরস্থায়িত এবং চিরউত্তর সত্যত বিকাশশুল”।

১২ই ফেব্রুয়ারী ১৮৮৯ সনে সে স্তন্নের জন্য হয়। সে বছরটি ধর্ম ও ইসলামের ইতিহাসে এবং মৌলভী নুরুদীনের জীবনে একটি অসাধারণ মাইল ফলক প্রমাণিত হয়। সে বছর জামাতে আহমদীয়ার ভিত্তি রাখা হয় আর একই বছর বিভিন্ন ঘটনাগুলো এদিন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে যা মৌলভী নুরুদীনের জীবনকে প্রভাবিত করে। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হচ্ছে।

তাঁর দুর্বল বিয়ের হয়। কিন্তু সকল পুত্র স্তন্নের উদ্দেশ্যে ইতেমাদ করে। হযরত মির্যার সাহেবের একাত্ত ইচ্ছা ছিল তিনি মেয়ে পুরুষের বিয়ে করলেন এবং দোয়া করলেন। আর উপযুক্ত পাত্রী ও সন্ধান করলেন। অবশেষে ২৩শে জানুয়ারী ১৮৮৯ এর পরে তিনি পরামর্শ দেন, লুধিয়ানা নিবাসী দিল্লীর হযরত সুফী আহমদ জানের কন্যা সোগরা সেগমের সাথে মৌলভী নুরুদীনের বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার কথা ভাবা উচিত।

প্রস্তাব দেওয়া হলো এবং গৌরবী হলো। বিয়ের হয় ফেব্রুয়ারীতে আর মেয়েকে ১৮৮৯ সনের মার্চ মাসে উঠিয়ে আনা হয়। আল্লাহর ফয়লে এ বিয়ে সুখকর ও সফল প্রমাণিত হয়েছে। আর এ দম্পতির ফুলের মধ্যে চারজন প্রাণন্ত হলে তিনজনের যথাসময় বিয়ে হয় এবং সন্তানের সংস্থার হয়। কন্যা আমাতুল হাই প্রাপ্তবয়স্ক হলে হযরত মির্যাদ গোলাম আহমদ (আঃ)-এর সেই প্রতিশৃঙ্খল পুনর্ব সাথে তার বিয়ে হয় যার জন্য হয় ১৮৮৯ সনের ১২ ফেব্রুয়ারী।

হযরত মির্যাদ গোলাম আহমদ ১৮৮৯ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারী ঐশী দিকনির্দেশনা অনুসারে তাঁর জামাতের ভিত্তি রাখেন এবং বয়াআব্দের সর্তাবলী নির্ধারণ করেন। পরবর্তীতে তিনি ১৮৮৯ সনের ২৩শে মার্চ তারিখে লুধিয়ানায়

৭৮
তার শিখাইলে যোগাযোগ নোর তালিকা নির্ধারণ করেন। জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার হাতে মৌলিক নুরউদ্দীন সর্বপ্রথম যোগাযোগ এগোন করেন। এর অর্থ হলо সম্পূর্ণ এবং স্বায় অগজিকার যা তিনি অনুকরণীয়ভাবে পুনঃনুপুঁঞ্চরুপে পালন করেন। তার জীবনের পরবর্তী অংশ যোগাযোগের অধীনের পালনের একটি ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত ছিল।

যোগাযোগের পর তিনি জমু ফিলে আসেন। কিছু পত্রালাপ ও বারাবার কাদিয়ন গমনের মাধ্যমে নিজ আধ্যাত্মিক ওরুর সাথে মোগাযোগ অবহাও রাখেন এবং সেথায় তিনি কীটা ইটের সাদামাটা একটি ঘর নির্মাণ করেন।

তার অনুপস্থিতিতে ১৮৮৯ সালের মে মাসে ভোরায় তার মাত্রবিশাল ঘটে। ১৮ বছর পূর্বে যখন পারিকায় প্রত্যেক দিন তুর্কি-রাশিয়া যুদ্ধের হতাহতের সংবাদ ছাপছিল তখন একদিন তিনি তার মাঝে বললেন, আপনার ৮জন চেলেমেয়ের মাঝে আমি ছাড়া সবাই বিবাহিত হলেন। আপনি যদি অনুমিত দেন তাহলে আমি আমার জীবন ধর্মের সেবার জন্য উৎসর্গ করতে চাই। তিনি অন্তর্হিত হলেন এবং বলে বসলেন, “আমি জীবিত থাকতে তা কিভাবে হতে পারে!” তিনি তখন আর জের দেননি। এরপর তার ভাইয়েরা কিছুদিন পরপর একের পর এক মারা যেতে থাকেন। প্রত্যেকের মৃত্যুর পর তাদের বিধবারা নিজ নিজ তুলে-তুলা নিয়ে পারিবারিক বাসভাবন ছেড়ে চলে যায় আর এভাবে ঘর খালি হয়ে যেতে থাকে।

একবার তিনি ব্রিটেনের মাঝামাঝি জমু থেকে মাঝের সাথে দেখা করার জন্য বাজি আসেন। দুপুরের খাবারের পর তিনি যখন আরাম করছিলেন তখন হঠাৎ করে পার্শ্বের ঘর থেকে মাঝের বুদ্ধির কানার চিত্কারে তিনি জেগে উঠেন। তিনি বললেন, ইন্দা লিথার্চ ওয়া ইন্দা ইলাইহে রাজেউন (২.১৫৫)। তিনি তার কাছে গেলেন এবং বললেন, এমন দোয়া যার আল্লাহর ইচ্ছার সামনে বিপুল আত্মার্পণের অর্থ রয়েছে তা আত্মার চর পড়া উচিত নয়। এরপর তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি কি জানেন, এ বিশাল ঘর আজকে কেন জানানবশ্যন্তৃা।” তিনি বললেন, “বেশ কয়েকবছর পূর্বে তুমি যা বলেছিল তা আমার মনে আছে। আমার প্রত্যেক ছেলের মৃত্যুর পর সে কথা আমার সমর হয়েছে।” তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি কি অন্য কিছু অনুপাতের করেন?” তিনি বললেন, “হা, আমার মৃত্যুর সময় তুমি আমার কাছে থাক আর সবচেয়ে দেখা শনা কর। আমার এই প্রথম বাসনা সেবাও আমার মৃত্যু হবে তোমার অবর্তমান।” আর তাই হয়েছে। তিনি জমু ছিলেন এবং সময়মত পৌছতে পারেন নি।

79
হিজরত

মৌলভী নূরউদ্দীন আরও তিন বছর মহারাজার চিকিৎসক হিসেবে কাজ করতে থাকেন। সে কাজে তিনি সম্ভব ছিলেন আর কাজ পরিবর্তনের কোন কারণ দেখছিলেন না। বিভিন্ন ধরনের যত্নময় হতে থাকে। কিন্তু যতদিন তাঁর উপর মহারাজার আস্থা ছিলো অন্যকিছু নিয়ে তাঁর চিন্তা হতো না।

১৮৯২ সনে রাজা সুরুজ কাউল রাজ্যপরিষদের সিনিয়র পারিষদ ছিলেন। কিছুদিন ধরে তিনি কিডনীর ব্যাধাস্থ ভুগছিলেন এবং তিনি চাইলেন যেন মৌলভী নূরউদ্দীন তাঁর চিকিৎসা করেন। পরিক্ষা-নিরীক্ষার পর তিনি কিডনীতে পাথর চিহ্নিত করে তাকে যথাযথ পরামর্শ দিলেন। রেণী অত্যন্ত স্নেহে যান এবং বলেন, "আপনি কি জানেন না, আমার অধীনে সাত জন ইউরোপিয়ান ডাক্তার কাজ করছেন?"

(তিনি বললেন) "এর সাথে কিডনীর পাথরের কোন সম্পর্ক নেই।"

"তাছাড়া আমার এক ছেলেও ডাক্তার?"

"ডাক্তারের পিতার কিডনীতে পাথর হবে না এমন কোন নিষ্কয়তাত্তে নেই।"২২

রাজা রেণীর যান এবং হাকিম সাহেরকে বিদায় দেন। কিছুদিন পর লাহোরের মেডিকেল কলেজের কর্নেল পেরী এবং আর একজন ব্রিটিশ সাজর্জন কোন কারণে জম্মু যান এবং মহারাজা তাদেরকে রাজা সুরুজ কাউল-এর রোগ নির্দেশ ও চিকিৎসার অনুরোধ জানান। পরিক্ষা-নিজীক্ষাকালে রাজা তাদেরকে জানান, একজন হাকিম বলেছে, তাঁর কিডনীতে পাথর হয়েছে। তখন কর্নেল পেরী তাঁর সাথীকে ছিন্ন করে পাথর খুঁজতে বললেন। কিন্তু কোন পাথর পাওয়া যায়নি। কর্নেল পেরী ছুরি নিজ হাতে লিনেন এবং বড় করে কেটে পাথর খুঁজে গেলেন এবং বের করে নিয়ে এলেন। উভয় সাজর্জন হাকিম সাহের দক্ষতার প্রশংসা করলেন।

সুহৃত্তার পর রাজা সুরুজ কাউল পুনরায় মৌলভী নূরউদ্দীনকে ডেকে পাঠালেন। কিন্তু তিনি যেতে অশ্লীল করলেন। তিনি জানতেন যে রাজা তার প্রতি সত্যিকার রাখেন না তিনি সেখানে গেলেও সম্পর্কের উন্মুক্তি হবে না। মনে

৮০
হিজরত

হচ্ছিল যে রাজা মৌলভী নূরউদ্দিনকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়ার বিষয়ে মহারাজাকে মানিয়ে নিয়েছিলেন আর হয়ত পরিষদে তাঁর সহকর্মীদের নিকট উল্লেখ করে থাকবেন। পরিষদদের একজন ছিলেন বাগ রাম। তিনি তাঁর সাথে দেখা করে তাকে বললেন, মহারাজার নিকট পদত্যাগ পত্র দাখিল করা তাঁর জন্য ভাল হবে। তিনি তাকে বললেন, জীবিকার উৎসকে বেছেছি নিজ হাতে বস্ত্র করে দেয়াকে ইসলাম অনুমোদন করে না। তাছাড়া তিনি মনে করেন, এভাবে পদত্যাগ করা রাজার প্রতি অবুদ্ধতার নামাঙ্গ হবে। কিছুদিন পরে তিনি পত্র পেলেন যে তাঁর চাকরি আর নেই।

তিনি তৎক্ষণাং স্বয়ং আধ্যাত্মিক গৌরবে তা জানালেন। তিনি প্রতাপের বললেন, "আল্লাহর কোন বান্দার প্রতি ভালবাসা প্রকাশের একটি মাধ্যম হলো তাকে পরিবার করা। এটি এমনই একটি পরিক্ষা আর এতে ভাল পাবার কিছু নেই। আল্লাহর ভাল জানেন কি পরিমাণ এবং কত আত্মরক্ষণাত্মক আমি আপনার জন্য দোয়া করেছি। আমি একটি আশাবাদী উত্তরের আশায় দোয়া অব্যাহত রাখবো। একজন নিষ্কাসন প্রাণ বন্ধুর জন্য দোয়ায় যেমন প্রভাব থেকে থাকে আপনার জন্য আমার দোয়ায়ও সে বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আমাদের সর্বভিত্তি, চিরকাল সর্বভিত্তিকন বাদশাহ এবং প্রভু, যার দরবারে আমরা সদা সেজালেন, তাঁর শক্তি, কর্মণ্ডল ও দানের উপর আমাদের যে কেমন বিশ্বাস রয়েছে আর সে বিশ্বাস যে কত গভীর তা ভাষায় প্রকাশ করা সন্দেহ নয়।"

মৌলভী নূরউদ্দিন রাজার কোষাগার হতে বেশ বড় অংশের বেতন পেলেন। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে তাকে বিভিন্ন প্রকার মূল্যবান উপহারও দেয়া হতো। সব মিলিয়ে তাঁর যথেষ্ট আয় ছিল। এর পুরোটাই তিনি মহান উদ্দেশ্যে ব্যয় করতেন; যেমন এক্সিমিয়া, বিবি, হাট এবং দরিদ্রদের কল্যাণেও এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। একজন হিন্দু দোকানদার প্রয়োজন তাকে ভারী দুর্দানের জন্য কিছু সহিষ্ণু করার পরামর্শ দিতো। তিনি বলতেন, আল্লাহর উপর তাঁর যে পূর্ণ ভরসা আছে এটি এর পরিপূর্ণ কাজ হবে। আর আল্লাহ সবসময় তাঁর চাহিদা পূর্ণ করবেন। যে দিন তিনি চাকরি হতে অব্যাহতি পত্র পেলেন দোকানী তাঁর কাছে এনে এবং জিজ্ঞাসা করল, "আমার পরামর্শে মনে আছে মৌলভী সাহেব!" তিনি বললেন, তিনি তাঁর পরামর্শকে বরাবরের মত এখনও যুগান করেন।

দোকানীর সাথে কথা শেষ হবার পূর্বেই রাজা কোষাগারের এক বার্তাবাহক কোষাগারের পক্ষ থেকে তাকে একটি পত্র দিল যার সাথে তিনি সে মাত্রে যত
হযরত মৌলভী নূরউদ্দীন (রা.) - খলিফাতুল মসীহ আউয়াল

দিন কাজ করেছেন এর বেতন বার্ত ৪৮০ রূপী ছিল। এতে দোকানদার অস্পষ্ট হলো এবং ভাবল, এটি কোষাগার কর্মকর্তাদের কাজজন্য হিসেবে নিয়ে তাদের সামনে উপস্থিত ছিলো। সাথে রানী এ জন্যও কোষা 
চেয়ে পাঠিয়েছেন যে এ মুহূর্তে এর তুলনায় বড়ো অর্জন দেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল 
না। দোকানী পুরোপুরী কারু হয়ে গেলো নিজের লজ্জা ঢাকার জন্য সে বিড়বিড় করে বললো, "ভাল কথা। কিন্তু আপনি তো এক ব্যক্তির কাছে প্রায় দু লক্ষ রূপ 
পী জোন। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি তা পরিশোধের সম্ভাবনা যখন হবে তখন ব্যবস্থা না করবেন সে আপনাকে যেতে দেবে না।" ঠিক তখনই খুননার একজন 
প্রতিনিধি এলো। কর্জোড় করে একটি শ্রদ্ধার সাথে চললো, "আমাকে 
আমার মালিকের পক্ষ থেকে নিষেধ দেয়া হয়েছে আমি যেন আপনার মালিকাট 
প্রেরণ করে খালির যাবার যাবতীয় ব্যবস্থা করে দেই আর একই সাথে আপনার যত 
টাকা প্রয়োজন তা যেন অত্রিম নগদ আপনার সামনে পেশ করি।" মৌলভী 
সাহেব তাকে বললেন, "আপনি আমার মালিককে ধননারাজ জানানেন এবং 
বললেন, কোষাগার এবং অন্য উৎস থেকে আমি প্রয়োজনের তুলনায় অধিক 
টাকা পেয়ে গেছি এবং আমি নিজেই আমার সমস্ত মালামাল সাথে নিয়ে যেতে 
পারবো।"

দোকানদার দাড়ালো এবং মাথা নেড়ে বললো, মনে হয় আল্লাহ 
পক্ষপাতিত্ব করে থাকেন। করেক টাকা আয়ের জন্য আমাদেরকে উদ্যোগ 
পরিশোধ করতে হয় আর এখানে খুননার নিরোধকে দেখো, যে খুন করত না 
চেয়ে আরো দেয়ার প্রস্তাব দিচ্ছে।"

মৌলভী সাহেব বললেন, "আল্লাহ তাঁর দাসের মনের অবস্থা ভাল জানেন। আমি ইনশাআল্লাহ সতর এ খুন পরিশোধ করবো। এ বিষয়গুলো আপনার 
বোধক্ষুদ্র উদ্দেশ্য।" ২০

জানু থেকে তিনি ভেরা চলে গেলেন এবং সেখানে একটি বিশাল বাড়ি 
নির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নিলেন যা যুগপূর্ব তাঁর বাসস্থান এবং কিনিয়ে কাজ 
দেবে। নির্মাণ কাজ চলাকালে কিছু নির্মাণ সম্পূর্ণ করার জন্য তাকে লাহের 
যেতে হলো। লাহের নিজ কাজ শেষে তিনি ভাবলেন, ভেরা গল্প বিবর্ধিত করে হযরত মির্যাদ সাহেবকে দেখার উদ্দেশ্যে কাদিয়ানে একটি সংক্ষিপ্ত 
সফর করা যেতে পারে। তাঁর সাথে কথা বলার সময় হযরত মির্যাদ সাহেব তাঁকে

৮২
হিজুরত

জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি এখন অবসর?" তিনি ইতিবাচক উত্তর দিলেন। তিনি ভাবলেন, আজই ফিরে যাবার অনুমতি নেয়া সম্ভবনা হবে না। এরপর তিনি ভাবলেন, তাকে ফিরে যাওয়ার প্রথম দুরন্ত সপ্তিগত রাখা উচিত। পরের দিন হযরত সাহেব বললেন, "আপনার দেখাশোনা করার জন্য মানুষ প্রত্য্যক্ষ তাই আপনি আপনার স্মৃতি নেওয়া স্থান।" তিনি তাঁর স্মৃতি লিখলেন, তিনি যেন কাদিয়ান চলে আসেন আর সাথে একথাও বললেন, তাকে হযরত কিছুদিন কাদিয়ান অবস্থান করতে হবে তাই নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে দেয়া হয়ে। তাঁর স্মৃতি কাদিয়ান আসার পর একদিন হযরত সাহেব বললেন, "মৌলিক সাহেব, আপনি এই ভালোবাসক তাই ভরা থেকে আপনার এই অনিয়ে নিতে পারেন।" তিনি সে অনুসারে ব্যবহার নিলেন। কিছুদিন পরে তাঁকে বলা হলো, ভরাকে এখন আর তাঁর ঘর ভাবা উচিত হবে না। এতে তাঁর কিছু চিন্তা হলো। তিনি হযরত পুনরায় ভরা যাবেন না কিন্তু ভরাকে নিজ ঘর মনে না করা হয়তাঁর জন্য সম্ভব হবে না। তিনি পরে প্রায় বলতেন, আল্লাহ নিজ করণায় তাঁর চিন্তা প্রবেহকে একনভাবের নিয়ন্ত্রণ করলেন যে নিজ বাড়ি হিসেবে ভরার কথা আর কখনো তাঁর মনেই পড়েনি।

তখন কাদিয়ান করেক শত লোকের বসতি পূর্ণ ছবিটি একটি উপ-শহর ছিল যা নিকটবর্তী বেল টেলেফন ও টেলিগ্রাফ অফিস থেকে ১১ মাইল দূরে অবস্থিত আর যার সাথে সংযোগ রক্ষা হতো একটি গতি বহুল বেলে পথের মাধ্যমে। বহির্বিশ্রে সাথে রোপায়েগর একমাত্র মাধ্যম ছিল একটি একক সাব পোস্ট-অফিস। শহরে সুযোগ-সুবিধার কাছ বলা ছিল না। এরপর কি পানীয় জলের সরবরাহও ছিল একাত্ত্ব ভর্তৃ দশায়। মৌলিক নুরউদ্দিনকে ইচ্ছে অর্থ সাধারণ ঘরে বসবাস আর্জে করলেন। তাঁর আমার বহুকালের লালিত স্পষ্ট বাণিজ্যের তিনি আলাদান। আধুনিক নেতা যিনি ইসলামের পুনরুজ্জীবিত করার জন্য খোদা কর্তৃক প্রেরিত হয়েছেন তাঁর সমন্বয় পরিপূর্ণ আত্মনিশ্চেষ্টনের মাধ্যমে খোদার সন্তুষ্ট অর্জন ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য।

ভরার একজন সমানিত নাগরিক তাঁকে লিখলেন, তিনি অসুস্থ আর তিনি মেহেতু তাঁদের পারিবারিক চিকিৎসক ছিলেন তাই তাঁর ইচ্ছা তিনি যেন ভরা এসে তাঁকে চিকিৎসা সংক্রান্ত দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি লিখলেন, তিনি ভরা থেকে হিজরত করে এখন স্থায়ীভাবে কাদিয়ান বসবাস করছেন। আর তাঁর নেতা হযরত মিয়া সাহেবের অনুমতি ছাড়া কাদিয়ান থেকে বাইরে যেতে পারবেন।
হযরত মৌলিক নূরউদ্দীন (রা.) - খলিফাতুল মসীহ আউয়াল

না। রোগী তখন হযরত মির্যা সাহেবকে অনুরোধ নামা লিখলেন, মৌলিক নূরউদ্দীনকে বললু তিনি যেন এসে আমাকে ব্যবস্থাপন লিখে দেন। নির্দেশ পাবার পর মৌলিক নূরউদ্দীন ভেরা গেলেন, রোগীকে শহরের এক প্রাঙ্গণে অবস্থিত তার বাসায় দেখলেন। তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে রোগীকে ব্যবস্থাপন লিখে দিলেন। আর শহরে প্রবেশ না করে বা কোন বস্তুর সাথে দেখা না করে বা পূরনো পারিবারিক কুঠি এবং অংশিক নির্মিত ঘরটির দিকে না তাকিয়ে কাদিয়ান ফিরে এলেন যেন ভেরা কখনো তার বাড়িই ছিল না।

রাওয়ালপিডির এক ধনী ব্যক্তি কাদিয়ান এলেন এবং হযরত মির্যা সাহেবকে অনুরোধ করলেন, আমার পরিবারের একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে চিকিৎসা করার জন্য মৌলিক নূরউদ্দীনকে পিছি যাবার নির্দেশ দিন। হযরত সাহেব তাকে বললেন, “আমি নিষ্ঠুর, যদি আমি মৌলিক সাহেবকে সমুদ্রে আঁপিয়ে পড়তে বলি বা আগুনে লাফ দিতে বলি তিনি দ্বিতে না করে তাই করবেন। কিন্তু আমাকে তার আরাম ও অসুখের প্রতিদিন দৃষ্টি রাখতে হবে। তার স্ত্রী অন্তঃস্বত্ব তাই আমি তাকে কাদিয়ানের বাইরে যেতে বলতে পারি না।” মৌলিক সাহেব যখন এটি শুনলেন তিনি গভীরভাবে আন্দোলিত হন আর তার নেতা তার প্রতি একটা আস্থা রাখেন দেখে তিনি আনন্দ প্রকাশের ভাষা খুজে পেলেন না।

একবার একজন প্রখ্যাত নবাব কাদিয়ানে আসেন এবং মৌলিক নূরউদ্দীনের চিকিৎসাধীন ছিলেন। একদিন তার দুজন কর্মচারী তার কাছে এসে বললেন, রাজ্যের লেফটেন্যান্ট গভর্নর প্রদেশের যে অঞ্চল নবাবের বাস সে অঞ্চল পরিদর্শনে আসছেন। তিনি চান যেন মৌলিক সাহেব তার সফর সফী হন আর সে সময় যেন তিনি উপস্থিত থাকেন। তিনি বললেন, তিনি তার আধ্যাত্মিক গুণের অনুমতি ঝাড়া কাদিয়ান থেকে বের হতে পারবেন না। তারা হযরত মির্যা সাহেবের অপেষ্ট করতে থাকলো এবং নবাবের ইচ্ছার কথা জানালো। তিনি তাদেরকে বললেন, “এখানে মৌলিক সাহেবের কার্যক্রম অনেকের জন্য দৈহিক ও আধ্যাত্মিক কল্পনার কারণ তাই আমি মনে করি না যে একটি সাধারণ বিষয়ের জন্য তা স্পষ্ট হয়ে যায়।”

বাটালার একজন হিন্দু তার অসুস্থ স্ত্রীকে পরীক্ষা করে তার কাছে পরমশ্রী দেয়ার আকুতি জানালেন। হযরত মির্যা সাহেব তাকে একজন বাটালা যাবার অনুমতি প্রদান করেন এবং তিনি সেই রাতেই ফিরে আসবেন বলে আশা বাড়ু বক্তৃতা করেন। তিনি বাটালা যান, মহিলাকে পরীক্ষা করেন এবং ব্যবস্থাপত্র প্রস্তাব

84
হিজরত
করেন। যখন তিনি ফিরে আসার মনস্ত করলেন তখন ছিল রাত। আর প্রবল বৃষ্টিও আরস্ত হয়। সবাই তাকে রাতের এই চরম ভাবাবহ সফরকে কাদিয়ানএর উদ্দেশ্যে বের হতে বারণ করে। কিন্তু তিনি নিরুৎসাহিত হবার পাত্র ছিলেন না। তার নেতার তাকে সে রাতে ফিরে আসতে বলেছেন তাই তিনি তাকে নিরাশ করলেন না। তিনি প্রবল ঝড়কে উপেক্ষা করে বীরত্বের সাথে সকল বিপদ পাড়ি দেন এবং রাতের শেষ প্রহরে কাদিয়ান পৌছেন। হযরত মির্যা সাহেব একান্ত উদ্দেশ্যের মাধ্যমে রাতে অতি বাহিত করেন আর ফজরের নামায শেষে জিজ্ঞেস করেন, মৌলভী সাহেব নিরাপদে পৌছেছেন কিনা? তিনি সামনে এগিয়ে এসে বলেন, তিনি পৌছে গেছেন।

কাদিয়ানে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করার এক বছরের মাধ্যমে এক ব্যক্তি জমি থেকে কাদিয়ান আসেন এবং মৌলভী নুরুদ্দিনকে এক লক্ষ পাঁচনকাই হাজার টাকা নগদ প্রদান করেন। ঠিক এত টাকাই তিনি পাওনাদারের কাছে ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ টাকা তাকে কেন দেয়া হলো? সে ব্যক্তি বললো, মহারাজা পুর্বের বছর রাজ্যের জন্য ঠিকা দেয়ার সময় এই শর্ত রেখেছিলেন যে ঠিকাদার তার মোট আয়ের অর্থে মৌলভী নুরুদ্দিনকে দেবে। সেই তদিনীতে চেষ্টা দেয়া হয় আর তিনি ঠিকা পেয়েছেন আর লভ্য এর অর্থে মৌলভী নুরুদ্দিনকে হস্তান্তরের জন্য এসেছেন। হযরত মৌলানা সাহেব তাকে বললেন, আপনি টাকা জমি নিয়ে যান এবং এই টাকা আমার পাওনাদারকে ফেরত দিন। পরবর্তী বছর পুনরায় ঠিকাদার লাভের অর্থে নিয়ে তার কাছে এলেন কিন্তু মৌলভী সাহেব তা গ্রহণ করেন। এক বছর পর ঠিকাদার বললেন, তার কাছে এই টাকা দিতে বাধ্য করেন এটি তার ঠিকার শর্ত। কিন্তু মৌলভী সাহেব এক পয়সাও নিবেন না বলে জানিয়ে দেন। ঠিকাদার বললেন, "আপনি গত বছর গ্রহণ করেছেন!" (তিনি বললেন) "সেটি আমাকে ঋণ মুক্ত করার জন্য আল্লাহর বিশেষ অনুরূপ ছিল। আমার এখন তেমন কোন প্রয়োজন নেই।" ২৮
আদর্শ শিষ্য

হযরত মির্জা গোলাম আহমদের (আ:) এলাহাম প্রাণ হওয়া ও ইসলামকে পুনর্জীবিত করার নিমিত্তে খোদার পক্ষ থেকে প্রত্যাদিত হবার দাবীকে সত্য মনে মৌলিক নূরউদ্দীন তার হাতে বয়স্ত করেছেন। তার ওপরে যখন তার মহীশূর মসজিদ থেকে পদ্মবাদারীর উপর জোর দেয়া হয় তখন তার বিচিত্র ধর্মীয়তায় এক ভাবায় বড় আরোপ হয়। এমন মানুষ যারা তাকে হায়ার বছরের মধ্যে ইসলামের সবচেয়ে বড় চাপিয়ে বিবেচনা করতো তারা ও তার বিচিত্র অবস্থান নেয় এবং তাকে কাফেরের হিসেবে খারিজ এবং অন্যায় নোংরা ভাষায় গল্প দিতে থাকে। মৌলিক নূরউদ্দীন তার সমর্থনে পবিত্রতার মত অন্য অবস্থান নেন এবং তার কাজে নিজেকে পুরোপুরি নিয়োজিত করেন। এ কাজকে তিনি পুরো নিষ্ঠা ও আত্মরক্ষার আবেগের সাথে সতিকর্তার অর্থে ইসলামের সেবা মনে করতেন।

আমারা এখন থেকে হযরত মির্জা গোলাম আহমদকে হযরত মসজিদ মাওদ লিখবো, তিনি নিজেও তার প্রথম শিষ্যকে পরম প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখতেন এবং তিনি অন্যান্য ভাষায় তাকে সাধবুন জানিয়েছেন।

"যখন থেকে আমি মহামহিমচিত্ত খোদার কৃত্তিকৃত প্রত্যাদিত এবং চিরহীন ও চিরহীন প্রভু কর্তৃক দানিত্রীগঞ্জ হয়েছি, আমি চরম পিপাসার বৃক্ষের চেয়ে অধিক পিপাসা নিয়ে ইসলামের সাহায্যকারীদের সঙ্গানে ছিলাম। আমি দিবারাত দোয়া করতে থাকি, 'হে প্রভু! আমি একা এবং অসহায়। কে আমার সাহায্যকারী এবং সহকারী হবে? যখন আমার হাত বারবার দোয়ার জন্য উঠলো আর আমার দোয়ার আকাশ ভারী হয়ে গেল, মহামহিম খোদার অঙ্গে শুলন, বিশ্বজগতের প্রকৃত দয়া আমার দোয়ার অনুকূলে একাক্ত জেরে বলতে কাজ করল এবং তিনি আমাকে ধর্মের খাতিতে একাক্ত নিহিত এবং বিশ্বাস একজন অন্ত্ব দান করলেন, যার মাধ্যমে আমার সাহায্যকারীদের চেনা যায় আর ধর্মের পথে যারা আমার সাহায্যকারী তিনি তাদের নির্ভর। তার দৃষ্টিসম্বন্ধে নামে তাঁর নাম হলো নূরউদ্দীন। ধর্মের জ্যৌতি। তার জন্মস্থল ভোরা, তিনি কেরানিদের হাশিমের বংশ আর সেই সময়ে তিনি ইসলামের একজন নেতা। সর্বভার পিতা-মা তার জন্য। তার সাথে সাক্ষাতের সময় আমি এমন অনন্য পাই যেন আমার এক কর্তিত অস পুনর্ব্যাপ্ত হয়েছে। হযরত উমর (র) এর সাথে সাক্ষাতে মহানবী (সা) এর যেমন অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমার মনে শরনের আনন্দের ভর যায়। তিনি যখন আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য এলেন।

৮৬
তখন তার দিকে তারিয়ে বুঝলাম, তিনি আমার প্রভু একটি নিদর্শন, আমার অব্যাহত দোয়ার ফলশিক্ষা আমার অনুরূপ আমাকে বলেন, তিনি খোদার একজন মনোনীত ব্যক্তি। আমি দেখলাম যে তার মুখ থেকে প্রজ্ঞা নিঃসৃত হয় আর তার উপর স্বর্গীয় জ্যোতি নায়েল হয়। তিনি আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যা করার সময় রহস্যময় প্রস্তুতি উদ্বোধন করেন, অধ্যাত্মিক সৃষ্টিতার ধর্ম প্রবল বেগে প্রবাহিত করেন আর প্রজ্ঞার আচরন ভাবার উদ্দেশ্য করেন যা ইতিপূর্বে অজানা ছিল। কুরআনের সূচনাতৃত্ব বিষয়াদি নিয়ে তিনি গবেষণা করেন আর তত্ত্বাতঃনের গভীরে অগ্রগণ্য করে তা থেকে সুমজ্জুল আলো বের করে আনন। তার বুদ্ধিমান সময় বুদ্ধিমান ব্যক্তির তার কথার নিদর্শনমূলক প্রভাব দেখে গভীর আল্লাহর সাথে তার প্রতি সমর্থনে জানায়। তিনি স্বয়ং থাকে স্বর্গের ন্যায় তুলে ধরেন আর বিদ্঵েষদায়িদের আপত্তিকে সমূলে উৎপাত করেন।

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর যিনি আমাকে এ বদ্ধ এমন সময়ে দান করেছেন যখন তার একাশ প্রয়োজন ছিল। আমি দেয়া করি আল্লাহ তার বর্ষ, শাপ্র এবং সমানকে বৃদ্ধি করে আল্লাহ আমার কথার সাফী, আমি তার কথায় একটি অসাধারণ মহিমা দেখি। আর কুরআনের রহস্যময় উদ্বোধন এবং এর অর্থ ও ভাবের গভীরে অগ্রগণ্যের ক্ষেত্রে তাকে সবচেয়ে অগ্রগণ্য মানুষ হিসেবে সম্মান করি। আমি তাকে মুখার্দ্ধী দুঃখায়মান দুঃখ বাহুর স্থান মনে করি, এর একটি পাতালীর অপরকে প্রজ্ঞা। আমি জানিন এ দুয়ের কোনোটি বেশি দীর্ঘ। তিনি সমুদ্র ইসলামের একটি বাগান। হে আমার প্রভু! তুমি আকাশ থেকে তার উপর রহমত নাযেল কর এবং শক্তি দুজন্ত থেকে তাকে রঞ্জ কর। তিনি যেখানেই থাকুন না কেন তার স্বাভাবিক থেকে। তার উপর ইহু ও পরকালে রহম করো। হে পরম দয়ালু খোদা, আমান।

আমি আমার প্রভুর প্রতি বিনয়াবনন্ত কৃতজ্ঞতা জানাই, যিনি আমাকে এমন একজন সৃষ্টির বিশ্বাস বদ্ধ দান করেছেন, যিনি খোদার এবং সবচেয়ে পর্যায়ের পাতালীর অধিকারী। তিনি দুর্দংশন সম্পন্ন এবং তীক্ষ বৃদ্ধির অধিকারী। তিনি খোদার পথে সংগ্রাম করেন এবং খোদার নালিসায় সমসাময়িক লোকদের মাঝে অগ্রগণ্য। যেভাবে নির্দোষ-প্রাপ্তদের সাথে সাম্প্রদয়নের মিল থাকে সুভাবে তিনি আমার সভায় একাকিয় হয়ে আছেন।”

একেবার হযরত মৌলিকী আবদুল করিম এবং হযরত মৌলিকী নুরুদ্দীন এর শ্রীর মধ্যে এ বিষয় আরম্ভ হয় যে তাদের প্রত্যেকের যামী হযরত মসীহ মাওদুদ (আঃ)-এর দৃষ্টিতে বেশি প্রিয়। তারা তার শ্রী হযরত উম্মুল মু'মেনীনকে উন্নত বিষয়ে মতামত ।

৮৭
হয়রত মৌলিকী নুরউদ্দিন (রা.) - খলীফাতুল্ল মসীহ আওয়াল

বাং করার আমাত্ম আমাত্মান। তিনি বলেন, এর মীমাংসা করা তেমন কঠিন কিছু নয়, এক মিনিট প্রথম সমাধান হয়ে যাবে। তিনি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর কাছে আসেন এবং বলেন, "আপনার সবচেয়ে প্রিয় সাহাবী টি..." হযরত মসীহ মাওউদ আঃ কথা থামিয়ে একাধিক উদ্দেশ্যের সাথে তাকে জিজ্ঞেস করেন, "মৌলিকী নুরউদ্দিনের কি হয়েছে?

হযরত মৌলিকী আবদুল করীমের ইচ্ছাকালের কিছু কাল পর একদিন মৌলিকী নুরউদ্দিন অস্বুচ হয়ে পড়েন। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) প্রত্যেক দিন তাকে দেখতে যেতেন। একদিন তিনি তার জন্য উষ্ণ প্রস্তুত করেছিলেন, হযরত উমাল মুমেনন তাঁর উদ্দেশ্যের কথা অনুমান করে সাতনা দেয়ার লক্ষ্যে বললেন, মৌলিকী বুরহান উদ্দিন সাহেবের মায়া গেছেন, মৌলিকী আবদুল করীম ইচ্ছাকাল করেছেন, আল্লাহ তাআলা করুণাবশত মৌলিকী সাহেবকে আও আরোগ্য দান করুন। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বললেন, "ইনি সহসা আবদুল করীমের সমান পদমায়াদা রাখেন।"

একটি ঘটনা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর অস্থিরতা কারণ হলে তিনি নিজ সাহাবীদেরকে এভাবে নিশ্চিত করেন, "আপনাদের অনেকগুলি অলঙ্কার নিদর্শন দেখেছেন তবুও আপনাদের ঈমান পুরো দুর্বল দেখা যায় না। কিন্তু অনেকগুলি এমন আছে যারা কোন নিদর্শন দেখার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন না। মৌলিকী নুরউদ্দিন ওখানে আছেন যিনি তাত্ত্বিকভাবে ঈমান এনেছেন, হযরত উমরের অধ্যাত্ম পূর্বক তাঁকে হযরত আবু বকরের আদর্শ অনুকরণ করেছেন।" একথা টেনে হযরত মৌলিকী নুরউদ্দিন দাড়ালেন এবং নিবেদন করলেন, "হযরত উমর নিম্নোক্ত ভাবায় নিজের ঈমানের পক্ষে সুনিবিষ্ট সংশোধন দেন: 'আমরা প্রভু হিসেবে আমাদের আল্লাহকে এবং নবী হিসেবে মুহাম্মদ (সাঃ)-কে মেনে সম্পূর্ণ। আপনার দাত্ত সম্পর্কে আমি কখনো সদেহ সংশোধন করিনি। আমি একথানাকে সুনিবিষ্ট সংশোধন করছি, 'আমি প্রভু হিসেবে আমার আল্লাহকে এবং মাহুদি ও মসীহ হিসেবে আপনাকে মেনে সম্পূর্ণ।' হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর আস্তিত্ব হয়ে তাই চেহারার উল্লেখ এবং তিনি তার সাহাবীদেকে আরও কিছু নিশ্চিত

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর একজন বিশেষ লিখে, কয়েকজন মুসলমানকে প্রতিস্থাপন করে মীরা সাহেব একটি জামাত গড়ে তুলেন। যদি তিনি কিছু অমুসলিমকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে পারতেন তাহলে তাঁর দায়ী সম্পর্কে কিছুটা ভাবা যেতো। একথা যখন হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর দৃষ্টিগোচর করা

৮৮
হলো তখন হযরত মসীহু মাওউদ (আঃ) তাঁর হাতে যেসব আ-মুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাদের একটি তালিকা প্রদত্তের জন্য হযরত মৌলভী নুরুউদ্দিন (রাঃ)-কে নির্দেশ দেন। এ নির্দেশ পালন করতে গিয়ে হযরত মৌলভী নুরুউদ্দিন তালিকার শীর্ষে নিজের নাম এবং ঠিকানা লিখেন। এক বছর এটি দেখে বিস্ময় প্রকাশ করলে তিনি বলেন, “সাধক ইসলাম আমি হযরত মিয়া সাহেবের কাছে পিছেছি।”

জামাতের এক ব্যক্তি হযরত মিয়া সাহেবকে তার মেয়ের জন্য একটি সুনোগা পাদ্রের নাম প্রস্তাব জানালেন। হযরত মসীহু মাওউদ (আঃ) যখন প্রস্তাব রাখলেন, মেয়ের নিজের সেখানে মেয়ে বিয়ে দেয়ার ব্যাপারে ধিক করলেন। এটি শুনে হযরত মৌলভী নুরুউদ্দিন অনিহস্ত হয়ে বলেন, “মিয়া সাহেব আমাতুল হাইকে (তাঁর মেয়ে) নিহস্তের (একজন মেধার্নী) ছেলের হাতে তুলে দিতে বললেও তাঁর নির্দেশ পালন আমি কোন ধিক করবার না।”

তার নিলাপূর্ণ উদ্দিকের প্রমাণ না করে হযরত একজন বস্ত্রধারী মানুষ এত গোপীতুর অনুরাগকে অন্য বিখ্যাতের মুখতা ভাবতে পারে। কিন্তু মৌলভী নুরুউদ্দিনের বিখ্যাতের ভিত্তিতে ছিল মুঘল পুরুষ বিখ্যাতের উপর (১২৪১০৯)। আর এ কারণে তিনি ছিলেন একজন দীর্ঘকাল। এমন বিখ্যাতের একটি বিশেষ হলো, যেদিন তার পাদ্রের ইংরেজ খুশি প্রকর হয়ে থাকে যা তাদেরকে প্রতিটি ক্ষেত্রে ভাল ও মনের পার্থক্য করা বা কি উপকারী আর কি অপকারী তা বুঝতে সাহায্য করে। সে কারণে একটি একটি ভাগ সত্য, যদি হযরত মসীহু মাওউদ (আঃ) তাঁর কাছে সমুদ্র বালে দেয়া বা আমার নাফ দেয়ার মত কোন কিছু দাতী করতেন তাহলে তিনি নির্দিষ্ট এ টুকো বিখ্যাতের ভিত্তিতে তার পালন করতেন যে তাঁকে যা করতে বলা হচ্ছে তা সম্পূর্ণভাবে কল্যাণকর। আর এমন বিখ্যাত সুরুকানামসত্য থাকে এটা খুব সত্য যে তোমারা কোন বস্ত্রকে ঘুষা কর অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর এই সত্য যে তোমারা কোন জিনিসকে ভালবাস অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ জানেন এবং তোমারা জান না” (২৪:২১৭)।

“কিন্তু এটা খুব সত্য যে তোমরা কোন বস্ত্রকে ঘুরা ফের অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর এটা সত্য যে তোমরা কোন জিনিসকে ভালবাস অর্থাৎ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না” (২৪:২১৭)।

“এমনও হতে পারে, যে বস্ত্রকে অপরিচ্ছন্ন কর আল্লাহ এর সাথে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন” (সূরা নেসা ৪:২০)।

এখানে এটি উল্লেখযোগ্য, হযরত মৌলভী নুরুউদ্দিনের কন্যা আমাতুল হাই এর বিয়ে হযরত মসীহু মাওউদ (আঃ) এর পুত্র ও দীর্ঘকাল খুশীকর হযরত সাহেবদাদা মিয়া বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ সাহেবের সাথে হয়েছে।”

একবার হযরত মৌলভী নুরুউদ্দিন নামায পড়েছিলেন। তিনি সন্নামে যে হযরত মসীহু মাওউদ (আঃ) তাকে ডাকছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ নামায ছেড়ে দিয়ে হযরত

৮৯
হয়রত মৌলিকী নূরউদ্দিন (রা.) - খলিফাহুদ মসীহ আউয়াল

মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর ডাকে সাড়া দেন। নির্ধারিত নিয়ম মাফিক নামায পড়া সম্পর্কে যারা কঠোর দৃঢ়তার্থী ধারে তারা হযরত তাঁর কাজের যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন উঠাবে, কিন্তু অন্য একজন সাহাবীর অনুরূপ কর্মপ্রদায়ের অপর এক সময়ে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) দেখেছেন এবং সমর্থন করেছেন। একবার আর একজন প্রসিদ্ধ আলেম মৌলিকী সরওয়ার শাহ সাহেব নামাযে কিছুটা বিলম্ব আসেন আর নামায চলাকালে মসজিদে প্রবেশ করে তিনি শেষ সারিবার নামায়ীদের সর্বভারে দাড়ালেন। নামায শেষে তিনি তাঁর অবশিষ্ট নামায শেষ করার উদ্দেশ্যে দীর্ঘদিন মাদ্রাসা হলেন। বাকি নামায়ীরা মসজিদ থেকে তাঁর হৃদয় পূর্বে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর যাবার অপেক্ষা করেছিলেন। হযরত সরওয়ার শাহ সাহেব যে স্থানে দাড়িয়ে নামায পড়ছিলেন সেটি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর যে যাবার পথ ছিল। তিনি সাথে সাথে নামায ছেড়ে দিলেন তাঁর পাক্ষিক ভাষা আপনি কেননা কেন নামায ছেড়ে দিলেন?" হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) হলেন, "মৌলিকী সাহেব সার্থক কাজ করেছেন। তাঁর কাজ মন্দ কাজকে মুছে ফেলে (১১৪১১৫)।"

মৌলিকী নূরউদ্দিন সাহেবের রুটিন ছিল, তিনি যে কাজেই যাত্রা থাকতেন না কেন যদি ঘটতেন যে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) আসেন তিনি তাঁর চলাকাল কথা অসমাপ্ত রেখে দাড়িয়ে থেনেন, জুটা পরে পরে তাঁর পাগলী বাঁধতে বাঁধতে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর আগমনের অপেক্ষা করতেন।

একদা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর দিনের এক সফরকালে তাঁর শুরু হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) আসেন তিনি তাঁর চলাকাল কথা অসমাপ্ত রেখে দাড়িয়ে থেনেন, জুটা পরে পরে তাঁর পাগলী বাঁধতে বাঁধতে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর আগমনের অপেক্ষা করতেন।

তিনি কাদিরিয়া থেকে মৌলিকী নূরউদ্দিনকে ডাকের সিদ্ধান্ত নিলেন এবং তাঁকে দিল্লী আসার জন্য টেলিগ্রাম করতে বলেন। টেলিগ্রাম যখন ডাকের কর্তৃক তিনি পুরুষ লিখেছিলেন, 'এখনই আসেন।'

মৌলিকী সাহেবের যখন এ টেলিগ্রাম পেলেন তখন তিনি তাঁর কিনিকে ছিলেন। তিনি সাথে সাথে দাড়িয়ে গেলেন, কীর কাছে দ্রুত সরবার পাঠালেন যে হযরত সাহেব তাঁকে দিল্লী আসতেন। তিনি বাতালার উদয়েশ্যে এমন অবস্থায় রাখেন হযরত যখন তাঁর হাতে কোন প্রয়াস ছিল না। বাতালা স্টেশনে একজন ধনবাদ ছিদ্র তাঁকে তাঁর বাহিতে গিয়ে অস্তক্রি কীরের রোগ নির্ম্মাণ অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, তাঁকে অনুতরসের ট্রেন ধরতে হবে। তিনি দিল্লী যাচ্ছেন তাই তাঁর শহরে যাবার সময় নেই।

উদ্দিন কীর তাঁকে স্টেশনে নিয়ে আসার প্রস্তাব দিলেন এবং তাঁকে করলেন। মৌলিকী সাহেব প্রতিফল-নিরীক্ষা করে ব্যবস্থাপনা লিখে দিলেন। যেতে মহিলার কীর এই আনন্দিত হলেন যে তিনি চুপে নিয়ে তাঁর দিল্লী যাবার জন্য একটি টিকেট কিনে আনেন আর ফিস বাবদ তাঁকে বেশ কিছু টাকা দিলেন। এতে পরবর্তী সকালে তিনি দিল্লীতে তাঁর আধ্যাত্মিক শুরুর সামনে উপস্থিত হলেন।
হযরত ঈসা (আঃ)-এর বিনা পিতায় জন্মগ্রহণ একটি বিতর্কিত বিষয়। মৌলিক নূরউদ্দিন মনে করতেন যে তাঁর পিতা ছিল। মওয়াহেবুর রহমান পুত্রকে হযরত মসীহু মাওুদ (আঃ) লিখেছেন, তাঁর মতামত হলো হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্য পিতৃবিনীহ ছিল। এটি পাদাত্ত হযরত মৌলিক নূরউদ্দিন তাঁর মতামত পরিবর্তন করে হযরত মসীহু মাওুদ (আঃ)-এর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করলেন। তিনি তাঁর পুত্রকে 'নূরউদ্দিন'এ তাঁর মতামত পরিবর্তনের কথা প্রকাশে স্বীকার করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, ২১:৭০ আয়াতে যে আওমনের কথা উল্লেখ আছে তা সত্যিকার অর্থে বিশ্বাসিত আওমন। কিন্তু হযরত মসীহু মাওুদ (আঃ) বলেন, “এমন অর্থ করার প্রয়োজন কি? আমার হযরত মসীহু মাওুদ (আঃ) বলেন, “এমন অর্থ করার প্রয়োজন কি? আমাকেও আল্লাহ তাআলা ইব্রাহীম নামে সমর্পণ করেছেন। ইব্রাহীমের জন্য আওমন কিনাকে শীতল হয়েছিল তা যদি কেউ বুঝতে না পারে তাঁরা আমার আওমনে নিক্ষেপ করে আমি নির্দম্পে বেরিরান আমি কিনাকে পরিক্রমা করতে পারে।” মৌলিক সাহেব ধরম পালনের আগন্ত উত্তরে 'নূরউদ্দিনএ লিখেছেন, “তুমি আমাদের সেরা আওমনে নিক্ষেপ করে দেখতে পার। তুমি দেখবে, মহিমাগুর খোদা নিজ প্রতিভাতি অনুসারে তাঁকে আওমন থেকে সেভাবে নিরাপদ রাখবেন যেভাবে তিনি ইব্রাহীমকে রক্ষা করেছেন।”

হযরত মসীহু মাওুদ (আঃ) যখন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নতুন মাওকে কল্যাণে তাঁর ছয়া বা উম্মতী নবী হবার দাবী করলেন, তখন কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, “মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পর নবী আসতে পারে কি?” তাঁর উত্তর ছিল, “না”।

“তাহলে সে ব্যক্তির ব্যাপারে আমি কি বলবেন যিনি নবী হবার দাবী করেছেন?”

“আমি দেখবে তিনি সত্যবাদী আর মুসলমান কিনা। যদি তিনি সত্যবাদী হন তাহলে আমি তাঁর দাবীকে পুণ্য বা মোগাতার মাপকাঠিতে যাচাই করবাও।”

এমন ছিলেন নূরউদ্দিন। সে কারণেই হযরত মসীহু মাওুদ (আঃ) তাঁর এক ফারসী পরিক্রমা তাঁকে দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

তিনি (আঃ) লিখেন, “কত সুদর হতো যদি উম্মতের প্রতিটি ব্যক্তি নূরউদ্দিন হয়ে যেতো।

এমনটি সত্যহ হতো, যদি উম্মতের প্রতিটি ব্যক্তির হৃদয় নিশ্চিত ইমামের জ্যোতিতে ভরে যেতো।”

৯১
প্রখ্যাত ধর্মবেতা

মৌলভী নূরউদ্দীন সমসাময়িক যুগের একজন অসাধারণ চিকিৎসক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। রোগ নির্গর্ভের ক্ষেত্রে তার কোন জুড়ি ছিল না। তার আচরণজনক ছোটনী চিত্তাধারা সর্দা সঠিক প্রমাণিত হতো। তিনি তার রোগীদের মধ্যে কোন পার্থক্য করতেন না। ধনী-দরিদ্র সকলের তার সর্বোত্তম চিকিৎসা পেতো আর এর সাথে তার আত্মবিশ্বাস দোয়াও অত্যুভুত থাকতো। এক রাতে তার কাছে এক ব্যক্তি আসেন যিনি স্ত্রীর স্বস্ত রেখেছিলেন তার জিজ্ঞাসার কারণে চরম উদ্দেশ্যে তিনি তার মজা করেছেন এবং তাকে বললেন, তাকে যেন রোগীর অবস্থা সম্পর্কে অবহিত রাখা যায়। রাতে সে মহিলা সম্পর্কে তাকে আর কিছু জানানো হয় নি। পরের দিন প্রত্যেক যে তিনি সে মহিলার খবর-খবর নেয়ার জন্য লোক পাঠালে মহিলায় সামী হাস্যাত্যক চেহারায় তাঁর কাছে এসে বলে, তার ঘরে বাড়ির এক ঘরে পর তার স্ত্রী নিরাপদে এক সময় প্রস্তাব করে এবং নিষ্পত্তি রাখতে যান করে। হজরত মৌলাসা সাহেব বললেন, "আমাকে জানানলেন কেন?"

সে বলল, "মহাদয়, যেহেতু চিত্তার আর কোন কারণ ছিলনা তাই আমি রাতে আর আপনাকে বিস্তার করা সমীচীন মনে করিন।"

"কষ্টের কথা বলছেন। আপনি কি জানেন, যখন আপনারা সবাই রাতের বাকী অংশ সূক্ষ্মিত্যায় অতিবাহিত করেছিলেন সেখানে নূরউদ্দীন একটি বারও চোখ বন্ধ না করে সময়টি বেদনাময় দেয়ায় অতিবাহিত করেছিলো।"

একবার লাহের অস্থির কালে তাকে এক সমস্ত পরিবারের একজন হিন্দু মহিলার চিকিৎসার জন্য ডাকা হয়। তিনি এক আত্মীয়ের ইতেমকালে অপর কয়েকজন মহিলার সাথে শোক প্রকাশ করেছিলেন। দুঃখের অতিশয়ে সে মহিলা বারংবার মাথার উপরে হাত উঠাছিলেন। মহিলা একবার এত ঘন-ঘন হাত উঠান যে তার হাত উপরেই শান্ত হয়ে যায় আর নিচে নামানো সত্য হয়নি। চিকিৎসক কিছুই বুঝতে পারি ছিলনা। এমন কোন উপায় তারা খুঁজে পাচ্ছিলেন না যার মাধ্যমে বাহুর স্ত্রীর কোমলতা বহাল হতে পারে। যখন তাকে সে মহিলার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা হয় তিনি তাকে দেখেছিলেন না আর যে রূহ কর্মে অন্ড মহিলা নিশ্চিত হাতটি দাঁড়িয়ে ছিলেন সে কক্ষেও গেলেন না। তিনি মহিলার সেবচেয়ে সুদর্শন যুবককে ডেকে আনার

৯২
পরামর্শ দিলেন। সে আসার পর তিনি তাকে কক্ষে প্রবেশ করে পরিকল্পিতভাবে অন্ধ মহিলার কাছে গিয়ে সাধিকার অর্থে তাঁর কাপড় খোলার চেষ্টা করতে বললেন। সে নির্দেশ পালন করল। অসুস্থ মহিলা তাঁর উদ্দেশ্য আচ করে ব্যাকুল হয়ে উচ্চভাবে চিত্কার করে উঠলে আর তাঁর হাত নিচে নেমে এল। সেই মুহূর্তের ধাক্কা তাঁর মুখুয়াতের স্বাভাবিক অবস্থা পুনর্বাহী করে।

গুহু দৈহিক বা মানসিক চিকিৎসাই তাঁর একমাত্র বিশেষতা ছিল না বরং আধ্যাত্মিক চিকিৎসা ছিল তাঁর আহ্বানের কেন্দ্র বিন্দু। তিনি আত্মার সংশোধন ও আরোগ্যের জন্য নির্দেশিত ছিলেন। এ উদ্দেশ্যে তাঁর মেটেরিয়া মেডিকা, তাঁর ফার্মোকোপিয়া, এবং চিন্দাটির গাছ ছিল পরিদৃষ্ট কুরআন। তিনি এটি মুখ্য করেছেন। আর এ গ্রহণের উপর তাঁর পারিত্যাগ ছিল অগাধ ও অসাধারণ। এ কুরআনে প্রজ্ঞা যে অস্তমান ভাসার রয়েছে তা পৃথিবীর সামনে তুলে ধরার কোন সুযোগ তিনি নিতে করেন নি। যতক্ষণ নিজের চিন্তা-চেতনার উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ ছিল তিনি কুরআন শিখানো অব্যাহত রেখেছেন। তিনি বলেন, "কুরআন আমার রিয়্যক এবং আমার আত্মার সত্ত্বাত্মতার উৎস। দিনে আমি বেশ কয়েকবার এটি পড়ি কিন্তু আমার আত্মার চাহিদা কখনও মিটে না। এটি নিরাময়, এটি রহমত, এটি আলো, এটি হেদায়াত।" কুরআন কিভাবে পড়া উচিত, এ প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন,

"পৃথিবীতে পড়ার যোগ্য সাক্ষরতা সহজ গ্রাস্ত হলে কুরআন। এটিকে যদি পড়তে হয় তাহলে সর্বচ্ছে গৌরবের গৌরবশীল্প শর্ত হলো সাধারণত। আল্লাহ যদি এতি প্রতিষ্ঠিত দিয়েছেন, তিনি মুহূর্তকে (সুধারতির) কুরআন শিখানেন। কুরআন পাঠের জন্য ছাত্রের সময় বের করা এবং জীবিকার চিন্তা থেকে মুক্ত থাকা দরকার। যদি সে তাকাওয়ান পথ অনুসরণ করে আল্লাহ তাকে এমন স্থান থেকে রিয়্যক দেন যা সে ভাবতেও পারে না এবং তিনি তাঁর অভিভাবক হয়ে যান।

কুরআন পাঠের দ্বিতীয় শর্ত হলো, সাহান্দ প্রতি পূর্বো আত্মনিবেদনের প্রশ্ন নিয়ে যথাযথভাবে চেষ্টা করা, তাহলে আল্লাহ সকল জানিষ্ঠতা দূরীভূত করার প্রতিষ্ঠিত দেন।

কুরআন পাঠের নিয়ম হলো, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কুরআন এমনভাবে পাঠ করা যেন কুরআন তাঁর উপর নাথেল হচ্ছে আর প্রতোক আয়াত তাঁর জন্য নাথেল হয়েছে। দৃষ্টিহীন স্বরূপ, যেখানে আদম এবং ইবলিসের কথা বলা হয়েছে সেখানে তাঁর আপন অবস্থা বিশেষণ করা উচিত আর নিজেকে প্রশ্ন করা উচিত যে সে কি আদম না ইবলিস? আর একই রীতি পূর্বে কুরআনে অনুসরণ করা উচিত। কোন হানে সে জানিষ্ঠতার সমুথীন হলে তাকে তা চিহ্নিত করা উচিত। দ্বিতীয়বার

৯৩
হয়রত মৌলভী নুরউদ্দিন (রা.) - খলিফাতুল মসীহ আউয়াল

পড়ার সময় গী-বার্তাদেরও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। সে দেখতে যে তার প্রথমবারের বেশিরভাগ জাটলার সমাধান হয়ে গেছে। তৃতীয়বার পড়ার সময় তার বন্ধুদের শামিল করা উচিত তার চতুর্থবারে ব্যাপক গতিকে কুরআন পাঠে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। কুরআনের রহস্য উদেশ্যের জন্য তার অব্যাহততার নেমে যাওয়া উচিত।

কুরআনের তফসীরের জন্য ছিল তার অসাধারণ। ১৮৯৩ সালে লাহোরে আনুমানে হেমায়েতে ইসলামের বার্তিক সমাধান তাকে বৃদ্ধি প্রদানের জন্য আত্মরক্ষণ জানানো হলে তিনি তার বিশ্বব্যাপী হিসেবে যে বেছে নেন তাহলে 'আল্লাহ আকাশসমুহ ও পৃথিবীর জ্যোতি'

"আল্লাহ আকাশসমূহ ও পৃথিবীর নুর তার নুরের উপর হল। একটি তার সদৃশ যার মধ্যে একটি একটি প্রদীপ আছে, সেই প্রদীপটি একটি গোলাকার কাঁচের চিমনির মধ্যে আছে এই কাঁচের চিমনিটি এমনই দীর্ঘমান, যেন এটি একটি উজুল তারকা। এটি (প্রদীপটি) এক এমন বর্ণপূর্ণ যাতে আল্লাহ তারকা (বৈজ্ঞানিক) দ্বারা প্রজ্জলিত হয়, যার পুরুষরূপ নয় পশ্চিমরূপ নয় (বরং এটি সারা বিশ্বের জন্য), এর তৈরী এমন যেন একই স্থানে এটি (স্বাভাবিক জ্বল) উঠবে যদি অগ্নি তাকে স্পষ্ট না করে। নুরের উপর নুর! আল্লাহ যাকে সাদা নিজের নুরের দিকে পরিচালিত করেন। এবং আল্লাহ মানব-মন্ত্রীর জন্য উপমাসমূহ বর্ণনা করেন। বস্তুত আল্লাহ সর্বমিত্র সর্বজ্ঞানী।" (২৪:৩৬)

তিনি এভাবে বক্তব্য আরম্ভ করেন। কতক শ্রোতা প্রাচীর ঐতিহ্য ও ভাবাবায় উদ্বুদ্ধ আর যুগক শ্রীর পশ্চির কৃষি ও সভ্যতার প্রশংসায় পশ্চাদ অর্থ যাচাই তেলে অথবা কুরআনের আলোকে তা প্রাচীরের নয় আর পাপাতাতুররও নয়। কুরআন কর্ম পৃথিবীর সমগ্র মানব-মন্ত্রীর মঙ্গলের বিধান করে। এরপর তিনি যে আয়াত তেলাওয়াত করেছেন এর আলোকেই বৃদ্ধি অব্যাহত রাখেন আর শ্রোতারা পুরো বৃদ্ধি মণ্ডলের ন্যায় শ্রেষ্ঠ করতে থাকেন।

সে অনুঠিন শ্রোতাদের মাঝে বিহারের ভাঙ্গাপুরের সুপ্রসিদ্ধ মুসলিম মুর্শিদ, মৌলভী হাসান আলি সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। বৃদ্ধি সম্পর্কে তিনি তাঁর অনুমোদন করার জন্য প্রকাশ করেন। "১৮৯৩ সালে আনুমানে হেমায়েতে ইসলামের বার্তিক সম্মেলন আমার যোগ দেয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল, যেখানে ধর্মতাত্ত্বিক মুহাম্মদের কুরআন মৌলভী হাসান নুরউদ্দিন এর সাথে সাক্ষাৎ হয়, যার সমকক্ষ আলেম ও ভারতের নব বর্ণ দুর্দশাতে কোনোদের নেই। ১৮৮৭ সালে পাপাতাতু যুদ্ধ আর তাঁর অনেক প্রশংসা ঘনিষ্ঠ। কিন্তু এবার তিনি কুরআনের কিছু আয়াত তেলাওয়াত করে এর এমন ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন,
প্রখ্যাত ধর্মবেদ্য
তাঁর আলোচনায় আমি কত গতিরভাবে প্রভাবিত হয়েছি তা ভাবায় প্রকাশ করতে পারবো না । তাঁর বঞ্চিত শেষ হবার পর আমি দালুলাম এবং বললাম, 'আজ আমি গর্বিত, আমার দু নয়ন এতবড় একজন আলাম ও মুম্বাছেরকে দেখেছি এবং মুসলমানদেরও গর্বিত হওয়া উচিত কেননা, তাদের মাঝে এতবড় একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি রয়েছেন'।

মৌলিক হাকিম নূরউদীনের সাথে আমার সাক্ষাতের গতির আগ্রহ ছিল কিন্তু তিনি আমাকে সমান দিয়েছেন এবং স্বয়ং কাছে এসে আমার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন । আমাদের কথাপোকখন কালে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি হযরত মির্যা সাহেবের হাতে বয়স্তা করেছেন, আমাকে বললেন কি এতে আপনার কি লাভ হয়েছে?' উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি একটি পাপ থেকে নির্মৃতি পাবার বহু চেষ্টা করেছি কিন্তু সফল হইনি। হযরত মির্যা সাহেবের হাতে বয়স্তাতের পর আমি ওখু সে পাপ থেকে মুক্তি হইনি বরং আমার হাতে এর প্রতি ধৃঃতা সৃষ্টি হয়েছে।'

"যদি তিনি আমাকে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের কিছু নিদর্শন বা ভবিষ্যদ্বাণী করতেন তাহলে আমি হযরত খুব একটি গুরুত্ব দিতাম না কিন্তু তিনি যা বললেন তা আমাকে গতিরভাবে প্রভাবিত করেছে।"

পরবর্তীতে মরহুম মৌলিক হাসান আলী কাদিয়ান এসেছিলেন, মসজিদ মাওদ-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে এবং তাঁর সাহচর্যে কিছু সময় অতিবাহিত করে তাঁর হাতে বয়স্তাতেও করেছেন। তিনি নিজেকে আহমদীয়া জামাতের একজন নিঠাবান ও নিবেদিত প্রাণ সংস্য প্রমাণ করেছেন। তাঁর তবলিগে অনেক মানুষ আহমদীয়া জামাতে অত্যন্ত হয়েছেন।

১৯০১ সালে কুর্সিয়ারি মসজিদে একবার যখন মৌলিক নূরউদীন লাহোর হয়ে যাচ্ছিলেন তখন একটি বড় সমারেশে তাকে বক্তৃতা প্রদানে উদ্বুদ্ধ করা হয়। তিনি কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন প্রমাণাদির আলোকে আল্লাহ তালালর অনুসরণ সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। জামাতের এক সদস্য বক্তৃতা দৃশ্যার জন্য সাথে জালাল উদ্দিন নামে রেলওয়ের এক করানীকে নিয়ে যায় যে গৌড়া নাটিক্ষ ছিল। বক্তৃতা দুপুর ১.৩০ মিনিটে শেষ হয় এবং প্রোড্যাকশন চলে যায়। পরের দিন কাজ থেকে ফিরে আসার সময় জালাল উদ্দিন তার বক্তৃতা কাছে দীক্ষাকরণ করলে, মৌলিক নূরউদীনের বক্তৃতা দৃশ্যার পর সে তাঁর পূরবের অবিশ্বাসের জন্য অনুভূত আর এখন সে আত্মরিকভাবে আল্লাহর পরিশ সত্যায় বিশ্বাসী। এ ব্যক্তি নিশ্চিত ছিল যে কেউ তাঁর মৃদূর খণ্ড করতে পারবে না।

৯৫
১৯০২ সনের জুন মাসে এক হিন্দু যুবক কাদিয়ান এর ইসলাম গ্রহণ করে। যদি মসীহ মাওদুন (আঃ) মৌলভী নুরউদ্দিনকে বলেন, তাকে ইসলামী বীরতি-নীতি সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি তাকে যা বললে ছিলেন তা হলো:

“ইসলাম বললে তিনটি বিষয়ে বুদ্ধিয়। প্রথমত এ বিশ্বাস করা, সব নিয়ন্ত্রা দৃষ্টি ধর্ম একসব। এমন দৃষ্টি তিনি ছাড়া অন্য কেউ নেই যার সামনে কোন ব্যক্তি নত হতে পারে বা যার তাঁহার রোগার রাখায় যেতে পারে বা যার জন্য কোন প্রাণী জীব করা যেতে পারে (কেননা তিনিই সমস্ত জীব জগতের প্রতি)। আর এমন কেউ নেই যার খাতিরে তওয়াক করা যেতে পারে। সকল আশা-োথাঙ্গর কেদুঘাঁল তিনিই হওয়া উচিত। এটিই হলো ‘লা ইলাহা ইলাহাহু’র অর্থ। সকল সুখ ও দুঃখের বিধান করা এবং সকল চাহিদা পূরণ করা তাঁর নিয়ন্ত্রণ। সকল আকুতি-মিতির তাঁর কাছেই উপলব্ধি হওয়া উচিত। এসব কিছুতে আত্মরক্ষায় বিশ্বাসের নাম হলো মুসলমান হওয়া। এর জন্য কোন আনুষ্ঠানিক বা বাদাইস হবে প্রয়োজনে নেই।”

পরবর্তী সোপান হলো যদি মুহাম্মদ (সাহ)-কে আল্লাহর নবি ও রসূল হিসেবে বিশ্বাস করা। তাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে খোদা মহিমা, পবিত্রতা এবং প্রশংসা পাওয়া ও মানুষকে তা শিখানোর জন্য। অতএব ইসলামের দ্বিতীয় অবশ হলো মুহাম্মদ (সাহ) আল্লাহর রসূল। তৃতীয় দিক হলো, আল্লাহর সকল সৃষ্টির কল্যাণের জন্য কাজ করা। এর পাশাপাশি একজন মুসলমানকে আল্লাহর করেশতাতা, কিন্তু এবং কর্মের প্রতিফল তথা পরকালেও বিশ্বাস করা উচিত।

এগুলো বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়। এছাড়া একজন মুসলমানের নামায় পড়া, রমণায়ের রোগার রাখা, দুর্ভীত্ব ও অভাবের কল্যাণার্থে যাকাত দেয়া এবং যদি তার সামর্থ্য থাকে তাহলে হজের উদেশ্যে মক্কায় যাওয়া আবশ্যক।

সংক্ষেপে ইসলামের অর্থ হলো আত্মরক্ষণ বিশ্বাস। যে আত্মরক্ষায় বিশ্বাস করে আর সেই মোতাবেক কাজ করে সে মুসলমান। সুতরাং তোমার এ বিশ্বাস থাকতে হবে, আল্লাহ ভিনে কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সাহ) তাঁর রসূল। কোন আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন নেই, অবশ্য তোমার গোসন করে নেয়া উচিত যেন তুমি এভাবে দোয়া করতে পারে, হে আল্লাহ! আমি আমার দেহ হোতে পরিকৃত করছি তুমি আমার ভিতরকে হোতে পরিকৃত কর। একইভাবে খোলাশ পরিবর্তনের প্রতিকৃতি রূপে তুমি তোমার কাপড়ও পাতলে নাও।”

হযরত মসীহ মাওদুন (আঃ) সেই যুবকের নাম রেখেছেন আল্লাহ। তিনি নূর হাসপাতালে উৎসাহ ও উদ্দেশ্যার সাথে বেশ কয়েক বছর কাজ করেছেন।

৯৬
পরে ডাঙ্গ আবদুলাহ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। তিনি একটি পবিত্র জীবনের দৃষ্টান্ত স্পর্শ করেছেন এবং খুব জনপ্রিয় ছিলেন।

হযরত মসীহুদ্দিন মাওদুর (আর্ন)-এর নির্দেশে ১৯০২ সনের অক্টোবর মাসে হযরত নুরউদ্দিন ফেওসিপ্রাফে পবিত্র কুরআনের ১০০ নখক সূরার তফসীরের রেকর্ড করেন। এটা নিম্নরূপ:

"আলাউদ্দিন নামে যিনি আযাতিত-আদিম দানকারী, বাবরাব দয়াকারী। আমরা পড়িয়ে দিবসকে সামর রেখে বলছি, মানুষ ক্রমশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কেবল তারা ছাড়া যারা ঐমান রাখে এবং সৎকর্ম করে আর পরস্পরকে সত্য অবলম্বন ও সত্যের উপর অবিচল থাকার উপদেশ দেয় (১০৩:১-৪)। এ সংক্ষিপ্ত সূত্র সমার্থের মহাসমানিত, দয়ালু ও বাবরাব কুপাকারী এবং বিচার নিরসনের মালিক প্রশ্ন একাকী দূরবর্তন হয়ে, তার নৈক্তি, প্রশাসন লাভ এবং সামাজিক অনিয়ন্ত্রিত হয়েছে, বিচার পাপ স্বর্ণ করেছে। তাকে তিনি এদিকে ইচ্ছিত করেছেন, আলাউদ্দিন নবিদের যুগ এবং মানুষের বোধ-বুদ্ধির পরিপ্রেক্ষাপট ও বিভিন্ন কল্যাণকর অভিজ্ঞতা দিবসের শেষ অঙ্কের মত বিয়ে, যখন সুখ চলে পড়ে। এভাবে আসনের পর জামাতবাদ হয়ে নামায় পড়ে সুফয় থাকে না, অথচ নামায় আদানাপ্রিয় উল্লেখ, খোদার নৈক্তি ও খোদা করার সুফয় নিয়ে আসে। একইভাবে আলাউদ্দিন রসূলের যুগ যা মানুষের বিবেক-বুদ্ধির সম্পূর্ণতা ও কল্যাণকর অভিজ্ঞতার সময় হয়ে থাকে এর অবসানের পর মানুষের হাতে ক্ষয়-ক্ষতি ও ঘটনা কাটিয়ে উঠার আর সময় থাকে না। সুতরাং আলাউদ্দিন রসূলের যুগে যখন মানুষের বিবেক-বুদ্ধি একাকী প্রথম থাকে তখন মানুষের (ক) খোদার সত্যা, তাঁর তোহিদ ও অণুহারা, তাঁর গুনবাণিত ও মাহানবাণী অন্তর্ভূত, তাঁর ভিত্তিতাদের সৃষ্টি পবিত্র প্রেরণাকে বাঁকিবায়, তাঁর আলী প্রথা, তাঁর বিচার এবং অন্যান্য ঐমানি বিষয়ে সত্যত ও সঠিক জনাবর্তন ও বিশ্বাস স্থাপন (খ) এ সকল শান্তি সত্যের উপর পুরো বিশ্বাসের সাথে অনুশোভিত ও নিশ্চিত সত্য প্রাচীন করে যাওয়া এবং (খ) অন্যদের এ ভিন্নতা অন্যায়ী অনুশোভিত প্রাচীন করার কাজ অব্যাহত রাখা উচিত যেন তারাও পুণঞ্জকর্মে অবিচল আর মদ্দর কর্মে থেকে বিচার থাকতে পারে।" ১৯০৩ সনের ফেরাহসির মাসে কাদিয়ানে একজন নবাগত ভাবে তার অভিজ্ঞতার বর্ণনা করেন: "আমি এবং আমার সাথী কাদিয়ানে প্রায় আসনের কাছাকাছি সময়ে পৌঁছি। আমাদেরকে মসজিদে আকাশে দিকে পাঠানো হলো। নামায়ের পর নামায়ের একজন একাকী সমাজনিত ব্যক্তির দেয়া দরস শুনার জন্য হতে কুরআন নিয়ে বৃত্তিকারে বসলেন। তিনি এমনভাবে কুরআনের একটি অংশ
হযরত মৌলিকী নূরউদ্দিন (রা.) - খলিফাতুল মসীহ আউয়াল

তেলাওয়াত এর মাধ্যমে আরস্ত করলেন যা শ্রোতাদের উপর জাদুর মত প্রভাব বিস্তার করল এবং তাদের গতিরভাবে আদেশিত করল। এরপর তিনি তেলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর অর্থ ব্যাখ্যা করে এতে অবশ্যই দর্শন ও প্রভাব উপর আলোকাত্মক করেন। এমন ব্যাখ্যা আমি ইতিপূর্বে কখনো শুনি নি। আমার হৃদয়ের গতিরভাবে অভিভূত হলো। আমি পাশে বসা ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তিনিই কি প্রভাবশালী মসীহ?' তিনি বললেন,'না, ইনি মৌলিকী নূরউদ্দিন।' আমি হতভাগ ছিলাম, যদি এই কামেল পুরোষ ঝুঁ শিয়া হয়ে থাকেন তাহলে গুরু কত মহান হবেন।'৫৮

বদর প্রতিক সম্পাদক যিনি স্থায়ী অনেক বড় একজন আলেম ছিলেন, তিনি মৌলিকী নূরউদ্দিনের প্রাচ্যাহিক কুরআন ক্লাস সম্পর্কে এভাবে মতাভিত্তি ব্যক্ত করেন: "তিনি কুরআনের এ দরস বেসব কাদিয়ানেই আরস্ত করেন নি বরং দীর্ঘকাল থেকে তিনি এভাবে কুরআনের কাজ করে আসছেন। জমু ও কামিয়ার আমি যখন তার কুরআন ক্লাসে বসা আরস্ত করি তখন আমি ছোট ছিলাম। সেসব ক্লাসসই আমাদের সত্যিকার অর্থে মুসলমান বানিয়েছে আর এসব দরসই পরে আমাদের আহমদী করেছে। এ ক্লাস আমার জন্য এট উপকারী প্রমাণিত হয়েছে যে, বেশ কয়েক বছর দৈনিক এ ক্লাসে যোগ দেয়ার ফলক্রিয়াতে আজও আমি প্রতাহ এসব ক্লাসের তাজা ফল উপভোগ করি। তাঁর কুরআন ক্লাসের অন্য বৈশিষ্ট হলো, যুবক-মধ্যবয়সী এবং বৃদ্ধ সকলেই স্ব-স্ব সামর্থ্য অনুসারে এ দরস থেকে লাভবান হয়েছে। অত্য ব্যক্তিও কিছুটা লাভবান হতেন আর এ ক্লাস শুনে এক জনীন জানেন নতুন মাফিয়া যোগ হতে। কাদিয়ানকে যারা আবাস হিসেবে অবলম্বন করেছেন তারা যে সব বড়-বড় নিয়ম উপভোগ করেছেন তথ্যের এ ক্লাসগুলো অন্যতম। আল্লাহ তাআলা চিকাল এর রক্ষা করে করলে যেন আমরা এর মাধ্যমে সদা খোদার আশিয়া ও রহমতের ভাগী হতে পারি।'৫৯

মৌলিকী নূরউদ্দিন গ্রাহিয়ে বলতেন, আল্লাহ যদি জিডিস করেন, তুমি সবচেয়ে বেশি কোন হবে? উত্তরে তিনি তাঁর কাছে কুরআন চাইলেন।

লেখকের পিতা ও কালতি জীবনের শেষ কয়েক বছরে পবিত্র কুরআন মুখস্ত করেছেন। তিনি যখন মৌলিকী নূরউদ্দিনের কাছে এর উল্লেখ করেন তিনি যাপনফল আনন্দিত হন এবং উপস্থিত লোকদের সমৃদ্ধস্বর্ণ বলেন: "নাসরকার খান মৌলিকী নূরউদ্দিনকে এতটাই ভালবাসেন যে তাঁর ভালবাসা লাতের জন্য তিনি নিজ স্ত্রীতি সে গ্রহণে ঘন দিয়েছেন যাকে নূরউদ্দিন সবচেয়ে বেশি ভালবাসে। আর এভাবে নিজের জন্য নূরউদ্দিনের ভালবাসা পাওয়া নিষ্ঠুর করলেন।"
প্রথমতঃ ধর্মবেদ্য ও ইতিহাস

হাফেজ রওশন আলী সাহেব তার বিশিষ্ট-স্থানীয় একজন ছাত্র ছিলেন। তিনি বলেন, "যখন আমি উজিয়াবাদে আমার মায়া হাফেজ গোলাম রসূল সাহেবের

তত্ত্বাবধানে কুরআন হিফায় করেছিলাম। একমাত্রে আমি সর্বপ্রথম এই বিষয় প্রথম দেখি, একজন

সমাজিত ব্যক্তি আমাকে দুর্ঘটনা একটি পেয়ালা দিয়ে বলেন, 'পান করো!' আমি এর বেশি ভাবে পান করলাম। তিনি বলেন, 'আরাম পান করো!' আমি আরো পান করলাম। সে সময়ে আমি স্বপ্নের অর্থ বুঝিনি। কিন্তু যখন আমি

কাদিয়ান এলাকায় তখন বৃষ্টিতে পরেছি, সর্বনিম্নে আমি যে সমাজিত ব্যক্তিকে দেখেছি

তিনি হচ্ছেন মৌলিক নূরউদ্দীন। অনেক সময় শিক্ষা লাভের জন্য আমি সাহায্য

তার সাথে বসে থাকতাম কিন্তু তিনি কখনো বিস্মৃত হতেন না।

যারা তার প্রাত্যাহিক কুরআন কলেজে বসতেন তাদের অনেকেই বিষয় নেতৃস

নিতেন যার উদ্বেগের বিষয় অংশ পরবর্তীতে ছাপা হয়েছে কিন্তু তিনি নিজে

কখনো কোন তফসিল ছাপেন নি। তার মুখে ছিল, কুরআন আলীহোর কথা,

আলহোর মুন্তসা তেমনি তার কথাও সীমাহীন। তাই আমারা এর ব্যাখ্যাকে

সীমিত কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে আবর্জ করতে পারি না। তিনি আরো বলেন,

কুরআনের বুঝি খোদা তালার কথা তাই তিনি নিজেই এর ব্যাখ্যা করেন বলে

আশা করা যেতে পারতো কিন্তু তিনি তা করেন নি আর হযরত মুহাম্মদ (সা:)-

ও তা করেন নি। তার অবহিষ্ট পরের উত্তরসূরীরাও তা করতে পারতো কিন্তু

করেন নি। রিকাহর বড়-বড় চারজন ইমাম তথা আবু হাফিজ, ইমাম মালেক,

ইমাম শাফী, ইমাম আহমেদ বিন হাব্বলদের কেউই কুরআনের তফসিল লিখে

নি। অথচ তাদের প্রথমজনের যুগ হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর যুগ থেকে বেশী

দূরের ছিল না এবং তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর কর্তব্যকে সাহায্যের সাক্ষাৎ

লাভ করেছিলেন। হাদিস সংকলকদের মধ্যে রবারিয়া, তিমুরিয়া, আবু দাউদের

মত প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগত ছিলেন তাদের কেউই কোন তফসিল রচনা করেন নি।

সৌফিদের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ দিব্যতা, হযরত শাহ নকশা বক্সি, হযরত আবুল

কাদের জিলানী প্রমূর্ত বিশেষ ব্যক্তিগত ছিলেন যাদেরকে আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞানের

পাশাপাশি বাহিক জন্ও প্রদান করা হয়েছে এসবের তারা কোন তফসিল

প্রচলন করেন নি। সাহাবুদ্দিন লাদাহায়দি একটি তফসিল লিখেছেন কিন্তু

এতে মৌলিক কোন বিষয় নেই।

মসীহ মাওলী (আ:) যাকে কুরআনের বিহিততত্ত্বের জন্য প্রত্যাহিত করা

হয়েছে তিনি কোন অনুবাদ বা তফসিল ছাপেন নি। যে সমস্ত অনুবাদ ও তফসিলের

ছাপা হয়েছে এথে কে মানুষ কিছুটা লাভবান হয়েছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ

সে সকল তফসিলের ও অনুবাদের শেষ কথা মনে করে এর উপর নির্ভর করে বলে

যাবে এবং নিজে চিন্তা করা ছেড়ে দেবে এতে ব্যাপক ক্ষতি হয়।

৯৫
হয়রত মৌলিকী নূরউদ্দিন (রা.) - খলিফাতুল মসীহ আউয়াল

“আমি একটি তফসীর লিখেছি। আমার বদুরা সেটি ছাপানোর জন্য জোর দিলেন। আমি ভাবলাম, যারা আমার পরে আসবে তারা হয়তো ভাববে, এটিই চূড়ান্ত কথা আর এভাবে নিজেদের জন্য কুরআনী সত্য ও প্রভাল রাস্তা বক্স করে রাখবে। এটি খোদার কিতাব যাতে সকল যুগের সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে আর সকল পরিবেশে এটি আত্মিক ব্যাধির চিকিৎসা। এর কল্যাণেরজিকে সীমাবদ্ধ করা উচিত নয়, তাই আমি একটি অক্টু সমুদ্রে কলসীতে আবদ্ধ করার প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করলাম।”

তার জন্ম পিপাসা ছিল অত্যন্ত। তিনি একটি বিশাল পাঠাগার গড়ে তুলেন যাতে পাসুলিপির আকারে অনেক বিরাল বই ছিল। দূর ও নিকট থেকে এসব সংগ্রহ করা হয়েছে যা অনুলিপি করা হয়েছে। একবার তিনি তার এক শিয়া মৌলিকী গোলাম নবীকে শক্তিকর্তা তফসীরের একটি অনুলিপি প্রক্রিয়ার জন্য সুপাল পাঠান। এটা নবাব সিদ্দিক হাসান খানের পুত্র নুরুল হাসান খানের পাঠাগারে সংরক্ষিত ছিল। হয় খন্ডের এ বইটি লিখতে মৌলিকী গোলাম নবীর

সুপাল থেকে আসার পর তাকে মিলার গিয়ে আলী আমার বিশ্ববিদ্যালয় ও মিশরীয় সরকারের প্রশাসন থেকে ইবনে কাহিয়ামের বই ‘শিফাউনল আলিল ফি মসায়েলিল কায়য়ে ওয়ালান কাদার ওয়াছত তাআলিল’ এর একটি অনুলিপি করতে বলা হয়। এটি পুঠোর একটি বই। এর অনুলিপি প্রক্রিয়া করতে মৌলিকী গোলাম নবীর ১৮ মাস লেগে যায়। আর একটি বই যার তিনি অনুলিপি প্রক্রিয়া করেন তাহলে ইমাম সাইয়তার ‘হামামাল হওয়ামেহ মায়াহ শারাহ জামিউল জওয়ামেহ’ এটি ৭০০ পৃথিবিটি একটি বই।

তার পড়ানোর গতি ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। তিনি সেকাপিয়ারের পুরো লেখনীর আরবী অনুবাদ পড়েছেন।

১৯১০ সালের সেপ্টেম্বরে শিক্ষা সম্পর্কে পাঠাব চিফ কোর্টের বিচারপতি শাহুদিনের এন্টার্টেডে প্রদত্ত একটি বক্তৃতা শুরুর কথা এখনও এ প্রথা প্রণেতার মনে আছে। তিনি এ মন্তব্যের সাথে সমাপ্ত করেন: “যে মাপকাঠি আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি এর ভিত্তিতে আমার বক্তা ও পরিচিত মহলের ব্যাপক গতিতে শিক্ষার একমাত্র পরাকাঠা হলেন কাদিয়ানের মৌলিকী হাকিম

নূরউদ্দীন।”

১৮৮৪ সালের আগস্ট মাসে ভাওয়ালপুরের নবাব অমৃত হলে তার আধ্যাত্মিক গুরু চাঁচা শরীফের খাজা গোলাম ফরিদ তাকে কাদিয়ান থেকে হাকিম নূরউদ্দীনকে আনার পরামর্শ দেন। লক্ষণ দেখে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার

১০০
উদ্দেশ্যে তাঁকে কয়েক দিনের জন্য ভাওয়ালপুর পাঠানোর অনুরোধ জানিয়ে নবাব সাহেব হযরত মসীহ মাওল্ড (আঃ)-কে পত্র লিখেন। তিনি ভাওয়ালপুরে আসেন এবং নবাবের কাজের যতটুকু সম্পর্ক আছে তা শেষ করে কাদিয়ান ফেরত যাওয়ার প্রস্তাব নেন। তখন খাজা গোলাম ফরিদ টেলিগ্রাফের মাধ্যমে হযরত মসীহ মাওল্ড (আঃ)-এর কাছ থেকে আরও কিছুকাল নূরউদ্দিনের জন্য দুপ্লের অবস্থানের অনুমতি নেন। তিনি মৌলিক সাহেবকে বললেন, তাকে ডাকার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো তাঁদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হওয়া আর তাঁর কুরআনের তফসীর শেখা। নবাব সাহেবের অমূল্যতা সে সুযোগ করে দিয়েছে।

মেহতু তিনি ভাওয়ালপুরে, তাই তাঁরা তাঁর কাছ থেকে কিছুটা কুরআন শিখতে আগ্রহী। মৌলিক নূরউদ্দিন ভাওয়ালপুরে কুরআন শিক্ষার ক্লাস আরো করেন। তাঁর ভাওয়ালপুর অবস্থানের মেয়াদ যখন শেষ হয়ে আসছিল খাজা গোলাম ফরিদ নবাব সাহেবের কাছে প্রস্তাব রাখলেন, নূরউদ্দিনকে ভাওয়ালপুরে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য তাঁর উৎসাহিত করা উচিত। নবাব তাঁর সমীপে বিষয়টি নিবেদন করেন, যদিও বিষয়টি তাঁর কাছে একাধিক অপছন্দায় ছিল কিন্তু তাঁর প্রস্তাবের অসাধারণ প্রমাণের জন্য নবাবকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'যদি আমি আপনার পরিকল্পনার শিক্ষার হই তাহলে আমার জীবিকার কি হবে?'

"আমি আপনাকে ৬০ হাজার একর কৃষি জমি দেবো।"

"তা দিয়ে আমি কি করবো?"

"আপনি তা আবাদ করে একাধিক সম্পদশালী হতে পারেন।"

"আমার বর্তমান অবস্থায় আপনি আমার কাছে পরামর্শ ও দিকনির্দেশনার জন্য আসেন। কিন্তু আমি যখন বড় সম্পদশালী হয়ে যাবো আপনি কি তখনও আমার কাছে আসবেন?"

"তিনি বললেন, 'না' মোটেই নয়।"

"তাহলে আমার কি লাভ হলো?"

জীবনচক্র পথে মূলারমুলের স্থান যে কত উদ্বেগ সে সম্পর্কে নবাবের কোন ধারণাই ছিল না যা তাঁর জীবনকে পরিচালিত করতো।"

১৮৯৬ সনে নবাব মোহাম্মদ আলী খান সাহেব হযরত মসীহ মাওল্ড (আঃ)-এর কাছে লিখেন, তিনি কুরআন শিখতে গতিরোধের আগ্রহী। তিনি যদি পছন্দ করেন তাহলে মৌলিক নূরউদ্দিনকে মালিলের কোটলা গিয়ে তাবে কুরআন শিখানোর দায়িত্বে নিযোজিত করতে পারেন। হযরত মসীহ মাওল্ড (আঃ)-এর নির্দেশনা পেয়ে তিনি মালিলের কোটলা খান এবং ক্যাড মাস সেখানে অবস্থান

১০১
হযরত মৌলভী নূরউদ্দীন (রা.) - খলীফাতুল মসীহ আউয়ালাল

করেন। প্রথমে শহরে তার থাকার ব্যবস্থা করা হয় পরে শেরওয়ানী কোট-এ নবাব সাহেবের বাড়িতে তিনি হামাসারিত হন। নবাব সাহেব প্রত্যেকদিন তার ক্লাসে যোগ দিয়ে এবং দুপুরের খাবার একসাথে খেতেন। তার কয়েকজন ছাত্র তার পিছু-পিছু কাদিয়ান থেকে শেরওয়ানী কোট যায়। নবাব সাহেব তাদের থাকা-খাওয়ার সকল ব্যবস্থা করেন। তার কুরআন পাঠ ছায়া মাসে শেষ হয়।

তিনি ভরার অধিবাসী ছিলেন আর কাশ্মীরে কাজ করেছেন। তিনি মৌলভী নূরউদ্দীনকে গতিতে প্রশ্ন করতেন এবং মাঝে-মাঝে তাঁর সাথে দেখা করতে যেতেন। কথা প্রসঙ্গে একদিন তিনি বললেন, মালির কোটালা থেকে বাইরে না গিয়েও তিনি মাসে এক হাজার রূপি আয় করেন। মৌলভী সাহেব তাকে উত্তর দিলেন, কোথাও না গিয়ে সমপরিমাণ রূপি তিনিও আয় করেন।

পরবর্তীকালে নবাব মোহাম্মদ আলী সাহেবের কাছে এক পত্র তিনি লেখেন: “কুরআনের এ আয়াতটি ভালভাবে স্মরণ রাখবেন যে ব্যক্তি খোদার প্রতি দায়িত্বের ব্যাপারে স্থিরবান আল্লাহ তাআলা কর্তা পরিস্থিতি থেকে তার মুক্তির ব্যবস্থা করবেন এবং এমন স্থান থেকে তার জীবিকার ব্যবস্থা করবেন যা সে ভাবতেও পারে না (৬৫৪-৫)। এ বিষয়ে যারা সচেতন আমি তাদের জন্য একাধিক নিরেরি কিন্তু অধম তাতে ততটা স্বত্বান নয়, এ সত্বেও আল্লাহ তার জীবিকার ব্যবস্থা এমন স্থান থেকে করেন যা সে ভাবতেও পারে না। মালির কোটালা অবস্থান কালে আমাকে কোন কোন খাতে খরচ করতে হয়েছে, যে কাজে আমার প্রায় পরিচাল শ রূপী ব্যয় হয়। এর বেশির ভাগ কোথাকে এসেছে আগন্থ ভাবতেও পারবেন না। কেবল আল্লাহই জানেন এটি কোথাকে এসেছে। এমনকি আমার স্বাধীন জানে না।”

তিনি নিজে কারও সাথে বিবেক জড়িত হয়ে চাইতেন না কিন্তু যখন তাকে কারে মূল্যমূখী হতেই হতো, কোন গতান্তরথার্থতাতে তখন তিনি আল্লাহর সাহায্য ও আমার জন্য দোয়া করতেন আর সবসময় সঠিক দিকনির্দেশীয় পেতেন। একবার লাহোর সফরকালে একজন হিন্দু আইনবিদ তার সাথে দেখা করতে আসেন। আসার পূর্বে সে তার বন্ধুদের বলে আসে, সে আমি মৌলভী নূরউদ্দীনকে আমার পুনর্জ্যোতি ও জনাবিন্দব সম্পর্কে আলোচনায় কোনাশীসা করবেন। তার মুক্তির ছিল, মানবের মুক্তির অবস্থা ও পরিস্থিতি, বিষয় ও দারিদ্র, সাহাবা ও রোগবাহী প্রভৃতির শুধু তখনই হিসাব হতে পারে যদি তার এক চক্রের আচার-ব্যবহার পরবর্তী চক্রে তার অবস্থা কেমন হবে তা নিরুপন করে আর যদি এটি মনে নেয়া হয় যে আল্লাহ তাআলা বক্তর
প্রখ্যাত ধর্মবেদা

উপর কোন নিয়ন্ত্রণ রাখেন না। তার বিষয়টি উপস্থাপনের পূর্বেই মৌলিক সাহেব নিজের পকেট থেকে দুটো রৌপ্য মুদ্রা বের করেন এবং সেগুলোকে আইন ব্যবসায়ীর সামনে রেখে বললেন, আপনি এ দুটোর একটি হাতে নিন। আইনবিদ কোন নড়াচাড়া না করে নীরবে বলে মুদ্রা সম্পর্কে প্রায় আগে ঘট্টা কি যেন ভুলি ছিল। এ নাটকীয় নীরবতা উপস্থিত লোকদের আচর্যাসম্পন্ন করলো এবং কেউ একজন আইনবিদকে জিজ্ঞেস করলেন, একটি মুদ্রা উঠাতে বাধা কোথায়?

তিনি বললেন, “আমি অদৃষ্ট অনিশ্চিত পরিস্থিতির সময়েইন। যে মুহূর্তে একটি মুদ্রা উঠাবে আমাকে প্রশ্ন করা হবে, আমি কেন অন্যটির উপর এটিকে প্রাথমিক দিলাম। আর তখন আমাকে এ প্রশ্ন করা হবে, যদি একটি মুদ্রাকে অন্যটির উপর প্রাথমিক দেয়ার বিষয়ে আমার স্বাভাবিক থাকাকে তখন মানুষের অবশ্যায় ব্যাপক বৈচিত্র্যাত্মক সৃষ্টি ব্যাপকে অপারে কি স্বাভাবিক থাকতে পারে না? এ মুহূর্তে আমার কাছে এর কোন উক্তি নেই। আরও ভাবার পর আমি আলোচনায় ফিরে আসবো।” এ ব্যাপ্তি আর ফিরে আসেনি।

একজন পশ্চিমা থানার পাড়া ত্রিভুবন সম্পর্কিত আলোচনায় কোনাকার হবার পর এই অনুমানসূচক কথা বলে পালানোর চেষ্টা করে যে এশিয়ান মস্তিষ্ক ত্রিভুবনের রহস্য বুঝতে অক্ষম। তাকে তখন এ উভয় শুনতে হলো: “হ্যা, আপনি ঠিকই বলেছেন। সে কারণেই তো ঈশা, পিতঃ এবং পল এ বিষয়টি বুঝতে পারেন নি, কারণ তাদের সকলেই এশিয়ান ছিলেন।”

একজন থানার পাড়া তার ‘কুরআন ডিসপেনসার’ (অপ্রয়োজনীয় কুরআন) বইটি মৌলিক সুরুরীনকে উপহার দিয়ে মনোযোগ সহকারে পড়তে বললেন। এর বিষয়বস্তু হলো, কুরআন ঈশ্বরী নয় বরং আরবী ভাষায় রচিত মুখ মতবাদ ও শিক্ষার সমবেদ রূপ যা পূর্বের বিভিন্ন ঈশ্বর মনোনিত, তাওআত, ইমানে, তাওআত, ও মিনাবেস্তা ঈশ্বরের মাধ্যমে সামগ্রিক। লেখক কুরআনের বাক্য কথকর্ম করতে বেছে নিয়ে প্রচেষ্টা করে। এ গ্রন্থের কোন না কোনটির সাথে সামগ্রিক বিষয়ের চেষ্টা করেছে। বইটি পড়তে মৌলিক সাহেব বশি সময় নেন নি। তিনি নিয়মকর মন্তব্যের সাথে বইটি লেখককে ফেরত দিয়েছেন: “আপনার বইটি পড়ার সুযোগ করে দেয়ার জন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। এটি পড়ে আমার ঈশ্বর ও বিশ্বাস অত্যন্ত দৃষ্টি রেখে যে কুরআন সত্যিকার অর্থে অন্যায়তম হলো। অগ্রিম ভাবা যেমন: সাক্ষর শিক্ষা, ইমান এবং পলাই ঈশ্বর বিভিন্ন বহি সংগঠনিত ও পড়া (বলা হয় শুধু বেস্ত পড়তে চলিঃ বছর বছর লাগে) আর সে সব গ্রহে যে সব সত্য অন্তর্নিহিত রয়েছে তা আয়ত করা সমর্থন স্বাধীন প্রথম দিকের একজন নির্দেশ আরবের জন্য নিঃসন্দেহে সাধারণত বিষয় ছিল। তাছাড়া কুরআন বিষয় ছিল।
নেতার মৌলিক নুরউদ্দীন (রা.) - খলিফাতুল্লাহ মসীহ আওয়াল

করিমেই একমাত্র প্রথা যা সম্মান সেতার অন্তর্নিহিত দর্শন বর্ণনা করে আর যুক্তি ও প্রাকৃতিক যোগাযোগ মাধ্যমে সামগ্রিক ও সংহতি দেখিয়ে থাকে। কুরআন আগমনের পূর্বে রাজা বাদশাহুরা জোর জবরদস্তি করে প্রজাদের উপর তাদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি চাপাতো। ধর্মীয় নেতারা সাধারণ মানুষকে ধর্ম সম্পর্কিত বিষয়ে তাদের কৃত্ব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করার অনুমতি দিত না। ধর্ম গুরুরা ছাড়েন কোন প্রকার সংহিতাকে সহযোগী করত না। কুরআন শিক্ষার মাধ্যমে বুদ্ধিবৃদ্ধির সংহিতার একটি নব যুগের সৃষ্টি করেছে এই বলে, তোমরা কেন যুক্তি থাকাও না, তোমরা কেন চিন্তা কর না। তারা কুরআন নিয়ে কন ভাবে না?

একজন প্রধান দার্শনিক যিনি সবকিছু বিশ্লেষণ করা ভালবাসতেন তিনি সবার কাছে কোন না কোন বিষয়ের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করতে অভাব ছিলেন, যে উভয়ই দেখা হতো তিনি যা বিশ্লেষণ করে এর যৌথ মানুষের সাথে প্রকাশ করতেন আর এভাবে মানুষকে তার ব্যাপক পাদঠায় মানাতেন। একবার তিনি মৌলিক নুরউদ্দীনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রশ্ন কি?' তিনি উত্তর দিয়েন, 'প্রশ্ন হলো সকল প্রাকার পাপ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা, শিক্ষা থেকে আরো করে সামান্তর অভিন্নতাতেও এর অন্তর্ভুক্ত।' দার্শনিক উত্তর হলো হতভাগ হয়ে গেল এবং জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার উত্তরের প্রশ্ন কি?' কুরআনের একজন হাফেজ যিনি গ্রন্থকারকে সেখানে উপস্থিত ছিলেন মৌলিক সাহেব তার দিকে ফিরে বললেন, আপনি অনুগ্রহপূর্বক দার্শনিক সাহেবের জন্য পরিত্র কুরআনের ১৭ নং সুরার ৪ এবং ৫ নং আয়াতত্ত্ব তেলাওয়াত ও অনুবাদ করুন? হাফেজ সাহেব এটা করেছেন এবং এর অনুবাদ নিম্নরূপ: "এবং তোমার প্রভু তুই ইব্রাহীম অব দিয়েছেন যে তোমরা তাকে ছাড়া আর কারা ইব্দাত করে না এবং পিতামহের সাথে সাবধান করো। যদি তাদের একজন বা উভয়ই তোমার জীবদ্দশায় বাধ্যকে উপনীত হয় তাহলে তাদের উভয়কে তুমি উভয় প্রবর্তন বলে না এবং তাদেরকে তাড়িয়ে দিও না বরং তাদের সাথে সম্মানসূচক ও মমতাপূর্ণ কথা বলা। তাদের সাথে বিনয়বান কোমল আচরণ করো এবং দেখা করো, হে আমার প্রতিপ্রাণক! তুমি তাদের উভয়কে প্রতি দেখে দয়াপরবশ হও দেখা তারা শৈশবে আমাকে প্রতিপালন করেছিল। তোমাদের হ্যাঁ যা কিছু আছে তোমাদের প্রতিপালক তা সর্বাধিক অবগত আছেন। যদি তোমরা সৎকর্মপ্রাপ্ত হও তাহলে স্রষ্টা রেখে যারা বার বার আল্লাহর কাছে বিনতি হয় নিষ্ঠা তিনি তাদের প্রতি অতি ক্ষমশীল। আরেকটী তার প্রাপ্ত দাও একইভাবে মিসকীন ও প্রখ্যাতী করতেন এবং শয়তান প্রভু প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ। যদি তোমার প্রভুর রহমত লাভের প্রত্যাশায়
প্রখ্যাত ধর্মবেদ্য

তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হয় তাহলে তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বলো। তুমি কৃপণতাবশত তোমার হাত সম্পূর্ণভাবে উঠিয়ে নিও না নতুন তুমি নিঃপত্ত, ক্লাস্ত হয়ে যেতে যাবে এবং তা সম্পূর্ণরূপে প্রসারিতও করো না তাহলে শোনা হাত হয়ে তুমি সদর্দ নিঃবর হয়ে যাবে। নিঃশ্বাস তোমার প্রভু যার জন্য চান জীবিকা সম্প্রসারিত করেন এবং যার জন্য পছন্দ করেন তা সংক্ষিপ্ত করেন। নিঃশ্বাস তুমি নিজ বান্ধব সম্পর্কে সম্মুখ অবর্জন ও সর্দিক। দরিদ্রের ভয়ে তোমারা তোমাদের সমানস্কর হত্যা করা না। আমরা তাদের রিয়াক্ত দিয়ে থাকি আর তোমাদেরকেও। নিঃশ্বাস তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ। তোমারা ব্যাপিতকের কাছেও যেহেতু না। নিঃশ্বাস তা প্রকাশ অশ্লীলতা ও নিকৃষ্ট পশ্চা। কোন প্রাণ যাকে আলাহ পবিত্র আখ্যা দিয়েছেন তাকে বৈঠারি কারণ ছাড়া হত্যা করবে না। যে ব্যক্তি নির্ভরিত অবস্থায় নিঃত হয় অবশ্যই আমরা তার উভারাধিকারীকে প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার দিয়েছি কিন্তু সে যেন হত্যার ব্যাপারে সীমান্ত না করে। নিঃশ্বাস সে সাহায্য প্রাপ্ত হবে। এতিম যতদিন প্রাণ বয়সে উপনীত না হয় ততদিন সবচেয়ে কল্যাণজনক কারণ ছাড়া তার সম্পত্তির কাছেও যাবে না আর তোমারা অশির্কার রক্ষা করো। কোনা অশির্কার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। যখন তোমারা মেঝে দাও পরুম্পরি দাও, সঠিক দাঁড়িগুলির বেজন করে দাও। পরিপালনের দিকে থেকে এটি কল্যাণজনক ও সর্বপ্রাচী এবং যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই এর প্রচারনসর্ব করো না। নিঃশ্বাস কর্ম, চর্চা এবং হৃদয়ের প্রতিজ্ঞাক্রিয়াকে প্রেরণ সমুহীন হতে হবে। সুষ্পষ্ট দেখান চলে না কারণ তুমি কখনো সুষ্পষ্ট করতে পারবে না এবং আর যাতে সবচেয়ে উঁচু পদমযাদার অধিকারী তুমি কখনো তাদের ছাড়িয়ে যেতে পারবে না। এ সবক্ষুর মন্দ বৈঠা প্রকাশ তোমার প্রভুর দৃষ্টিতে অতি যুক্ত। এটি সে প্রজাতে অন্তভূক্ত যা তোমার প্রভু তোমার প্রতি ওই করেছেন; এবং তুমি তোমার প্রভুর সাথে কোন উপাস্য স্বর্গী করা না অন্যথায় তুমি বিদ্যাধিক্য ও তিরস্কৃত হয়ে জাহানারমে নিঃসেব হবে (১৭:২৪-৪০)।

উত্তর তুলে দার্শনিক সাহের একেবারে নির্বাক হয়ে যান।
বিজ্ঞ উপদেষ্টা

১৮৫৭ সনের সিপাহী বিদ্রোহ, যা পরবর্তীকালে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম নামে আখ্যায়িত হয়ে ভারতীয় মুসলমানদেরকে চরম দুর্দশা ও নৈরা�ত্মিক মাঝে দোদুল্যমান অবস্থায় ছেড়ে যায়। ইহ ইংরিজ কোম্পানী, যারা কর্তব্য ভারতকে নিয়ন্ত্রণ করছিল, ভূলমিথ মুসলমানদেরকে বিদ্রোহের জন্য প্রধানত দায়ী মনে করে প্রতিষ্ঠানের পায়তারা করে। কোম্পানীর পেশাদারী সর্বোচ্চ এবং সবচেয়ে দূর্বল মোখল বাদশাহ তাদের হাতের ক্রীড়াক্ষ ছিলেন। তাঁর হাতে কোন প্রকার কর্তৃত্ব না থাকা সত্ত্বেও বিদ্রোহীরা তাঁকে তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের ভান করতে বাধ্য করে। যে অবস্থায় তিনি ছিলেন এতে তাঁর কোন গতিমুখও ছিল না আর সে কারণে তাঁকে যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়েছে। তাকে বার্মায় নির্বাসনে পাঠানো হয় এবং রেস্তুনে তাঁর জীবনের করণ পরিসমাপ্তি ঘটে এবং সেখানেই তাকে দাফন করা হয়।

তাঁর দিলের অবস্থায় কালে অমত পক্ষে বেদনাদায়ক স্নীতি হিসেবে হলেও মুসলমানদের হারাো গোরোর কথা স্মরণ হতো এবং তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অলিক ঐক্যকে ধরে রাখার কারণে তিনি সহায়ক ছিলেন। তাঁর এ দেশান্তরের ফলে নির্মম ও করণ বাস্তবক্তা ছাড়া আর কিছুই বাকী থাকে নি। ধর্ম ও সংস্কৃতি উভয়ের ক্রমপত্তন ঘটে। মোটের উপর মুসলমান আলাম ছিল অজ্ঞ, প্রতিক্রিয়াশীল এবং জ্ঞান ও সংক্ষেপের পথে অত্যাবশ্য।

ব্রিটিশ ইংরিজ ব্রিটিশ প্রশাসনের সূচনারপথ থেকেই বিভিন্ন দিকে ধীরে ধীরে উদ্ভিদি পরিলক্ষিত হতে থাকে কিন্তু মুসলমানদের পশ্চাতের অবসান ঘটেনি। তারা এ সুযোগকে কাজে লাগাতে পারেনি। লড়াই মেকারের প্রস্তাবে ইংরেজীকে ভারতের উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমে হিসেবে অবলম্বন করা হয়। দুর্ভাগ্যবশত মুসলমান আলামকে ঘোষণা করে বসে, ইংরেজী শিক্ষা ইসলাম-বিরোধী কাজ। এর ফলস্বরূপে মুসলমানদের অগ্রগণ্য আরও থেমে যায়। যেখানে মুসলিমরা উচ্চশিক্ষার সকল সুযোগকে পুরোপুরি লুফে নেয় সেখানে মুসলমানরা ক্রমশ পিছিয়ে থাকে। ইংরেজীর জানের অভাব স্বাভাবিক কারণেই তাদেরকে সরকারী বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানে কাজের অযোগ্য করে তোলে আর তা একচেটিয়া অমুসলিমরা লুফে নেয়।

১০৬
বিত্ত উপদেষ্টা

জাননীতি নেতৃত্বের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি মুসলমানদের সকল দুঃখ-দুর্দশার কারণ। উন্নতবিশ্ব শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে স্যার সাইয়েদ আহমদ খান, যিনি পরে 'স্যার সাইয়েদ' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন, অনুবাদন করলেন, মুসলমানদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো শিক্ষার। তাই সেই শূন্যতা দূর করার জন্য তিনি যথাস্থলে একজন আত্মনিয়োগ করেন। তিনি তাঁর সাথে সমানভাবে উদ্দুর কিছু নিবেদিত প্রণয় সংগঠন জড়ি করেন যারা তাঁর মত একই আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন। তাঁরা সমস্তাবলে আলীগড় উচ্চশিক্ষার নিম্নের একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন আর তিনি এর নামকরণ করেন মোহাম্মদান এলো-ওরিয়েল্লাল কলেজ। সমস্ত ভারত থেকে এটি হতে আকর্ষণ করে আর সারা দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম বিদ্যাপীঠ সরবরাহ হয়। এটি এলাহাবাদ বিদ্যানিদ্রায়র সাথে সংঘর্ষিত ছিল। পরে এটি স্বয় আলীগড় মুসলিম বিদ্যানিদ্রায়র হিসেবে সরকারী অনুমোদন প্রাপ্ত হয়। স্যার সাইয়েদের সৃষ্টি এ প্রেরণা দেশের অন্যান্য অঞ্চলগুলো ছড়িয়ে পড়ে। মুসলমান ছাড়া স্থানীয় পর্যায়েও সাপ্তাহ উচ্চ শিক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভিত্তি হতে আরম্ভ করে।

মৌলভী নূরুদ্দিন মুসলিম শিক্ষার জন্য স্যার সাইয়েদ আহমদের সকল আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা সাধুবাদ জানান এবং উদার হতে এসব খাতে ব্যাপক জনান।

স্যার সাইয়েদ আহমদও তাঁকে গভীরভাবে প্রশ্ন করেন, এবং তাঁর সহযোগিতাকে মুল্লায়ন করেন। স্যার সাইয়েদ আহমদকে প্রশ্ন করার হয়েছিল, "যখন একজন নিঃস্বরুপ ব্যক্তি পাড়া লেখায় দক্ষতা অর্জন করেন, তিনি শিক্ষিত হিসেবে পরিচিতি পান, যখন তিনি জানান সম্মানে আরও এগিয়ে যান তখন তিনি দার্শনিক হন, আর যখন তিনি নিতিক ও আধ্যাত্মিক মুল্লায়নকে রঙ্গ করেন তিনি সূফী হন কিন্তু একজন সূফী যখন উন্মুক্ত করেন তিনি কি হন?" স্যার সাইয়েদ আহমদ লিখে পাঠান "তিনি নূরুদ্দিন হন।" 88

মৌলভী এনায়েতুর রসূল চিদিয়াকোটি একজন জানি মৌলভী ছিলেন। তিনি ইন্দিরা ও স্বাক্ষী ভালুক জান রাখতেন আর ইউনিয়ন ও সাহিত্য অন্যতম গভীরভাবে পাড়েছিলেন। তিনি স্যার সাইয়েদ আহমদের কাছে প্রশ্ন রাখলেন, কুরআন ও তাওরতের তুলনামূলক পাঠের জন্য ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে তাওরতের একটি তফসির লিখা দরকার ছিল তিনি নিজে এটি সংকলনের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। স্যার সাইয়েদ অনুমোদন করলেন এবং এ কাজে বাঙালিরায়ের জন্য মৌলভী নূরুদ্দিনকে সহযোগিতার অনুরোধ জানিয়ে পড়।

১০৭
হযরত মৌলভী নূরুদ্দিন (রা.) - খোলিফাতুল মসীহু আউয়াল

লিখলেন। তিনি তাত্ক্ষণিকভাবে প্রক্ষ্ত হয়ে গেলেন কিন্তু মৌলভী এনারেতুর রসূল কোন কারণে সে কাজ আরম্ভ করতে পারেন নি এবং বিষয়টি আর এগোয়নি।

স্যার সাইরোয়েদ আহমদ কিছুটা মুক্ত চিন্তার অধিকারী ছিলেন। তার দৃষ্টিবিন্ধু ছিল, কোন ওরুপূর্ণ কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে দেয়া প্রথমে এক ধরনের ইবাদত এবং একটি আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া মাত্র। দোয়ারাকারী নিজ হস্তায় যে বিশেষ লক্ষ্য পোষণ করে তা অর্জনের সাথে দেয়ার কোন সম্পর্ক নেই। তিনি বাচনিক ওই হতে পারে বলেও বিশ্বাস করতেন না। তার মতে যাকে বাচনিক ওই হিসেবে উল্লেখ করা হয় তা মানব হস্তের এক প্রকার প্রেরণা বৈ আর কিছু নয়। হযরত মসীহু মাওউদ (আঈ) হযরত নূরুদ্দিনের অনুরোধে তার বই 'বারাকাতুদ দেয়ায়া'তে উদ্ভাস উন্নত ধারণার খনন করেছেন। তিনি লিখেছেন, এমন ধারণা পোষণ করে স্যার সাইরোয়েদ আসলে ব্র্যাত ও সর্বোচ্চ সম্পর্কে হায়ী ফাউর্ট সুষ্টিক করার চেষ্টা করেছেন।

দোয়া যে গুহীত হয় তা তিনি স্যার সাইরোয়েদ আহমদকে দেখানোর প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তিনি প্রতিষ্ঠা লেখক সংক্রান্ত তার ভিত্তির পথিকৃত সম্পর্কে হায়ীর দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যার নিয়ে ছিল দেয়ায়া। এটি পূর্ব হলে দেয়ায় যে গুহীত হয় আর বাচনিক ওই যে হতে পারে তা প্রমাণ হয়ে যাবে। তিনি উত্তরটি তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দৃষ্টিতেও তুলে ধরেছেন। তিনি স্যার সাইরোয়েদ আহমদকে তার বই 'বারাকাতুদ দেয়ায়া' ও 'ইজালায়ে আওহামর' একটি করে কন্ঠ পাঠিয়েছেন। উত্তরে তিনি তাকে (আঈ) ধন্যবাদ জানান এবং দোয়ার অনুরোধ করেন।

জীবনের শেষের দিকে স্যার সাইরোয়েদ আহমদ তার এক অমুসলিম কর্মচারীর দুর্নীতি ও অসাধারণ গতিরাবারে মমহাত্মত ছিলেন। সে বিশ্বাস যাত্রকা করে এবং স্যার সাইরোয়েদ আহমদ মানব কলামণমুলক কাজের জন্য যে অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন এর একটি বড় অংশ চুরি করে নিয়ে যায়। এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি তার ছেলে মাহমুদের ভাষ্যানুসারে সে মসলিওয়াই বহুসংস্ব তার মৃত্যুকে ভূরিমান করেছে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি মৌলভী নূরুদ্দিনকে লিখেছেন, তিনি বুঝতে পেরেছেন দেয়া ছাড়া কিছু অর্জন করা সম্ভব নয়।

ফয়েকজন অমুসলিম প্রতিনিধি যে মহান সর্ববর্ষ সংহিতলের আয়োজন করেছিলেন তা ১৮৯৬ সনের ২৬ থেকে ২৯শে ডিসেম্বর লালেরে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার জন্য ৫টি প্রথ্ম প্রস্তাবিত হয়। হযরত মসীহু মাওউদ (আঈ)-কে সে
বিষ উপদেষ্টা

সব প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠের আমন্ত্রণ জানানো হয়। তিনি সশিকারে এতে অংশ গ্রহণ করেন নি কিন্তু একটি প্রবন্ধ রচনা করেন এবং হযরত মৌলভী আবদুল করিম (রা:) তা সম্মেলনে পাঠ করেন। ছয়জন মডার্নিয়ের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত মৌলভী নুরুদ্দিন। তাকে দ্বিতীয় দিন সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে বলা হয়। তিনি নিম্নলিখিত মন্তব্যের মাধ্যমে অধিবেশন আরম্ভ করেন।

"খোদার দয়া, অনুকম্পা ও তার সাবজেনের রিয়াদ এবং তার বিশেষ অনুগছ যা তার মননীত দাসদের উপর বর্ধিত হয়ে থাকে তা যদি মানুষ লাভ না করতো তাহলে তার অতিক্রম বিলুপ্ত হতো। এ যুগে তিনি যে আমাদের উপর বিভিন্ন অনুহাব করেছেন এর একটি হচ্ছে জানা আর আমাদের বিভিন্ন মাধ্যম এবং অপাধ্য জান ভাবার যা মনুষ্যের নাগাদের মধ্যে রয়েছে। পর্যন্ত কাজগ, অগাহিত ছাপাখানা, ডাক বিভাগের ব্যবস্থাপনা যার মাধ্যমে সামন্ত ছয়ছে আমরা আমাদের ধ্যান-ধ্যান দুর্বলী দেশে পৌছতে পারি, টেলিফোনের সুযোগ, রেল, বাম্পিচাইত জাহাজ এবং অন্যান্য যানবাহন তাদিগ খুঁজে দেওয়ার দায়। মানুষ যদি এসকল নিয়মকে কল্যাণজনক কাজে না লাগায় বরং অপব্যবহার করে তাহলে তাকে দেখলে বিশ্বাস দিতে হবে এবং দে শাস্তি পাবে। যদি কল্যাণের কোনও ব্যবহার করে তাহলে এ নেয়ামত তার জন্য আরও বৃদ্ধি পাবে। আমার বাল্যকালে বই খুব একটা পাওয়া যেতো না। যাদের কাছে ছিল তারাও ধার দিতে চাইতো না। পরে কন্ঠস্থলের মিশর, ত্রিপল, তিউনিসিয়া, মরক্কো থেকে উল্লভমনের ছাপা বই সহজলভ্য হয়ে গেল। তাই সবার উচিত শাস্তির এর এই নিয়ম থেকে যথাসাধ্য লাভবান হবে চেষ্টা করা।

ধর্মের প্রয়োজনের উপর জোর দেয়ার কারণ হলো, মানব জীবনে নিয়ম-কানূনের প্রয়োজন রয়েছে। আইনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবাধিকার সুনির্ধিত করা। আইনের সীমাবদ্ধতা হলো, এটি শুধু যখন অপরাধ সংঘটিত হয় তখন অপরাধীকে শাস্তি দিতে পারে। পাপের কারণকে নির্মূল করার কোন ক্ষমতা এর নেই। দৃষ্টিগৃহি, যখন ধর্মনাশনের ঘটনা ঘটে যায় তখন আইন শাস্তি দিতে পারে কিন্তু আইন কখনো নেঁদে কামনাবাসনকে দূর করতে পারে না বা দুই সাথীকে বর্জন ও লাগামহীন চেষ্টা করে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, যা সে বাক্কাকে পাপে প্রহরিত করে। কেবল ধর্মই আমাদেরকে এই পাপ থেকে বিরত রাখে। এটি পাপকে সৃষ্টি করতে শিখায়। ধর্মের দৃষ্টিতে একজন পাপী এবং পৃথিবীর সমাজ

১০৯
হযরত মৌলী নূরউদ্দিন (রা.) - খলিফাতুল মসীহ আউয়াল

নয়। তারা তাদের বিশ্বাস ও আচরণের দিক থেকে সমান নয়। আর তাদের কাজ সমান ফলাফল বহন করে না। যা আইনের গতি বহির্ভূত তাকে অবৈধ আখ্যা দিয়ে শুধু ধর্মই মানুষকে সে পাপ করা থেকে বিরত রাখে। কিছু পাপ আছে যা মুখ্য এবং গণমাত্মক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে নিদর্শিত আর সরকার এবং সমাজ ও সেনানিকে নৈতিকতা বিবর্ধিত আখ্যা দিয়ে থাকে। কিন্তু এসবেও সরকার বা সমাজ কেউ এটি শক্তি প্রয়োগে সম্পূর্ণভাবে নিমৃত্ত করতে পারে না। যেমন মদ পান বা অপকর্ম, যাতে উভয় পক্ষের সমাধি থাকে। কেবল তাদের সমালোচনা করে নয় বরং এমন সকল প্রক্ষাল, চিত্তা-ভাবনা ও কামনা-বাসনা যা পাপে প্ররোচিত করে তা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শুধু ধর্মই এমন পাপ নিমৃত্ত করতে পারে।

সুতরাং সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের জন্য আইনের প্রয়োজন আছে, কিন্তু যে আইন একাধিক পুলিশ সমাধি করতে পারে তা হলো ধর্মের ঐতিহ্য আইন। কেবল সে আইনেরই এ ক্ষমতা আছে এবং মানুষের প্রবণতা ও আকর্ষণের উপর এর এমন নিয়ন্ত্রণ রয়েছে যা কোন নিরক্ষ ক্ষমতাধর ও সৈনিক সরকার প্রণীত আইনেরও নেই।

সুতরাং ধর্মের অধ্যয়ন আমাদের প্রধান দায়িত্ব হওয়া উচিত, কেবল সামাজিক আইনকে নিচ্ছিদ্র করার মানসে নয় যা সমাজে শাস্তি ও শৃঙ্খলার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে বরং অন্য সকল প্রকার নোংরামী থেকে মুক্তির জন্যও আমাদের এমনটি করা উচিত। এ প্রয়োজন সর্বোচ্চ্চভাবে মিটানোর জন্য আমাদের যথাসাধ্য পরিকল্পনা হতে নেয়া উচিত।

এখানে আলোচনা তাতালা যেখানে এ কাজে আমাদের সাহায্যের জন্য নিভিন প্রকার উপায়-উপকরণ ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছেন, সেখানে ধর্ম খোদার পক্ষ থেকে আচার-আচরণ সংক্রান্ত যে আইন ও বিধি প্রবর্তন করে আমাদের আচরণের অধিনস্থ করে, আমরা যদি তা কাজে লাগিয়ে এ সমস্ত নিয়ম-কানূন সম্পর্কে প্রশ্ন না করি তাহলে এটি হবে আমাদের পক্ষ থেকে চরম অকৃতজ্ঞতার শামিল। তাই ধর্মের ব্যাপারে একাধিক যত্নবান হওয়া আমাদের জন্য আবশ্যক আর এইটি এ সম্মাননের মূল উদ্দেশ্য।"^60

সেদিনের অধিবেশনে শেষ বিষয় ছিল হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর প্রবন্ধ পাঠ যা পরবর্তীকালে 'ইসলামী নীতি দর্শন' নামে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি সম্মাননের পুরবেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, এ সম্মাননে যত প্রবন্ধ পাঠিত হবে ঐতিহ্য সংবাদের ভিত্তিতে তাকে নিশ্চিত দেয়া হয়েছে, সেখলোর মধ্যে তার সনদভ নিশ্চিত।

১১০
বিজ্ঞ উপদেষ্টা

সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হবে। প্রথম থেকেই এটি মন্ত্রমুদ্রের মত শোনা হয়।
অধিবেশনের সমাপ্তিতে সমেলনের জন্য নির্ধারিত পাঠচিত্র প্রদেশের মধ্যে ষোড়শ প্রথম প্রশ্নের উত্তর পাঠ সহজ হয়। যাদুপ্রদর্শন শ্রোতৃমন্ত্রী দারী জানান, সমেলনের মীমাংসকাল নির্ধারিত তিনদিনের স্থলে একদিন বাড়ানো হোক, যেন পুরো প্রবন্ধ পাঠ শেষ করা যায়। তখন সমেলনের ব্যবস্থাপক কমিটি মদারেটদের মতামত নিয়ে হলীদী আরও একদিন ব্যবহারের জন্য আত্মীয় মেহায়তে ইসলামের কাছ থেকে অনুমতি নিলেন আর সভাপতিকে প্রয়োজনীয় বিষয়াদিতে ঘোষণার অনুরোধ করা হল। মৌলিক নূরউদ্দিন নির্দিষ্ট বস্তুতের মাধ্যমে অধিবেশন সমাপ্তির করলেন: "বন্ধুগণ! আপনারা হযরত মিয়া সাহেবের প্রথম প্রশ্নের উত্তর পাঠেছেন। আমরা সকলকে মৌলিক আদুল করিম সাহেবের কাছ এটি উত্তর পাঠের জন্য কৃতজ্ঞ। এখন আমি আপনাদের ভূত সংবাদ দিচ্ছি যে প্রবন্ধ শোনার সময়ে আপনারা এতে যে উত্তাহ ও উদ্দেশ্য প্রদর্শন করেছেন এর নির্দেশে এবং মদারেটদের ও বিশিষ্ট স্থানীয় শ্রোতৃসম্মানের কল্যাণকেরহি কমিটি সমেলনের সময় আরও একদিন বর্ধিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যেন মির্যা সাহেবের সম্পূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ শেষ করা সহজ হয়।" ৫৩

প্রবন্ধের বাকী অংশ ২৯শে ডিসেম্বর পাঠিত হয়।

সমেলন শেষে কায়নিবহী কমিটি মদারেটদের মতামত ব্যক্তির করার অনুরোধ জানান। অনুরোধ রক্ষা করতে পিয়ে মৌলিক নূরউদ্দিন বলেন:

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোন উপাসনা নেই, তার কোন শরীক নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ (সা) তার বাদাম ও রসুল।

বল, আমি আশ্রয় চাই মানুষের প্রতিপালকের নিকট, মানুষের অধিপতি, মানুষের মারুদের নিকট এমন কোম্পলাকারীর অনিচ্ছি থেকে যে কোম্পলাকা দিয়ে কেটে পড়ে, যে মানুষের অন্তরে কোম্পলাকা দেয়, সে দৃষ্টির আড়ালে থাকাক বা সাধারণ লেকদের অন্তর্ভুক্ত হোক না কেন।" (১১৪:২-৭)

এবং একটি সংক্ষিপ্ত বুক্তার করেন যার সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ:

"হযরত মুহাম্মদ (সা) এ প্রতিযোগি করেন, তিনি আল্লাহর বাদাম যা কলমার অবিচ্ছেদ্য অংশ। উদেশ্য হলো যেন আল্লাহর একত্বাদের সাক্ষ্য দিতে পিয়ে মুসলমান একথা মনে রাখে আর কাউকে আল্লাহর সাথে শরীরি করার ব্যাপ্তিতে নিপতিত না হয়।

১১১
হযরত মৌলিকী নূরউদ্দিন (রা.) - খলিফাতুল মসীহ আউয়াল

অমি যে আয়াতগুলো তেলাওয়াত করেছি এতে আল্লাহর তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ আছে যেমন মানুষের প্রতিপালক, মানুষের অধিপতি, মানুষের উপাস্য যার মানুষের দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার সাথে সম্পর্ক আছে। যে সত্তা মানুষের দেহ, বুদ্ধি এবং আত্মার দেখাশোনা ও লালন-পালন করে তাকে প্রভু-প্রতিপালক আখ্যা দেয়া হয়েছে। যদি মানুষের দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাস এবং কথা ও কর্মের হিসাব নিবেন তাকে মানুষের বাদশাহ বা অধিপতি আখ্যা দেয়া হয়েছে। আর যদি মানুষের সত্যিকারের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কাজিত সত্তা তাকে মানবজাতির খোদাই আখ্যা দেয়া হয়েছে।

এর মাধ্যমে আল্লাহ মানুষকে সম্প্রতি করাচেন, যেহেতু তিনি প্রভু, অধিপতি, সত্যিকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং প্রমাণপদ। তাই তিনি তাকে সদুপদেশ দিচ্ছেন। কুম্ভকৃণিগানাতা যেই হেক না কেন, তার বান্দা হিসেবে তাকে জীবিকার ক্ষেত্রে, সংকর পরিচলনা ও ভালবাসার সকল ক্ষেত্রে মানুষের প্রভু, মানুষের অধিপতি এবং মানুষের খোদা হিসেবে সকল কুম্ভকৃণা দিয়ে পশ্চাদপসরণকারীর কুম্ভকৃণা থেকে রক্ষা পাবার জন্য সেই কামেল ও পরিত্য সত্তার আশ্রয় চাওয়া উচিত।

গত চারদিনে আপনারা বিভিন্ন প্রকৃতির কয়েকটি বক্তৃতা অনেকে এর কয়েকটির ভিত্তি সত্য ও সত্বার উপর। আর কোন কোনটি হবে মিথ্যা, ধোকাও প্রহরিতায় ভব। সুতরাং আপনাদেরকে কুরআনের এ হিতের দেশের আলোকে কেন কুম্ভকৃণিগানাতার আলোচনা বা বাহিক চারিচিকা দেখে যে প্রাক্ত ও সদাহ জন্য নিতে পারে এর বিরুদ্ধে মানবজাতির প্রভু, মানবজাতির অধিপতি এবং মানুষের খোদার কাছে সত্যিকার চাওয়া উচিত। এখন সদাহ ও কুসংসার একটি ক্লাস কুকুরের ন্যায যে কামডানার জন্য সদা বলে। দৃষ্টান্ত বুঝে, কোন প্রাঙ্গণের সম্পূর্ণ থেকে আত্মক্ষেপ জন্য আমাদেরকে পশ্চাৎ প্রভু কাছে সাহায্য চাইতে হয়। কেননা প্রভু যদি আমাদের নিরাপত্তার ইচ্ছা রাখেন আর সে প্রাঙ্গণে কেন্দ্রভাবে শাসন করেন তাহলে সে করা ক্ষতি করার ধূতীতা দেখাবে না।

একইভাবে শয়তানের সূত্র সদাহ থেকে মানুষের নিরাপত্তাও সে সত্তার কাছে আশ্রয় চাওয়ার সাথে সম্পর্কিত যিনি সমগ্র সৃষ্টির প্রতিপালনকারী, অধিপতি এবং সত্যিকারের প্রমাণপদ।"}

যারা ধর্মের তুলনামূলক অধ্যয়নে আত্মহী তদারকে 'ইসলামিম নীতি দর্শন' গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে এবং এটি একটি প্রশ্ন রচনা।

১১২
১৮৯৭ সালে আদুল হামিদ নামের এক যুবক কাদিয়ান আসে এবং মৌলভী নূরউদ্দিনের সাথে সাক্ষাত নিজেকে বিলাম নিবাসী মৌলভী বোরহানউদ্দিন সাহেরের আহত হিসেবে পরিয়ে দেয়, যিনি আহমদাবাদ জামাতের অধীন সমান্তরাল এক সদস্য। তাকে সাদর অভিযোগ জানানো হয় এবং উপেক্ষা আত্মহত্যা প্রদান করা হয়। সে বললো, সে হযরত মসীহু মাওদুদ (আঃ)-এর সত্ত্বায় বিশ্বাসী এবং বয়স্ত করতে আগ্রহী। কিন্তু হযরত মসীহু মাওদুদ (আঃ) অনুভব করলেন, তার মধ্যে আত্মহত্যার ঘটিত আছে তাই তিনি তার বয়স্ত এগুলি করেন নি। যে ব্যক্তি অসংখ্য হযরত মসীহু মাওদুদ (আঃ)-এর বিদ্যালয়ে আসলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর সামনে এ বিবৃতি দেয়ার জন্য সমর্থ করে যে মিয়া গোলাম আহমদ ডাঃ মাওদুদ ক্লাসের তার আজমে একটি পাঠ্য ফেলে খুন করার জন্য অস্থির পাঠিয়েছেন। অমৃতসরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদুল হামিদের হলপিয়া যুক্তি ব্যবহার নেয়ার জন্য ওরকানপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কাপ্তান ফুলাহনের কাছে পাঠান। তিনি বিবৃতি রেকর্ড করার জন্য উভয় পক্ষের সাক্ষীদের ১০ই আগষ্ট বালার হাজির হবার নির্দেশ দেন যাদের একজন ছিলেন মৌলভী নুরউদ্দিন। তিনি অতি সরল এবং অকপটভাবে বিবৃতি প্রদান করলেন। এটি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে অভিযোগ করে। তিনি সম্মানিত ব্যক্তির করুণার্থ চেহারায় দেখেও গভীরভাবে প্রভাবিত হন এবং সাক্ষীদের চেয়ে যাবার পর রিফারেন্স বলেন: "যদি এ ব্যক্তি প্রতিষ্ঠিত মসীহু মাওদুদ দাবী করেন তাহলে তাঁর দাবী আমাকে একান্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।"

একই দিন বালার মৌলভী মোহাম্মদ হোসেনের সাক্ষী গৃহীত হয়। হযরত মসীহু মাওদুদ (আঃ)-এর প্রতি তার ভয়াবহ শক্তি সর্বজনবিপিন বিষয়। জেলার সময় মরিয়া হয়ে প্রকাশ্য মিঠা বিবৃতির উপর জেলার দেয়া, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে তার বিচারে এমন একটি নেট লিখতে বাধ্য করেছে তার সাক্ষীকে অগ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত করেছে। আদালত কক্ষের বাইরে গিয়ে সে যার কাছেই গেছে সে তাকে ঘৃঢ় সাথে বর্ণন করেছে এমন কি সে বসার জন্য কোন জায়গা পায় নি। মৌলভী নূরউদ্দিন তার চল্লিশ বছর দেখে তার প্রতি করণ করলেন এবং তার কাছে গিয়ে বাহ ধরে বললেন, "মৌলভী সাহেব আপনি আমার আমাদের সাথে বসুন।"
হযরত মৌলিকী নুরউদ্দীন (রা.) - খলিফাতুল্ল মসীহ আউয়াল

পরবর্তী এক চন্দ্রনী কালে আবদুল হামিদ (ভাবাবেগ) ভেঙে পড়ে এবং সীকার করে, তার পূর্বের বিবর্তি মিথ্যা ছিল যা সে ডাঁ কোল্ড এবং তার কিছু সদ্য-সাধুর প্রচেষ্টা দিয়েছে। হযরত মসীহ মাওউদ সসমানে মামলা থেকে মুক্তি পান, যদিও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাকে মিথ্যা ও প্রতিহিংসামূলক হযরাতনির দায়ে বাদি পক্ষের প্রধান ন্যাশনাল বিরুদ্ধে মামলার অনুমোদন প্রদান করেন। কিন্তু হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এ মুখ্যের কাজে লাগাতে অসমর্থ জাহানপূর্ব বলেন, “আমার মামলা আমার করা আছে। বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে মামলা লড়ে এ পরিবর্ত জগতের বিচারকাদের সামনে সময় নষ্ট করার আমার কোন ইচ্ছা নেই।”

কাপ্তান ডেলালের চাকরী থেকে অবসর গ্রহণের প্রায় সিকি শতাব্দীকাল অতিবাহিত হবার পর যখন তিনি লড়েন বসবাস করছিলেন, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) সম্পর্কে তার ব্যক্তিগত ধারণা জানার জন্য গ্রহাকার তার সাথে দেখা করতে যান। তখনও তার সুখ এবং সুন্দর ভারসাম্য বজায় ছিল। দুজনের দীর্ঘ আলোচনা হয়। তিনি যা বলেছেন এর সারাংশ হলো: “যে মুহারে মিশ্র সাহেব আমার আদালেত কর প্রবন্ধ করলেন তখন আমি তার দিকে তাকালাম এবং বুঝলাম যে ইনি এ জগতের মানুষ নন। তার আজ্ঞা খেলার সত্যা একাকার বলে মনে হলো। যদিও তিনি একটি ভালোক অপরাধে অভিযুক্ত ছিলেন কিন্তু আমার কাছে পরিবর্ত্তি হয়ে গেল যে তিনি এমন কোন কাজ করতে পারেন না। আমি তাকে একটি চেয়ার দিলাম এবং মুখে বসতে বললাম। আমি তাঁর মহত্ত্ব ও মহানুভূতিতে মূল্য ছিলাম। তাঁর নবুওয়াতের দায়িত্ব সংক্রান্ত সম্পর্কে আমি নিষ্ক্রিয় ছিলাম আর একারণেই তখন থেকে আমি বিশ্বাস করি, যুদ্ধ (সাহাব) আল্লাহর সত্য রসূল ছিলেন।”

এখানে উল্লেখযোগ্য এ মামলায় ন্যাকারজনক ভূমিকা পালনের ক্রয়েক বছর পর আবদুল হামিদ তাঁর ভয়ে অন্যায়ের জন্য অত্যধিকভাবে অনুশোচনা করে এবং আহ্মদীয়া জামাততুর্ক হয়।

সাদউল্লাহ লুধিয়ানী, যে হিন্দু থেকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল সে মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর প্রতি চরম শক্তিতে পোষণ করতো এবং সে সত্ত্বেও তার অশলীল ভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে। সে ভাবিয়ালী করে, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) নিঃসংস্তান ইস্তেকাল করবেন অর তার প্রতিদিন জামাত তাঁর ইস্তেকালের পর নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে। তার লীলার প্রতি ভক্তির হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) ঘোষণা করেন, তার উপর ওই হয়েছে যে সাদউল্লাহ নিঃসংস্তান থাকবে। পরবর্তী
বিজ্ঞ উপদেষ্টা

বহ্রং লোতে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর ঘরে আরও সন্তান হয় কিন্তু সাদুল্লাহর শুদ্ধে একমাত্র ছেলেই থেকে যায় যে মসীহ মাওউদ এর সেই ওহী প্রাপ্তির যুগে সদা মৌনেন পদার্পণ করেছিল।

১৯০৬ সনের শেষের দিকে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) একটি বই লিখিলেন যাতে তিনি তাঁর অন্যান্য নিদর্শন ও ভবিষ্যদ্বাণীর পাশাপাশি সাদুল্লাহ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর কথাও উল্লেখ করেন এবং একথার উপর জোর দেন যে সাদুল্লাহ বা তাঁর ছেলে যার বয়স এখন ত্রিশের কাছাকাছি তাদের কাছে হবে কোন সন্তান হবে না। আহমদীয়া জামাতের একজন একাডে সুপরিচিত আইনজীবী যিনি জামাতের একজন প্রধান সদস্য ছিলেন, হযরত মসীহ মাওউদকে এ ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করলেন এবং বললেন, তাঁর আশ্চর্য রয়েছে, এটিছাপা হলে সাদুল্লাহ বা তাঁর ছেলে বা তাদের উভয়ই হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা করতে পারে। প্রতাত্ত্বে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন:

"আমি আল্লাহর কথা সমূলত রাখার প্রয়োজন কাজ মনে করি। একে চাপ দেয়া পাপ ও অসত্ত্ব কাজ হবে। আল্লাহ ছাড়া কেউ আমার কোন ক্ষুতি করতে পারে না আর আল্লাহর মধ্যে সামনে আমি প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোন ক্ষুতির ভয় করি না। আমি অবশিষ্ট সকল কল্যাণ ও করণ উৎস মহিমাভর্ত খোদার দরবারে দেয়া করবো যিনি চাইলে আমাকে সকল ক্ষুতির ও অনিষ্ঠ থেকে রক্ষা করতে পারেন। এভাবে যদি আমার জন্য নির্ধারিতই থাকে আমি সম্ভব।" এরপর উচ্চস্বরে তিনি বললেন, "আমি সব্বশক্তিমান খোদার নামে শপথ করে বলতে পারি যে তিনি এই দুষ্টলোককে আমার বিরুদ্ধে জয়যুক্ত হতে দেবেন না। আর তাকে কোন শোচনীয় অবস্থায় নিপুণ করে তাঁর মৃত্যুর থেকে নিজ এ বাণ্ডার তিনি নিরাপত্তা বিধান করবেন যে তাঁর কাছে সদা নিরাপত্তার ভিক্ষা চায়।"

এটি ছনি হযরত নূরউদ্দীন দাদায়ে বললেন: "এমনই হবে, কেননা হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন: 'প্রায়শ এমন হয় যে এক এলামোলো চুল ও ধুলোমালোন চেহারার মানুষ যখন আল্লাহর নামে শপথ করে কোন কথা বলন, তিনি তাঁর কথাকে সত্য প্রমাণ করেন।'"৬৭

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) তাঁর দোয়া অব্যাহত রাখলেন। দুর্দিন দিনের মধ্যে মৌলিক নূরউদ্দীন যে হাদিসের কথা বলেছিলেন ঠিক সে হাদিসের ভাষায়

১১৫
হযরত মৌলভী নূরউদ্দিন (রা.) - খলিফাতুল মসীহ আওয়াল

এলহাম হয়। করেকাদিদের মাধ্যমে ১৯০৭ সনের তৃতীয়া জানুয়ারী সাদুর্গাহ প্রথে মারা যায়। এরফর তার ছেলে প্রায় অর্থরাজাকে জীবিত ছিল আর দূরার বিয়ে করা সত্ত্বেও তার জোরসে কোন সমাধি হয়নি। এভাবে সাদুর্গাহার বংশ নির্মূল হয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের লক্ষনীয় জায়গায় আইসরয় থাকাকালে বস্ত্র হয়। হিন্দুদের দৃষ্টিতে এ প্রশাসনিক পদক্ষেপের উদ্দেশ্য ছিল বাংলায় হিন্দুদের আধিপত্যকে দুর্লভ আর পূর্ববর্তে মুসলমানদের অবস্থানকে দৃঢ় করা। সেই কারণে তারা এর বিক্ষেপে একাধ টীক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। এর বিক্ষেপে তাদের বিক্ষোভ সরা দেশে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং ভয়নাক রুপ ধারণ করে।

বেশ কয়েকটি অংশে এটি আইন সূত্রায় জন্য মারাত্মক হয়েছে। ১৯০৭ সনের মে মাসে হযরত মসীহ মাওউড (আঃ) এই প্রতিবাদ বিক্ষেপে অংশ নেয়ার বিক্ষেপে নিজ জামাতের সদস্যদের নসীহত করে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন।

বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে কাজলের একটি জনস্বর আহবান করা হয় যাতে মৌলভী নূরউদ্দিনের উভয় রাখন। আইন সূত্রায় জন্য মারাত্মক হয়েছে। ১৯০৬ সনের ১১ই ফেব্রুয়ারী হযরত মসীহ মাওউড (আঃ)-এর উপর এই এলহাম হয়: “বাংলায় সম্পর্কে যে নিদর্শন হয়েছিল এখন তাদের সাম্যায় বিদ্ধ করা হয়।” এটি তৎক্ষণ্ঠ প্রচার করা হয় এবং তার বিতর্কিরা ব্যস-বিদ্রুপ করতে থাকে। কিন্তু ১৯১১ সনে এটি আচর্জনকভাবে তখন পুরায় হয়।

২০৬
বিষয় উপদেষ্টা

যখন দিল্লীতে রাজা ৫ম জর্জ এর রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে চলমান অনুষ্ঠানে রাজসভা প্রতাপাঙ্কারের ঘোষণা দেয়া হয়।

১৯০৭ সালে এক ব্যক্তি করেক প্রশ্ন লিখে মৌলভী নূরুদ্দিনকে পাঠান:

১. হযরত মসীহ মাওুদ (আঃ) এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অমান্যকারী কি সমান?

২. ‘আমার পরে কোন নবী নেই’ হাদিসের কি অর্থ হবে?

৩. ইসলামে যদি নবী আবিষ্কৃত হতে পারে তাহলে আরু বকর ও অন্যান্যরা কেন নবী হলেন না?

উত্তরে তিনি লিখে পাঠান:

১. পরিভাষার কুরআন বলে, “নবীদের কতককে আমরা কতককের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছি” (২৪২৫৪)।

যদি রসূলরা সমান পদমর্যাদার সম্পর্ক না হয় যাকেন তাহলে যারা রসূলদের মানে না তাদের পদমর্যাদাও সেভাবে সমান হতে পারে না যেমনটি আপনি মনে করেন। আপনি হযরত অনুধাবন করতে পারবেন, যে ব্যক্তি খাতামুল আখ্যায় মসীহকে বিষ্ণু করে না সে মূসারী মসীহর অমান্যকারীর তুলনায় বড় অপরাধী।

পরিভাষার কুরআন বলে, বিশ্বাসীরা বিশ্বাসের বিষয়ে এক রসূলের সাথে অন্য রসূলের কোন পার্থক্য করেন না (২৪২৮৬)। আপনি শরীয়তিধারী ও শরীয়তবিহীন নবীর অমান্যকারীদের মাঝে পার্থক্য করতে চাইছেন। কিন্তু এ পার্থক্যের কারণ আমার বোধজ্ঞ নয়।

যে মুসল্লির ভিত্তিতে আমরা কুরআন শরীফকে মানার প্রেরণা পেয়েছি একই মুসল্লির আলাদাকে আমরা প্রতিশ্রুত মসীহকে মানার প্রেরণা পেয়েছি। এ মুসল্লিকে প্রত্যাখ্যান করা পারা ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করার নামাত্র। এ আয়াত নিয়ে চিন্তা কর: “যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল, ‘আলালাহ যা নামেল করেছেন তাদের এর উপর ইমান আন, তারা বলে আমরা এর উপর ইমান আনব যা আমাদের প্রতি নামেল করা হয়েছে এবং তারা বলে, যা এর পর নামেল করা হয়েছে তারা তা প্রত্যাখ্যান করে অথচ তাদের কাছে যা আছে এর সত্যায়ন করে এটি সত্য প্রমাণিত হয়েছে” (২৪৯২) প্রশ্ন হলো, একই ধরনের মুসল্লির উভয় ক্ষেত্রে ফলাফল সমান হবে না কেন?

১১৭
হযরত মৌলভী নূরউদ্দিন (রা.) - খলিফাতুন্ন মসীহ আুরুলাওয়াল

২. আগত মসীহকে হযরত মুহাম্মদ (সাও) আল্লাহর নবী আখ্যা দিয়েছেন।
হযরত মসীহ মাওউদ (আঙে)-এর উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ছবি হয়েছে তাতেও তাকে একইভাবে সমীক্ষণ করা হয়েছে।

সাধারণ ও বিশেষের মধ্যে হাদীসটি একটি পার্থক্য করে। নিম্নলিখিত কথা কলামে বিবেচনা করুন যা সাধারণের দৃষ্টিতে কিন্তু বিশেষকে বাদ দেয় না। যার মধ্যে সত্যতার অভাব আছে তার ভিতর সমানের অভাব আছে আর যে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তার কোন ধর্ম নেই। ফাতিহা ছাড়া নামায হয় না, আর ওলীর মতামত ছাড়া বিয়ে হয় না, আর দুর্ব্যক ছাড়া কাউকে ঈর্ষা করা যায়।

এরপর পবিত্র কুরআনে হযরত মুহাম্মদ (সাও)-কে খাতমান নবীর্নন (নবীর মহুর) আখ্যা দেয়া হয়েছে। খাতেমুন নবীর্নন (নবীর শেষ) নয়। 
কুরআন বলে, ইহুদির নবীর হত্যা করতো। এর অর্থ কি সব নবী, না কতক নবী?

৩. হযরত আবু বকরকে আল্লাহ নবী আখ্যায়িত করেন নি কিন্তু প্রতিশ্রুত মসীহকে নবী আখ্যা দিয়েছেন?

লা হোরে আরচ্ছন্না শাখা ২রা, ৩রা ও ৪রা দিনের একটি আন্তঃধর্মীয় সম্মেলনের ব্যবস্থা করে যাতে ঐশ্বর্য এই শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠ হবে যদি কথা ছিল। হযরত মসীহ মাওউদ (আঙে)-কে একটি প্রবন্ধ লেখার অনুরোধ করা হয়। আরচ্ছন্না উপরের সম্পর্কে অবহিত থাকার কারণে হযরত মসীহ মাওউদ (আঙে)-এর কিছুটা সংশ্লেষ ছিল। কিন্তু ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে নিচুতা দেয়া হয়, সব ধর্মের প্রতিনিধিদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হবে। এর কিছু বলা হবে না যা কারা ধর্মীয় অনুভূতিতে আসার হানার কারণ হতে পারে। তিনি একটি প্রবন্ধ লিখতে সমর্থ হন। তার দিনের সকাল ৬টা থেকে ১০টা পর্যন্ত তার প্রবন্ধ সে সভায় পাঠ করা হয়। প্রথম অংশ পড়েন 
মৌলভী নূরউদ্দিন আর দ্বিতীয় অংশ পাঠ করেন বাক্যার মির্নী ইয়ায়াকুব বেই।

প্রবন্ধের শেষ প্রাতে হযরত মসীহ মাওউদ (আঙে) তার প্রতি কৃত করেকটি আরবী এলহাম উপেক্ষ করেন। মৌলভী সাহেবকে এগুলোর উপর অনুবাদ করার অনুরোধ করা হয়। নিজ শুরুর প্রতি যে গাত্র প্রশ্না এবং সম্মান পোষণ করতেন এর ভিত্তিতে তিনি বলেন “বেহেতু এলহামপ্রদ ব্যক্তি এসকল এলহামের অর্থ করেন নি তাই আমি মনে করি, এর অনুবাদ করা আমার কাজ নয় কিন্তু বেহেতু শ্রোতারা মনে করেন যে আমি যদি এর অনুবাদ উপাদান করি তাহলে তার

১১৮
হবে। আমি এ স্পষ্ট ধারণার ভিত্তিতে তা করতে যাচ্ছি যে আমার অনুবাদ এন্ডহাম সম্পর্কে আমার একাড় ব্যক্তিগত মতামত হবে। এন্ডহামগ্রা ব্যক্তি তার সাথে একমত নাও হতে পারেন। তিনি নিজেই এর সঠিক অর্থ করতে পারেন।”

আর্য সমাজের প্রতিনিধি ৪ঠা ডিসেম্বর তার প্রবন্ধ পাঠ করে যাতে সে নিলজ্ঞভাবে ইসলাম এবং ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতকে গালি দেয়। এটি একটি নিহিত ও নিদর্শন কাজ ছিল যা শুধু মুসলমানদেরকেই ক্ষুদ্র করে নি যা একে স্বীকার করে নি কিন্তু প্রবন্ধের যথাযথ পূর্বে জানতেন তাহলে পাঠার অনুমতি দিতেন না। কিন্তু প্রবন্ধ যখন পাঠিত হচ্ছিল তখন তিনি উপহারপ্রক্রিয়া ভর্তনা বা বাধা দেয়ার কোন চেষ্টা করেন নি। এর ফলে অপকর্ম সম্পাদন করা হয়।

কাদিয়ানের প্রতিনিধি দল যখন ফিরে আসে আর মসিহ মাওদ (আঃ)কে জলন্তর কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করা হয় তখন তাঁর অস্পষ্ট ছিল চরমে। তিনি জামাতের প্রতিনিধি দলকে আর্য বক্তার প্রবন্ধের দুরবস্থার বুঝা মাত্র তৎক্ষণাত সত্য পরিপাত না করার কারণে বারংবার এবং কঠিনভাবে ভর্তনা করেন। তিনি তাদেরকে প্রবর্তিত কুরআনের শিক্ষার কথা সম্পর্কে কারণে: তিনি তাঁর পবিত্র গ্রন্থে আপনাদের উপর একটি দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন, “যখন তোমরা আল্লাহর নিদর্শনালীকে অধ্যাকার ও হাসিলার লক্ষ্যে পরিণত করতে শুন তোমরা তাদের সাথে বসবে না যতক্ষণ তোমরা অন্য আলোচনায় রাখ না হয় নতুন তোমরাও তাদের মোট গণ্য হবে” (৪৫৪১)।

তাদের পক্ষ থেকে একাউন্ট অনুসারী বিনয়ের পরই তাঁর কেন্দ্র কিছুটা প্রশমিত হয় এবং তিনি তাদের মারাত্মক প্রকৃতি ক্ষমা করেন। একইসাথে চরম কাঠামো ও কেন্দ্রোন্নীতির মূখে তাদের প্রশাসনীর ধর্মার্থের জন্য তিনি তাদের সাধারণ জানান। পরবর্তীতে তিনি লিখেন, “যদি পবিত্রচেতা মুসলমানদের তাদের সাংস্কৃতিক রীতি-নীতিকে সম্রার না রাখতে আর প্রচেষ্টা রাঙ্গর মুহূর্তে কুরআনের শিক্ষানুসারে নিজেদের কেন্দ্রকে দমন না করতে তাহলে নিঃসন্দেহে দুঃখ প্রকৃতির লোকেরা বেজাবে উত্তেজিত করেছে এর কারণে খুনাধরীর মাধ্যমে সত্য শেষ হতে। আমার জামাতের যোগ সমন্বয় এ সভায় উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সহস্র সাধুবাদের যোগ্য। কেননা তারা সৈয়দ ও আত্মসংরক্ষণের অতি উদ্ভেদ দৃঢ়তার সাহস

১১৯
হযরত মৌলিকী নুরউদ্দিন (রা.) - খলীফাতুল মসীহ আউয়াল

করেছেন। আর্থিক আরো লাগানোর কথার বেশি দাখাল ছিল তারা এতে ধরণ করেছেন আর টু-টূ করেন নি। যদি আমি আমার জামাতকে পুনরায় নসিরহের মধ্যমে চরম নৌংলা ভাল পরে ধরণের জন্য প্রকৃত না করতাম তাহলে সমস্ত রক্তপথ বয়ে যেত। আমার শিক্ষার তাদেরকে গ্রেঝ নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি যুগিয়েছে।" 

সমস্ত শিখ পরিবারের এক যুবক সদস্য সরদার মেহেরে সং মুসলমান হয়ে যান এবং আহমদীন্ত গ্রহণ করেন। তার পরিবার তাকে তাজায় করে এবং বিশেষ করে। মৌলিকী নুরউদ্দিন তাকে পড়ালেখায় শাস্ত্রী করেন এবং তার দেখানোর দায়িত্ব পালন করেন। গোড়েতেই তিনি নিষ্ঠা, উৎসাহ-উদ্দেশন ও আত্মবিশ্বাস যাকার রাখেন আর মৌলিকী সাহেব তাঁর ব্রতী একাদশ সত্র ছিলেন।

একজন ঘুষ্ঠন জমুর খলীফা নুরউদ্দিন, যিনি জমুর অবস্থানের সময় থেকে হযরত নুরউদ্দিনের ভাল বদুর ছিলেন। তিনি মেহেরের দৌহেপ্যুক্ত সম্পর্কের ব্যাপারের পর প্রারম্ভ করেন। তিনি আসুর রহমানের নাম গ্রহণ করেন। তার সমুদয় অবস্থা অবতরিত হবার পর মেহেরে পিতা-মাতা মৌলিকী সাহেবকে বললেন, ছেলে নিষ্ঠাবান এবং ধর্মীয় কিন্তু কোন আহ্মদীসঙ্কর নেই আর কোন ভবিষ্যত নেই। একটি মাদুরী, একটি জগ, একটি খাট এবং শিক্ষক হিসেবে যৎসাহমান বেতনই তার একমাত্র সরল? সে স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা কিভাবে করবে? তাঁর উপর ছিল স্বীকার: "যদি আপনাদের মেহের সৌভাগ্যবী হয় তাহলে সে একটি বল্ল ঘর তেরে দেবে আর যদি আভাগ্যবী হয় তাহলে পরিপূর্ণ ঘর খালি করে দেবে।" 

তাঁর পরামর্শে মেহেরের পিতা-মাতার বহুদিনের হয়েছে, মেহেরেও সমঝে ছিলো আর বিজে হয়ে গেলো। সকল এথে এ বিজে সুখী ও কল্যাণময় প্রমাণিত হয়েছে। দম্পতির বহু সন্তান-সত্ত্ব এর সাক্ষাৎ ঘন করে।

মৌলিকী নুরউদ্দিন এ বিষয়ে চিন্তিত থাকতেন, যারা কদিনামে এসেছে তারা জামাতের মহাসমানন্ত ও পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার সান্নিধ্য থেকে পুরোপুরি লাভবান হচ্ছে কিনা। একটি খুঁজবার তিনি এতে নাটীকো করেন: "আমার এখানে আসার উদ্দেশ্য কি? তভেতে আমার একটি সুনির্মিত ঘর অচ্ছ। এখানে সকল প্রকারের সুখোজ-সুখীর্থা ও আরাম-আঘাতের ব্যবস্থা ছিল। এখানে আমি সাদামাটা একটি কাঁচা ইন্তের ঘরে কোনো থাকি এবং সকল আরাম-আঘাতকে

১২০
বিভ উপদেষ্টা

পরিহার করেছি। কেন? কেননা আমি দেখেছি আমি রূপ, একান্ত রূপ ছিলাম।
অভাবগ্রন্থ, চরম অভাবগ্রন্থ ছিলাম। দুর্দশাগ্রন্থ, চরম দুর্দশাগ্রন্থ ছিলাম। সুতরাং
আমি আমার সকল ব্যাধির চিকিৎসার জন্য এখানে এলাম। যদি কেউ এখানে
আমাকে দেখতে আসে আর আমার দৃষ্টান্ত থেকে শিখতে চায় বা আমাদের যারা
এখানে বসতি স্থাপন করেছে তাদের দুর্বলতা সৃষ্টি করতে চায় তাহলে সে চরম
ভাবিতে নিপতিত। অসুস্থদের যে সুস্থ মনে করে যে আমাদের জীবন নিমজ্জিত,
সে তাদেরকে দেখে বিচার করে। এখানকার সকল বলুন্ত ও সম্পর্ক, এখানে
আসা ও এখান থেকে যাওয়া, এখানে বসতি স্থাপন ও জীবন-যাপন যেন 'লা
ইলাহা ইলাহার' অধীনস্থ এবং এর ব্যবহারিক চিত্র হয়। তা যদি এখানে আসার
পিছনে উদ্দেশ্য না হয় তাহলে এখানে কেন আসা? আপনি এখানে যা পাবেন
বাজীতে এর তুলনায় উত্তম খাবার ও বেশি স্বাস্থ্য রয়েছে। আপনাদের এখানে
আসা কেবল তখনই সার্থক হবে যদি সকল কাজে আল্লাহর সম্মত অর্জন
উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।"
খলীফাতুল মসীহ

১৯০৮ সালের ১৯শে মার্চ হযরত মসীহ মাওদ আলী (রা):-এর অনুমতিক্রমে হযরত নৃবুদ্ধীন (রা): 'ভাই ও বন্ধুদের কাছে নিবেদন' শিরোনামে একটি বিবৃতি লিখেন। এটা নিম্নরূপ:

"আল্লাহর নামে যিনি অযাচিত-অষীম দানকারী, বার বার দয়াকারী।

নাহমাদুহ ওয়া নুসাল্লী আলা রসুলহিল কারাম

আসুলালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকতুহু। এক রাতে আমি আমার বয়স এবং উম্মতে মুসলিমর দীর্ঘ আয়ুৰ্ব্বেদ নিয়ে ভাবছিলাম আমি জীবনবাসনের পূর্বে যা কিছু করা বাকী সে সম্পর্কে ভেবে একাংশ বিচলিত হয়ে পড়লাম। আমার চিত্রাবাহ্য নামায়ের ক্যামায় (বসা অবস্থায়) যবে দেওয়া (আয়ীয়াত) করা হয় এর প্রতিধ্বংস হলো আর মৌলানা জালালুদ্দিন রূমী তাঁর 'মসনবী'তে যে তোতার কাহিনী লিখেছেন এতে পৌঁছলো। কাহিনীটি হলো এক সাহিত্যগুলোর একটি তোতা ছিলো। একদিন সে তোতা তার মালিককে বলল, ভারতে আমার সাথে তোতাদের সাথে যদি দেখা হয় তাদের আমার সালাম জানাবেন। এর উদ্দেশ্য ছিল সে কিভাবে সাহিত্যী লাভ করতে পারে সে কৌশল অবগত হওয়া। তারা পয়গাম পাঠাল, মুক্তির পথ মূর্তির উপরে অতিক্রমের মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব।

চিত্রার এ প্রবাহ আল্লাহর তোতা অর্থাৎ খোদার পদের শহীদদের আত্মার প্রতি আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো এবং আমি কয়তাত (নামায়ে বসা অবস্থা) যে দেওয়া করা হয় তা নিয়ে ভাবলাম অর্থাৎ 'আসুলালামু আলাইকুম আয়ীয়ান নাবীয়ু ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকতুহু আসুলালামু আলাইনা ওয়া আলা ইব্রাহিমী সাহেবীন' এবং আমি আমার এই ব্যাকুল অবস্থায় খোদার সাথে একটি ব্যবসা করলাম। যেভাবে তিনি বলেছেন: 'আল্লাহ মুমিনদের নিকট থেকে তাদের প্রাণ ও সম্পদ দেওয়া করে নিয়েছেন এ প্রতিক্রিয়ার বিন্যস্তে যে তিনি তাদেরকে তাঁর সক্রিয়র জন্য প্রবিধ করবেন' (১৪১১১)। এ আয়াতে খোদা নিজেকে একজন ক্রেতা ও একজন সাহিত্যের হিসেবে উল্লেখ করেছেন। নিজেকে আল্লাহর হাতে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্ক করার পর মুমিনের স্মরণ রাখা উচিত, যেন প্রাণ ও সম্পদ খোদার অনুমোদন ছাড়া ব্যাপ না করে। এ লক্ষ্য অর্জনের মানসে আমি হযরত মুহাম্মদ মুতক্কা (সাহ):-এর প্রতি দুর্দান্ত প্রেরণের বিষয়ে অধিক মনময়ী হলাম।

১২২
খল্লিফাতুল্লাহ মসীহ

তখন আমার মনে ছিলো, আমার অনেক বন্ধু থাকা উচিত যাদের স্বত্ত্বে কোন চিহ্ন থাকা আবশ্যক, যেন আমরা অজ্ঞাতধারায় খোদার মহিমাকীর্তন ও তাকে স্মরণ করতে পারি। সকল প্রশংসা আল্লাহর। আমার সীমিত বুদ্ধি অনুসারে আমি আহমদীয়া জামাতের কতক সদস্যের সাথে বন্ধুত্ব করলাম। এটি এমন একটি জামাত যা শৃঙ্খল ও বিদ্যাতাকে চরমভাবে দৃষ্টি করে। আর আন্তরিকভাবে এ বিশ্বাস পোষণ করে, আল্লাহ বিশ্ব কোন উপাস্য নেই, মুহাম্মদ (সাৰ) তার বাদা ও রসুল, রসুলদারা (সাৰ)-এর সূন্তের উপর প্রতিষ্ঠা হওয়ার সূন্তের সূন্তে তারা অবশ্যই জামাত আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য। আর তারা সুনামের অধিকারী, দৃঢ়চিন্তা, সহনশীল এবং দোয়ায়ে বিশ্বাসী। এ সংক্ষিপ্ত পিছনে আমার উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরূপ:

1. পৃথিবীতে তারা খোদার খাতিরে আমার ঈমানের সাক্ষী হবেন, কেননা হযরত মুহাম্মদ (সাৰ) বলেছেন, যার পক্ষে পুণ্যবাদ্যের একটি জামাত তাল সাক্ষী দেয়, সে খোদার সত্নষ্টির জালাতে প্রবেশের যোগ্য বিশ্বাস হবে। আর যে তাদের দৃষ্টিতে অগ্রধাতে সে জাহানাম নিখোঁজ হবে। পৃথিবীতে খোদার খাতিরে এ সকল সাক্ষীদের সাক্ষ্যের মাধ্যমে আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তা পাবে যা তিনি পছন্দ করবেন।

2. আমাদের সংগঠনের মাধ্যমে আমরা সম্মিলিতভাবে পুণ্য ও তাকওয়া প্রসারের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে পারব আর বন্ধু ও আন্দরাহ হয়ে যাব।

3. খোদার বিশেষ কিছু দান আছে যা শুধু একবার্ষ ও সুসংহত জামাতের উপর অবিষ্কৃত হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে খোদার অনুগ্রহকে আর্কারণের উদ্দেশ্যে বন্ধুদের একটি দল গঠন করা যেতে পারে যেন খোদার আমাদের গ্রহণ সংক্ষিপ্ত হন আর আমাদেরকে ইসলাম ও মুসলমানদের নিষ্ঠাবান সেবকের পদমর্যাদা দান করবেন।

4. হযরত মুহাম্মদ (সাৰ) বলেছেন, কিয়ামত দিবসে যখন অন্য কোন আশ্রয় থাকবে না তখন সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ তাতালা আশ্রয় দান করবেন। এর মধ্যে একটি শ্রেণী হবে, দু বন্ধু যারা পরম্পরা শুধু খোদার খাতিরে তালবাদেন, শুধু তার খাতিরেই তারা মিলিত ও বিচিন্ত হন। তাই আমার ইচ্ছা হলো, আমাদের এমন একটি শ্রেণীভুক্ত হওয়া উচিত যারা আল্লাহর আর্সের হয়তায় সফলতা সন্ধান করবেন যে সম্পর্কে ইহুকাল এবং পরকালেও অভিভাবক লাভ করা সম্ভব।

5. মৌলোর উপর সাধারণ মুসলমান এবং বিশেষ করে জামাতের মধ্যে আর্বী ভাবায় দক্ষতার জন্য কোন পথ যুঝে বের করতে হবে। কেননা শুধু এর

123
মাধ্যমেই পৃথিবীর সকল অঞ্চলে বসবাসকারী মুসলমানদের মাঝে একী, সংহতি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তাছাড়া আর্বত্রী ভাষায় দক্ষতার উপরই কর্মকাণ্ড ও হাতালে বুঝা পারার সাধন করা সম্ভব। এজন্য আমাদের বিশেষভাবে চেষ্টা করা উচিত আর এ লক্ষ্যে অর্জন করার জন্য কোন উপায় খুঁজে বের করতে হবে, যেহেতু বিশ্ব ভ্রমণের ব্যবস্থা হয়েছে এরূপ মাধ্যমে।

৬. জামাতের সদস্যদের মধ্যে যেখানে ঝুঁড়া-বিবাদ ও ভূল-ভুলিকা হয় এমন তাদের মাঝে সমক্ষেত্র ও নির্ভার গড়ে তুলনা। যেহেতু আল্লাহ বলেন: তোমাদের নিজেদের মাঝে মীমাংসা কর (৮.২), এবং মীমাংসা উত্তম পদ্ধতি (৪৪১২৯)।

৭. যাচ্ছে তা কে বা কে সকল অবস্থায় তাদের নিয়ন্ত্রণ অর্জন করতে হবে।

এটি মুসলমানদের চেতনাশীলতা; বরং দুর্নীতির বিষয় হলো যারা কাদিয়ানে বসবাস করে তারা তাদের নামে রূপের উভয় প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং এ অনুলিপি পাঠিয়েছি। কিন্তু এবিষয়ে মন্ত্র ছিল যাতে মান সিয়ালকোট ও পেশাওয়ার থেকে। লাহোর থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যায়নি। অধিকন্তু আমি বিভিন্ন সবাইতে মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের কাছেও আর্বত্রী ভাষা করতে শিখা যায় আর ইসলামী মূল্যবোধ প্রসারের ক্ষেত্রে কিভাবে আংশিক সৃষ্টি করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শের জন্য লিখিয়েছি। ইসলামী শিক্ষার সমর্থনে এবং ইসলামের শুরু থেকে আর্বত্রী ভাষা প্রচার রক্ষা করেছি আর এভাবে হঠাৎ ভাল করে আদেশ ও মন্দ কর্ম থেকে বিশ্বাস রাখার দায়িত্বের কিছুটা পালন হবে। আমাদের সবথেকে কুরান সাধারণ করা যায়।

এ প্রজেক্টটি আল্লাহ হাকম', 'বদর' এবং 'তাশীয়ুল আবহানে' ছাপা হয়।

মৌলিক নূরউদ্দীন ১৪০০ কার্টি ছাপিয়েছে। এতে তিনি সংক্ষেপে এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনা করেছেন। তার ইচ্ছা ছিল একবার যদি তিনি ১৪০০ বার্ষিক মনোযোগ আকর্ষণে পারেন তাহলে হযরত মসীহ মাওউদ (আর্ঘে)-এর নিকট এ পরিকল্পনায় সফলতার জন্য দোয়া চাইবেন কিছুটা ঘটনা প্রশ্নে এ দুর্দান্ত পরিবর্তন আসে যে এর আর অনুমতি নেয়া সম্ভব হয়নি।

হযরত উমুল মুমিনীন অসুস্থ ছিলেন তাই হযরত মসীহ মাওউদ (আর্ঘে)-এর কাছে প্রস্তাব রাখবেন যে তাঁর সুচিক্রিয়তার জন্য তাঁদের হযরত লাহোরের যেতে হতে পারে। হযরত মসীহ মাওউদ (আর্ঘে)-এর কিছুটা বিধায়ন ছিল। কোনা
খৃষ্টীয় কালীয় সময়ের মধ্যে মসীহ ইলহাম হয়েছে এতে তাঁর জীবনের আসন্ন পরিসমাপ্তি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। ১৯৫৫ সনের শেষের দিকে একইভাবে তিনি জাতি হন, তাঁর জীবনের অতি অল্প সময় অর্থাৎ ওলু দু বা তিনি বছর অবশিষ্ট আছে তাই নিজ জামাতকে সাহায্য দিয়ে ওলীয়দাতা পুনর্কক খানা রাখা করেন যে তাঁর বিদায়ের পর আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে দ্বিতীয় কুদরত দ্বারা সাহায্য করান, যেভাবে মহানবী (সানা) এর ইস্তেকালের পর ঘটেছিল। উহান আল্লাহ তাআলা হযরত বাবুর্করকে মুসলমানদের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য দাঁড় করান। তিনি (রা:) চতুর্দিকের ভয়বহ বিপদ থেকে তাদের নিরাপত্তার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ নিয়েছেন। একই সাথে তিনি (রা:) জামাতের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সদর আল্লাহকে আহমদীয়র ভিত্তি রাখেন এবং মৌলভী নূরউদ্দিনকে এর প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করেন।

রওয়ানা হওয়ার পূর্বে তিনি আল্লাহর সমীপে পরিলক্ষিত সফরের জন্য দিক নির্দেশনা চেয়ে দেয়া করেন এবং সম্প্রদায়ের দোয়ার মাধ্যমে সাহায্য করার অনুমোদন করেন। তিনি তাঁর বড় মেয়ে নবাব বোবারকা রেজিমেন্টে বলেন, তাঁকে একটি বৃহত্তুল্পূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে তাই তিনি যদি দোয়ার মাধ্যমে তাঁকে সাহায্য করেন তাহলে তিনি আনন্দিত হবেন। পরবর্তী দিন তিনি জানান, তিনি আত্মীয়কে দেয়া করেছেন এবং মৌলভী নূরউদ্দিন হাতে একটি বই নিয়ে উপর তলার একটি কর্ম বসে আছেন। তিনি তাঁকে বলেছেন: এ বইতে আমার সম্পর্কে হযরত সাহেবের এলহাম রয়েছে: 'আমি আবুর্বকর'।

হযরত মসীহ মাওদ (আঃ) তাঁকে বলেন, এ স্পষ্ট তোমার আমাকে বলবে না। একই সাথে লাহোর নান্দোর প্রস্তুতি আরম্ভ করলেন। ১৯৫৮ সনের ২৭শে এপ্রিল কাফেলা রয়েছেন হওয়ায়। বাটালায় দুর্দিন যাত্রা শেষের পর ২৯শে এপ্রিল লাহোরের পৌছে হযরত মসীহ মাওদ (আঃ) নামভর্ড লেটিস্ট 'আহমদীয়া বিদিয়র'-এ খাজা কামাল উদ্দিনের ঘরে অবশাসন করেন। কিন্তু কয়েক দিন পর একই বিদিয়র-এর নিকটস্থ ঘরে অর্থাৎ সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন সাহেবের বাসায় উঠেন। লাহোরের তাঁর অবশাসন কিছুটা দীর্ঘ হওয়ার কারণে তিনি মৌলভী নূরউদ্দিনের এবং অন্য কয়েকজন বুদ্ধিজীবীকে কাফেলায় থেকে ঢেকে পাঠান।

১৭ই মে কয়েক জন গণ্যমান্য মুসলমানকে হযরত মসীহ মাওদ (আঃ)-এর সাথে মধ্যহ্র ভোজ নিম্নতা করা হয়। তিনি (আঃ) নিজ দাবীর ভিত্তি ও প্রকৃতি ব্যাখ্যা করে এ সম্পর্কে ভুল বুঝাওয়া নিরসনের লক্ষ্য তাদের উদ্দেশ্যে একটি বুদ্ধিমতী করেন। তাঁর কথা গভীর আগ্রহের সাথে শ্রবণ করা হয় এবং
হযরত মৌলিক নূরউদ্দীন (রা.) - খলীফাতুল মসীহ আউয়াল

কয়েকজন তাকে লাহেরের একটি সাধারণ জনসভায় বক্তৃতা করার প্রস্তাব দেন মেন সাধারণ মানুষ তার প্রজা থেকে উপকৃত হতে পারে। এ প্রস্তাব অনুসারে তিনি একটি বক্তৃতা লেখা আর্পণ করেন। এর নামকরণ করেছেন 'প্যাগামে সুলাহ'। এতে তিনি হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সমীক্ষার পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়।

এ সময়ের মধ্যে আলাহাদর পক্ষ থেকে একের পর এক নসরাতমূলক ওহী হতে থাকে যাতে যাতার প্রকৃতির জন্য অসাধারণ জোর দেয়া হয় কিন্তু তিনি ঠাকুর মাথায় লেখার কাজ অব্যাহত রাখেন। ২৫শে মে অপরাহ্নে তিনি তার বক্তৃতা লেখা শেষ করেন এবং সংক্ষিপ্ত ভাষণের জন্য বের হন।

হযরত তথ্য থেকে ফিরে এসে তিনি মাগরিব এশা জামাতের সাথে জমা করেন এবং এরপর যুদ্ধ পরিমাণ খাবার খান। তিনি বেখে কিছুটা ক্লাস্ট বেজ করেছিলেন তাই তাতাতাতা সরে পড়েন। প্রায় মাঝা রাতে কিছুক্ষণ পর পর তার দুবার দাঞ্ছ হয়। এর ফলে তিনি বেশ দুর্বল হয়ে পড়েন এবং পাশের ঘর থেকে মৌলিক নূরউদ্দীন'কে ডাক্তে বলেন। তিনি ডাঃ সেদীয় মুহাম্মদ হোসাইন এবং মিয়া ইয়াকবের সাহেবকে সাথে নিয়ে অনুচ্ছেদ উপস্থিত হন এবং সাড়ের ভিতর সবকিছু করেছেন কিছু কোন ফল হয়নি। তাদের মহাসামানিত রেজিয়ার আর্থিক অর্থের মাত্র অবস্থায় ঘটতে থাকে। প্রায় অর্থের অবস্থায় তিনি ফজরের নামাজ পড়েন। এরপর এমন মনে হলো তিনি অসাধারণ। কয়েকবার কীণস্বরে তাকে একথা বলতে গোল গেছে, আরো ডাঙ্গার প্রিয় আল্লাহ।

দ্বিতীয় তিনি সম্পূর্ণরূপে অচেতন হয়ে পড়েন এবং হুব দ্বৃত নিব্যাস নিতে থাকেন আর দ্বিতীয় এলিশিমিনিতে তার স্বাস-প্রশাসন বন্ধ হয় যায়। তার পবিত্র মরদেহ কাদিয়ানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তার ২৭শে মে সকাল ৮টায় গুঁড়ে।

তার বাপান বাংলায় তা রাখা হয়। সেখানে দিনের বেশিরভাগ সময় দূর ও নিকট থেকে আঘাত নিরক্ষর প্রাণ অনুসারীরা যেখান থাকেন তার মান নিজ প্রিয় ও পবিত্র নেতার চেহারা দেখার সুযোগ পান।

হযরত মসীহ মাওউদ (আহ)-এর মৃত্যু-সংবাদ জামাতের সদস্যদের জন্য নিদর্শন হদয় পিয়ালর গ্রাম ছিল। তারা হতভাগ্য ছিলেন। সেই চরম শোকের মুহৃত্তে আল্লাহ তাআলার দরবারে একটি বিনয় ও আন্তরীকতার সাথে দিকনির্দেশনার জন্য দূর্দম করতে থাকেন। এ মৃত্যুতে হয়ত সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছেন মৌলিক নূরউদ্দীন যিনি বাংলার এ অসামান্য ক্ষতি সম্পর্কে নিজ
খলীফাতুল মসীহ

আবেগ এভাবে ব্যক্ত করেন: হযরত সাহেবের মৃত্যুর পর বিষ্ণু যেন প্রাণহীন।
এখন কি করবে, কেোহায় যাবে?

সদর আল্হুমানের সদস্যরা সহ জমাতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগত হযরত মসীহ
মাওদ (আ)-এর জমাত নবী মসীহদাদ আলী খান সাহেবের ঘরে একটি হন
আর একই সাথে মূল জমাত সকল দিক থেকে কাদিয়ানে এসে বাগানে যে ঘরে
সমানিত নেতার মরদেহ রাখা হয়েছিল এর পাশের ঘরে বসে পরবর্তী
pদক্ষেপের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। আগত লোকদের কে খাজা
কামালউদ্দীন সাহেব একাং মরম্মপরী তাত্ত্বিক এভাবে সমীক্ষণ করেন: “এক
ব্যক্তি পৃথিবীতে খোদার সৃষ্টি হিসেবে এসে মানুষকে তাঁর নাম ডেকেছেন।
আমারা তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছি এবং তাঁর চতুর্দশে একটি হয়েছি। এখন তিনি
আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাঁর প্রভুর কাছে প্রত্যাবর্তন করেছেন। এখন
পরিস্থিতিতে আমাদের কি করবী়া?

শ্রোতারা হতবিবল ছিলেন। সেখানে ছিল পইনফতন নীরবতা। কয়েক মুহূর্ত
পর সদর আল্হুমানে আহমদীয়ার এক সদস্য শেখ রহমতুল্লাহ সাহেব দাড়ান এবং
আবেগপ্রসূত কঠিন বলেন, “লাহোর থেকে কাদিয়ান আসার পথে আমি নিজেকে
বারবার সমাধিক করেছি আর এখন আপনাদের উদেশ্যে বলছি, আমাদের
সকলকে এখন আমাদের সমানিত বুঝতে (হযরত নুরউদ্দীন) বলা উচিত,
আপনি আমাদের নেতৃত্ব দিন। তিনি ছাড়া আমরা হারিয়ে যাবো।” এতে কেউ
আপত্তি করেনি আর মন হলো, উপস্থিত সকলে তাঁর প্রস্তাবকে স্বগত
জানিয়েছেন। তাদের মাঝে হযরত সাহেব মিয়া বাহিলীন মাহমুদ
আহমদ সাহেব ছিলেন। তারকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় তিনি তৎক্ষণাৎ তা গ্রহণে
সমান প্রকাশ করেন। হযরত মসীহু মাওদ (আ)-এর শ্রুতি মীর নবী নাসের
সাহেব যিনি বাগানে ছিলেন তিনি সমস্ত হন। তখন খাজা কামাল উদ্দীনকে
হযরত উম্মু মুমিনীনের মতামত জানার জন্য তাঁর কাছে যাওয়ার অনুরোধ করা
হয়। তিনি বললেন, মৌল্লী নুরউদ্দীন সাহেব জমাতের সবচেয়ে সমানিত ব্যক্তি।
তাঁরই খলিফা হওয়া উচিত।

সেই মৌলাবেক একটি সংক্ষিপ্ত বিবর্তি লেখা হয় আর উপস্থিত সকলকে তা
নিয়ে মৌল্লী সাহেবের কাছে যান এবং তাঁর কাছে উপস্থাপন করেন। তিনি
নীরবে তা গ্রহণ করেন এবং বলেন, তিনি দিকনির্দেশনার জন্য দেয়া করবেন
এবং এরপর উত্তর দেবেন। তিনি ওয়ু করে নামাজের জন্য দাড়ান। নামাজ শেষ
করে তিনি বলেন: চলুন সবাই সেখানে যাই যেখানে আমাদের প্রভুর পবিত্র

১২৭
হরত মৌলভী নূরউদ্দীন (রা.) - খলীফাতুল মসীহ আউয়াল

মরদেহ রাখা আছে আর খেলায় আমাদের ভাইয়েরা অপেক্ষাম। বাগানে এসে হরত মুফতী মোহাম্মদ সাদেক সাহেবের সকলের অনুরোধে নিম্ন লিখিত অনুরোধ নামা পড়ে গুনান।

"বিস্মিল্লাহি রহমানির রহিম। নাহ্মাদু ওয়া নুসাহি আলা রসূলিহিল কারীম।"

আলহামদু লিল্লাহে রক্বিল আলামীন ওয়াস্রালাতু ওয়াস্রালামু। আলা খাতামান নাবিরীন মুহাম্মাদানীল মুন্তাকা ওয়া আলা মসীহি মাওউদ ওয়া খাতামিল আওলিয়া।

"আলু ওসীয়াতে উল্লিখিত হরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর নির্দেশ মোতাবেক আমরা নিম্ন সালমীরি আহমদীরা আত্মরক্ষারে বিশ্বাস রাখি, আহমদীয়া জামাতের সকল বর্তমান এবং অবিষ্ক সদস্যদের, প্রথম হইন্দতরকারী হরত হাকিম নূরউদ্দীনের হতে আহমদের নামে বয়াত করা উচিত যিনি আমাদের মাঝে সবচেয়ে বড়ো আলেম এবং সবচেয়ে বড়ো মুহাম্মদী, যিনি হরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর প্রতি সবচেয়ে নির্বিশেষ প্রাণ এবং সবচেয়ে বয়স্ক ও প্রীতি বলে ছিলেন যিনি তাকে উত্তম আদর্শ আখ্যা ঘৃতে এবং বলেছেন:

"যদি উমমের প্রত্যেক সদস্য নূরউদ্দীন হতে যেতে তাহলে কতই না উত্তম হতো।"

'যদি প্রত্যেক সদস্য সুন্নিচিত ঈমানের জেহাতিতে ভরে যেতে তাহলে কতে ভাল হতো।'

যেভাবে হরত মসীহ মাওউদ ও মাহদী (আঃ)-এর নির্দেশ মায়া করা আমাদের জন্য আবশ্যক ছিল একইভাবে হরত মৌলভী নূরউদ্দীনের নির্দেশ মায়া করাও আমাদের জন্য আবশ্যক।"**

প্রত্যেকের হরত মৌলভী নূরউদ্দীন বলেন, আমার অতীত জীবনের প্রতি তাকাও। আমি কোন দিন নেতৃত্বের লেভ দেখাইনি। আমি নিজেকে ভালভাবে জানি আর আমার প্রভু আরও তাল জানেন। আমি এ জগতের কোন কিছুর প্রতি লেভ রাখি না। আমার একমাত্র চাওয়া পাওয়া হলো আমার প্রভুর সতত্ত্ব।

এজন্য আমি দোয়া করি, একারণেই আমি কাদিয়ানে বসতি স্থাপন করি আমার বসবাস করতে থাকব। আমি কিছুদিন থেকে চিরত করলি যে হরত সাহেবের পর আমাদের কী অবস্থা হবে। সে কারণেই আমি মিয়া মাহমুদের শিক্ষককে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আগ্রহ চেষ্টা করলি হলি।
হযরত মসীহ মাওউদ (আহ)-এর নিকটাভিত্তিতে মধ্যে সহায়তা তিনিন্দন রয়েছেন। একজন হলেন মিয়া মহম্মদ যিনি যুগল আমার ভাই এবং পুত্র। তাঁর সাথে আমার একটি বিশ্বেষ সম্পর্কে আছে। মীর নাতের নবাব যিনি হযরত মসীহ মাওউদ (আহ)-এর শুন্য হিসেবে তাঁর দৃষ্টিতেও সমান্তর ছিলেন আর আমাদের দৃষ্টিতেও। আর তৃতীয় ব্যক্তি হলেন তাঁর জামাতা নবাব মোহাম্মদ আলী খান সাহেব। নিবেদিত প্রাণ বিশ্বাসীদের মধ্যে হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ আহসান সাহেব রয়েছেন যার মোগ্যতা অসাধারণ। তিনি হযরত মুহাম্মদ (সাহ)-এর অধিনস্ত। তিনি ধর্মের এমন সেবা করেছেন যা আমার মত মানুষকেও লজ্জায় ফেলে দেয়। বুদ্ধ বয়সে তিনি হযরত সাহেবের সমধিন্তে কয়েকটি বই লিখেছেন।

আর এটি একটি অন্য অবদান। আবার মৌলিক মোহাম্মদ আলী রয়েছেন যিনি এমনভাবে চিন্তম করেন যা আমি ভাবতেও পারি না। তারা সকলেই কাদিয়ানে আছেন। বহিরাগতদের ভিতর মৌলিক সৈয়দ হামেদ শাহ, মৌলিক গোলাম হাসান খাঁ সাহেব এবং অন্যান্যরা রয়েছেন।

এটি একটি ওড়া ও বিপজ্জনক দায়িত্ব যা খুব খোদা-প্রত্যাদিত্ত্ব ব্যক্তিই পালন করতে পারেন যার সাথে ঐশ্বরিক সমর্থনের প্রতিশ্রুতি থাকে, যা তাকে কেমন ভাবা বোঝার মূলে শক্তি যুগান্তে থাকে। এ মুহুর্তে পুরুষ মহিলাদের একতাবদ্ধ হওয়া উচিত। এলক্ষে আপনারা, আমি যে সকল সমান্তর ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখ করেছি তাদের যেকানন একজনের হাতে বয়াসাত করেন আর আমিও আপনাদের সাথে বয়াসাত করব। আমি দুর্বল, আমার স্বাধ্যায় এবং ভাল থাকে না, আমার মনমানসিকতা এমন কাজের জন্য অনুকূল নয় যা ভারী এবং যা করা কষ্টসাধ্য।

হযরত সাহেব চারটি কাজ করেছেন। (ক) একটি হলো আলাউদ্দিন দাস হিসেবে আবশ্যকীয় ব্যক্তিত্ব দায়িত্ব পালন। (খ) পরিবারের দেখাশোনা করা। (গ) আভিধেয়তা। (ঘ) ইসলামের তবলীগ যা তাঁর প্রধান দায়িত্ব ছিল। এগুলোর মধ্যে প্রথমটি তিনি (আহ) সাথে নিয়ে গেছেন, তিনি এখানে যেভাবে পালন করেছেন পর্যাকলেও একইভাবে করবেন। এবিষয়ে আপনারা নিষিদ্ধ থাকতে পারেন। বাকি তিনটির মধ্যে ইসলামের তবলীগ সরবরাহ উচ্চতাপ ও কাঠি কাজ। নান্দীয়নাহ্বাদ ইসলাম অত্যন্ত হলো এবং দলালদলির শিকার। আলীছাও তাআলা আমাদের জামাতকে এসব ভেদাভেদ দুরীভূত করার জন্য নিয়োজ করেছেন। আপনারা হযরত একজন মনে করতে পারেন কিন্তু যাকে এ দায়িত্ব পালন করতে হবে তার জন্য একজন অভিব্যক্ত করিতেন। আমি আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমি যাদের নাম উল্লেখ করেছি তাদের যেকানন একজনকে আপনারা নির্বাচন করুন। আমি আপনাদের সাথে তাঁর হাতে বয়াসাত করব।

১২৯
হযরত মৌলভী নূরউদ্দিন (রা.) - খলীফাতুল মসীহু আউয়াল

কিন্তু যদি আপনারা আমার হাতে বয়ানাত করার উপরই জোর দেন তাহলে সমর্পন রাখতে হবে, বয়ানাতের অর্থ হলো সম্পূর্ণ আনুগত্য। একবার হযরত সাহেব আমাকে ইসুটে বলেছিলেন, আমি যেন আর আমার ঘোরের কথা চিন্তা না করি। তখন থেকে আমার সকল সমান ও চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন তিনি। আর আমি কখনো ঘোরের কথা ভাবিনি। তাই বয়ানাতে একটি অপত্ত ওরুত্তরধূর্ণ বিষয়। যে বয়ানাতের অস্পষ্ট করে সে তার সকল যাদুংহানি ও কামনা-বাসনা অনেকের ইচ্ছার সামনে জলাংলি দেয়। সে কারণে আল্লাহ তাআলা মানুষেকে তাহ দাস আখ্যা দিয়েছেন। দাস হিসেবে বেঝানে বাপ্পিত দায়িত্ব পালন করাও করিন বিষয় সেখানে এক ব্যক্তি অন্যের পক্ষে এ দায়িত্ব কিভাবে এবং কতটা পালন করতে পারে? মানুষের আত্মাও এ বিদ্রোহকে সামনে রেখে এদু প্রতিদৃষ্টার জন্য দুঃখ প্রত্যাশের প্রয়োজন। আমি হযরত সাহেবের কাজের প্রতি সদা আশ্চর্যের দৃষ্টিতে দেখি। তাব যাত্রাও তেমন ভাল ছিল না। এসেছে অগভিন বহুদূরি কাজের অনেক ভালো বেঝাব হয়েছেন। কিন্তু তাব সাথে সবসময় ঐশ্ব সাহায্য ছিল। আমি প্রায় তাব সমর্ভাবি কিন্তু নিজেকে শুনু হস্তে দেখেছি। এটি ঐশ্ব অনুগ্রহ যে তিনি আমাদের ভাগ্যবর্ধনে আবদ্ধ করেছেন। তাব রহমত ছাড়া কোন কিন্তু আর্জন করা সহ্য নয়।

আমি ইসলামের ইতিহাসের একটি হযরত যুগের প্রতি আনন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। হযরত আবু বকরের মুখে মক্কা-মদিনা ও দুই একটি জায়গা ছাড়া আছে গোটা আরব বিদ্রোহ করে বলেছিল। মক্কাসীরাও প্রায় বিদ্রোহ করতে যাচ্ছিল। কিন্তু তিনি তাদেরকে এ নসীহতের মাধ্যমে একবার করেন, তোমাদের সবার শেখে বিশ্বাস করু কেন সবাইগি ফিরে যেতে চাও? হযরত আয়েশার বলেন, আমার পিতার উপর যে পাহাড় ভেঙ্গে পড়েছিল তা যদি অন্য কারো উপর প্রভাব হতো তাহলে সে দুঃখিত হয়ে যেতো। মদিনার প্রায় ২০,০০০ সুস্থ-সুবল ও সক্রিয় মানব ছিল কিন্তু যেহুদ হয়ুর (সাহ) উত্তরাধিকারে তাদের প্রবন্ধ করতে চেয়েছেন তাই সেই মোতাবেক হযরত আবু বকর (রা) তাদের পাঠিয়ে দেন। সে ভয়াবহ পরিসীমায় সবশেষ খোদা নিজ শক্তি প্রদর্শন করেন এবং যীশু প্রতিষ্ঠিত-"তিনি তাদের জন্য যে ধর্মকে বেঁচে নিয়েছেন সে ধর্মকে সুখিত দৃঢ়তা দান করবেন।" (২৪:৫৬) রক্ষা করেন। আজকে আমরা একই অবস্থার সমুজ্জীবন। আমি চাই, মসীহু মাওউদ (আহ)-এর মরদেহ দ্বারা পুরুষে আমাদের মাঝে একক প্রতিষ্ঠিত হক।

মহাবনী (সাহ)-এর তিরোধানের পর হয়ুর (সাহ)-এর সাহাবারা হযরত আবু বকরের দিকনির্দেশনানুসারে বেশ কয়েকটি ওরুত্তরধূর্ণ কাজ করেছেন। এর মধ্যে

১৩০
খলীফাতুল মসীহ

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল পবিত্র কুরআনকে প্রহারকারে প্রকাশ করা। আজ অনুরূপ একটি কর্ম হবে, এর উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরিকল্পনা হাতে নেয়া। এরপর হযরত আলু বক্র যাকাত সংগ্রহের বিষয়কে নিয়মাতিকে করেছেন। এটি বিরাট একটি কাজ যার জন্য অনেক বড় আনুগত্যের প্রয়োজন। আরও অনেক দায়িত্ব আছে যা পালন করতে হবে। এখন আপনাদের ব্যক্তিগত বেঁকে যে দিকে হেক না কেন আপনাদেরকে আমার নির্দেশ মেনে চলতে হবে। যদি এটি আপনারা মানতে প্রশ্ন থাকেন তাহলে বেচাছায় বা অনিচ্ছায় আমি এ দায়িত্ব গ্রহণ করবো।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বয়াআতের যে দশটি শর্ত নির্ধারণ করেছেন তা পুরোপুরি কার্যকর থাকবে। এর সাথে কুরআন শিক্ষা, যাকাত সংগ্রহ, মোবাল্লেগ প্রশিক্ষণ এবং এ ধরনের অন্যান্য প্রজেক্ট যা আল্লাহ আমার হাতে যখন সংগ্রহ করবেন তা আমি সাথে যোগ করবো এবং এর উপর জোর দেবো। ধর্মীয় শিক্ষা এবং জাহানার কেরাবর জন্য আমার পক্ষ থেকে অনুমোদনের প্রয়োজন হবে। ঘুর নেই খেদার অধিকরণ জন্য আমি এ দায়িত্বে গ্রহণ করছি যিনি বলেন, তোমাদের মাঝে এমন একটি দল থাকা বাঙ্গালী যার পুণ্যের নির্দেশ দিবে ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে (৩৪১০৫)

স্মরণ রেখো! সকল কল্যাণ একতাবদ্ধ হওয়ার পরেই নাযেল হয়। নেতা বিহীন জাতি মৃত।”

তাঁর বন্দ্যোপাধ্যায় শেখ হওয়ার সাথে সাথে দূর-দূরাত্ম থেকে আগত উপপত্তি জন্ত যাদের সংখ্যা ১২০০-র মত হবে, সমস্তের অনুরোধ করলেন: “আমরা আপনার হাতে বয়াআত করতে চাই। আমরা আপনার আদেশ মানবে সদা প্রশ্ন থাকব, আপনি আমাদের আমির এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর খলীফা। তাঁরা দিকনির্দেশনার জন্য কেঁদে-কেঁদে দোয়া করছিলেন অার হযরত মৌলিক নূরউদ্দিনের মত একজন আধ্যাতিক নেতা পেয়ে অনেক প্রশাস্তি লাভ করলেন। সকলেই খলীফাতুল মসীহ হিসেবে তাঁর হাতে বয়াআত করলেন।”

বয়াআতের ভূমি নিম্নরূপ:

১. আমি সাধ্যা দিচ্ছি যে এক আল্লাহ। তিনি ভিন্ন কোন উপাস্য নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি সাধ্যা দিচ্ছি, মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বাদা ও রসূল (তিন বার পড়ান)

২. আজ আমি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) কর্তৃক নির্ধারিত বয়াআতের সকল শর্ত শিরোধার্য করত নূরউদ্দিনের হাতে বয়াআত করছি এবং আমি
হযরত মৌলভী নূরউদ্দিন (রা.) - খলিফাতুল মসীহ আউয়ালা

বিষয়ভাবে অনুকরণ হচ্ছে যে পবিত্র কুরআন, সূনাহ ও সহীহ হাদিস ধূলি ও পড়ার এবং সে অনুসারে অনুশীলনের ব্যাপারে সচেষ্ট থাকবে। নিজেকে এবং নিজের সকলকে সাধ্য ও সম্ভব্য অনুসারে ইসলামের প্রচারের জন্য উৎসর্গ করব, যাকাত প্রদানে যত্নবান থাকব এবং ভাইদের মাঝে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার বিষয়ে সচেষ্ট থাকবে।

৩. আমি আমার প্রধ-প্রতিপালক আল্লাহর কাছে আমার সকল পাপের ক্ষমা চাইছি এবং অনুশোচনার সাথে তাঁর প্রতি বুঝাই।

৪. হে আমার প্রধ-প্রতিপালক, আমি আমার নিজ প্রাণের উপর অত্যাচার

করছি, আমি আমার পাপ স্বীকার করছি। সুতরাং তুমি আমার পাপ ক্ষমা কর

কারণ তুমি ছাড়া আর কেউ পাপ ক্ষমাকারী নেই।

উপস্থিত সবার বয়স ও সার শেষ হওয়ার পর হযরত খলিফাতুল মসীহ

আউয়ালার (রা) হযরত মসীহ মাওউদ আরোহের নামাত্বক জানায় এবং এরপর

যুত ও বার মাধ্যম পড়ান। তখন সবাই সাবধান হয়ে একে একে শেষ বারের মত

তাদের পবিত্র বিদ্যার ইমামের যিয়ার করেন। দাফন কর্ম বিরাট সম্পন্ন হয়।

ইন্ন লিয়াহাতে ওয়া ইন্ন ইলাহেহ রাজিহেন।

পরের দিন সদর আহমদারে আহমদীয়ার সদস্য-সচিব খাজা কামালউদ্দিন

নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করেন।

"হযরত মসীহ মাওউদ (আর)-এর জানায় পূর্বে কাদিয়ানে উপস্থিত

১২০০ সদস্যের সকলে আল্লাহর নামাত্বক উল্লেখিত দিকনির্দেশনা অনুসারে এবং

তদনীন্তন সদর আল্লামার আহমদীয়া কাদিয়ানের সদস্যগণ ও হযরত মসীহ

মাওউদ (আর)-এর পরিবারের সদস্যদের সম্পর্কে আর হযরত আমাজারের

অনুমতি উপস্থিত হযরত হাজি হাকিম নূরউদ্দিন (রা)কে হযরত মসীহ মাওউদ

(আর)-এর স্বল্পাগ্রিত হয়ে খলিফা হিসেবে প্রাপ্ত করেন এবং তাঁর হাতে

বয়স হাব হয়। সদর আল্লামার আহমদীয়ার উপস্থিত সদস্যগণ ছিলেন

মৌলভী সৈয়দ মোহাম্মদ আহসান, সাহেবেদা মির্যান বাশির উদ্দিন মাহমুদ

আহমদ, নবাব মোহাম্মদ আলি খান, শেখ রহমতুল্লাহ, মৌলভী মোহাম্মদ আলী,

ডাঃ মির্যান ইয়াকুব বে, মোহাম্মদ হোসাইন শাহ এবং ডাঃ খলিফা রশীদ উদ্দিন।

যদিও মুত্তা আকসমিক ছিল আর সময় ছিল সরক্ষিত এ সত্তেও আল্লাহ, জালাল, কপুরখালা, আমূতুসর, লাহোর, গুজরাতওয়ালা, উলিয়াবাদ, সিয়ালকোট, জম্মু, গুজরাত, বাটলা, গুপ্তাপুর এবং অন্যান্য স্থান থেকে অনেক মানুষের

সমাগম হয়। সর্বসম্মতভাবে তাঁরা হযরত খিলান হাকিমুল উমাহার নূরউদ্দিনকে

১৩২
খলনায়ত মসীহ

গ্রহণ করেছেন এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর নামায় জানায় অংশ নিয়েছেন। জামাতের সকল সদস্যকে জানানো যাচ্ছে যে এই টেলিগ্রাম পাওয়া মাত্র ব্যক্তিগতভাবে বা পত্রের মাধ্যমে তারা যেন হযরত মসীহ ও মাহাদীর খলিফা হযরত হাফেজুল উম্মাহার হাতে বয়ানাত করেন।

এ সংবাদ পেয়ে জামাতের সকল সদস্য অন্য সময়ের মধ্যেই সতর্কতায় প্রেরণার সাথে হযরত খলিফাতুল মসীহর হাতে বয় আত করেন এবং খুব অন্য সময়ের মধ্যে পুরো জামাত পুনরায় এক পতাকা তলে সমর্পণ করেন যায়।

এভাবে আহমদীয়তরূপী তরুণী যা ১৯ বছর পূর্বে থেকে যাত্রা আরম্ভ করেছিল সে ভাবে তুমিকে ব্যর্থ করে, যা এর উপর আক্ষরিকভাবে আঘাত হেনেছিল। পরিতাপের বিষয়ে কিছু সময় যেতে না যেতেই কানা ঝুঁকা আরম্ভ হয়। ফাটল এর প্রথম লক্ষণ দেখা দেয় এক সহায়েরও কম সময়ের মধ্যে। খলিফার নির্দেশ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর মত অনুসরনযোগ্য। কিন্তু বয়ানাতের পর ৬ঠ দিন খাজা কমাল উদ্দিন কাদিয়ান আলেম। হযরত সাহেবাদার মির্জা বর্ধন উদ্দিন মাহমুদ আহমদ সাহেবের সাথে কথা বলতে গিয়ে খুব সহজেই বলে ফেললেন, মির্জা, অসাধারণ একটি ভুল করে ফেলেছি যার সুরাহ খলিফার কর্তৃত্বের গভীর নির্ধারণের মাধ্যমে হতে পারে। তাঁর নুতন সদস্যদের কাছ থেকে বয়ানাত গ্রহণ, নামায় পড়নো এবং বিয়ে ও জানায়া ইত্যাদি পড়নো উচিত এর বেশি কিছু নয়।

এ গুণ শেষ সাহেবাদার প্রতিক্রিয়া হলো: “এমন মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে আপনি অনেক দেরি করে ফেলেছেন, বয়ার আত করার পূর্বে আপনার একথা ভাবা উচিত ছিল। খলিফা এটি স্পষ্ট করেছেন যে বয়ানাতের সাথে পুরো অনুগত আবদ্ধ আমরা এ প্রতারণার সাথেই বয়ানাত করেছি। এখন খলিফার সাথে আমাদের সম্প্রতি চাকরি ও মনিবের। মনিবের কর্তৃত্বের গভীর নির্ধারণ করার কোন অধিকার আমাদের নেই।”

খাজা সাহেব যুগ্মতে পালন, তিনি যে দিকে এগোচ্ছেন তা তাঁর নিজের বিভাগ্য। তাই এবিষয়ে তিনি আর আগ্রহ্ন হনন না।

হযরত খলনায়ত মসীহর অনুমতি নিয়ে খাজা কমাল উদ্দিন ১৯০৮ সনের ২১শে জুন করেক সহস্ত জনতার উপস্থিতিতে লাহোর বিশ্ববিদ্যালয় হতে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর সর্বশেষ লেখা 'পয়গামে সুলাহ' পড়ে শুনান। সভায় সভাপতি ছিলেন পাঞ্জাব চীফ কোর্টের বিচারপতি প্রতুল চন্দ্র চাটাজী।

১৩৩
খলীফার পদমর্যাদা

খিলাফত প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি এ ধারণাও ছাড়া হচ্ছিল যে খলীফার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে আধ্যাত্মিক কর্মগতি পর্যন্ত সীমিত আর জামাতের নিয়ম-বিধি নির্ধারণ ও প্রশাসনের দেখা-শুনার দিক থেকে সদর আঘোষনে আহমদীয়া হলো হয়রত মসীহু মাওউদ (আঃ)-এর স্থলাভিষিক্ত। সদর আঘোষনে আহমদীয়া একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান। সদর আঘোষনের নিয়মাবলীর অনুমোদন হতো খাজা কামালউদ্দিনের সুপরিশ সাপক্ষে। কোন সদস্যের মৃত্যু বা পদত্যাগের কারণে কোন পদ খালি হলে বাকী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে তা পূর্ণ হতো। ১৪ জনের ৮জন মতেকো পৌঁছানো সেটিই সংখ্যাগরিষ্ঠ পদ্ধতিতে হতো যা সমস্মা কোন ব্যক্তিকে মনোনীত করে সকল শুণাপদ পূর্ণ করতে পারতো। হয়রত মসীহু মাওউদ (আঃ)-এর ইতিহাসার সময় আঘোষন এমন একটি শ্রেণীর নিয়মের ছিল যাদের মধ্যে প্রশিদ্ধ ক্যাটারল হলেন: মৌলিক মোহাম্মদ আলী, খাজা কামাল উদ্দিন, শেখ রহমতউদ্দীন, নুরউদ্দিন হোসেন, ডাঃ মিরাজ ইয়াকুব বেগ এর শেষ চারজন লাহোরের অধিবাসী। প্রেসিডেন্ট ছিলেন মৌলিক নুরউদ্দিন। বাকী সদস্যদের কেউ কেউ হলেন, শেখ মোহাম্মদ আহমদ, সাহেবানা মিরাজ বানিয়র উদ্দিন মাহমুদ আহমদ, নবাব মোহাম্মদ আলী খান এবং খলীফা রশীদ উদ্দিন। আর খাজা কামাল উদ্দিন ছিলেন সেক্রেটারী।

হয়রত মৌলিক নুরউদ্দিন যখন খলীফাতুল মসীহ নিযুক্ত হন তখন তিনি খলীফাতুল মসীহ হবার সুবাদে জামাতের প্রধান এবং যুগপৎ সদর আঘোষনে আহমদীয়ারও প্রধান ছিলেন। এর ফলস্বরূপ ব্যতিক্রমধর্মী পরিষেবার অবতরণ হয়। দুর্ভিক্ষা হয়ে আঘোষন সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী কোনে পদের এই অবস্থার মধ্যে সূত্র নেয় এবং পরিষেবা মশলাটে করার জন্য তা ব্যবহার করে। তারা গবেষণার সাথে বলে বেড়াতে থাকে, খিলাফত নয় বরং আঘোষনের সভাপতির পদই ক্ষমতার মূল উৎস। ১৯০৮ সনের দিলেশের তার কেউ কেউ বাস্তবতা জালালর বজ্রতা সদরে আলাদা আনুগত্য ও তার ইচ্ছার সাথে পুরো সংখ্যার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব রাখে। আঘোষনের মিতিং এর কার্যবাহিকতায় হয়রত খলীফাতুল মসীহুর নির্দেশাবলীকে প্রেসিডেন্টের নির্দেশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এ অদৃশ অস্থায়ির নির্দেশনা তখন হয় যখন হয়রত খলীফাতুল মসীহ ১৯১০ সনে প্রেসিডেন্টের পদ থেকে এ বলে পদত্যাগ

১৩৪
খলীফার পদমর্যাদা

করেন যে দুটো পদ যেহেতু ভিন্ন প্রকৃতির তাই তিনি এ পদ থেকে পদভাগ করেছেন। আর বলেন, সাহেবযাদা মিয়া বনীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদই আল্লামানের প্রেসিডেন্ট হন। কিন্তু ইতেমাদেই সর্বোচ্চ এ পাশ্চাত্য মাথাচাঢ়া দেয় যে খলীফা ও আল্লামানের মধ্যে কে বেশি ক্ষমতাধর?

এ ব্যাখ্যার পর আমরা পুনরায় সুনন্দা ফিরে যাচ্ছি। মৌলভী মোহাম্মদ আলী যিনি পরবর্তীতে ভিত্তিক গ্রন্থদাতাদের আমার নিযুক্ত হন, তিনি একথা মানার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না যে হযরত মসীহু মাওউদ (আঃ)-এর তিরোধানের পর হযরত খলীফাতুল মসীহুর হাতে তার বয়াতের কোন অবশ্যকতা আছে। যেমন তিনি পরবর্তীতে লিখেছেন:

"হযরত মসীহু মাওউদ (আঃ) ইতেকাল করেন লাহোর। তাঁর পরিবঁত মরদেহ যখন কার্যকারী আসে তখন খাজা কামাল উদ্দীন আমার কাছে বাগানে বলেন, হযরত মৌলভী নূরউদ্দিনকে তার খলীফা প্রস্তাব করা হয়েছে। তিনি আমার আরও বলেন, এটিও প্রস্তাব করা হয়েছে যে পুরো জামাত তার হাতে বয়াত করবে। তখন আমি বললাম, এটি অবশ্যই নয়। শুধু নতুন সদস্যদের বয়াত করতে হবে আর এটিই আল্লাহুওয়াল্লাহ বলা হয়েছে। এখনও আমার এটিই মত, যারা হযরত মসীহু মাওউদ (আঃ)-এর হাতে বয়াত করেছেন তাদের অন্য কারা হাতে বয়াত করার কোন প্রয়োজন নেই। এসতেও জামাতের ঐক্য বজায় রাখতে গিয়ে আমি বয়াত করেছিলাম।"৭০

এ ব্যাখ্যা অবশ্যই আমরা দেখি যে অন্তর্বিশ্বাসে সে পর্যায়ে তিনি আনুগুণের গভীর প্রভাব রাখতেন। এর সত্যিই 'একটি একান্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা' নামক পেশাড়ি দেখতে পাই। "সুফীদের মধ্যে আরেক ধরনের বয়াতের রীতি রয়েছে যেটিকে 'বয়াতে তাওবা' বলা হয়। যে ব্যক্তি বয়াত করে তাকে তার আধ্যাত্মিক গুরুর কথা সেভাবে মানা আবশ্যক যেভাবে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বা হযরত মসীহু মাওউদ (আঃ)-এর কথা মনে হয় কিন্তু এ বয়াতের তাদের দুজনের কারা খলীফাদের হাতে বয়াতের সাথে কোন সামঞ্জস্য নেই। আমরা জামাতের সদস্যরা খলীফাতুল মসীহুর হাতে এ বয়াতই নিয়েছি আর এ বয়াতের কারণেই আমরা সকলের মতামত সংক্রান্ত বিষয়বলিসহ খলীফাতুল মসীহুর সকল নির্দেশ মান্য করতে বাধ্য। এ বয়াত আল্লাহর সাথে আমাদের আধ্যাত্মিক সম্পর্ক জেরদার করার নিমিত্তে, হযরত খলীফাতুল মসীহুর মত পরিবর্ত ব্যক্তির সাহচর্য থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য এবং এ বয়াতের তাঁর অসাধারণ পাশ্চাত্য ও মহানুভবতার সামনে নতি স্মৃতিতে থাকে ।

১৩৫
হযরত মৌলিকী নূরুল্লাহিন (রা.) - খলিফাতুল মসীহু আউয়াল

বয়স্ত ১। সূত্রাঙ্গ শিষ্যের নিজেকে গুরুর সামনে একটি লাশের মত সমর্পন করা উচিত এবং নিজের সকল ইচ্ছা ও বাসনাকে তার সামনে পরিত্যাগ করা উচিত ।

এমন হওয়ার উচিত নয় যে কোন বিষয়ে গুরু বলবেন এটি সঠিক আর শিষ্য বলবে, না না গুরু বিষয়টি বুঝবেন নি আমি তাক রূপি । বয়স্ত ১। প্রাণের পর এমন আচরণ হযরত খলিফাতুল মসীহু প্রতি অশ্রদ্ধার নামাত্র আর বয়স্তের উদ্দেশ্যকে পান করার শান্তিল ।”

এই বিবৃতির আলোকে বলা যায়, মৌলিকী মোহাম্মদ আলী হযরত খলিফাতুল মসীহু নিমিলিনিয়ত স্পষ্ট কথার সাথে শতভাগ একমত ।

১। আমি আলাহুর নামে শপথ করে বলছি, তিনিই আমাকে খলিফা বানিয়েছেন।

২। খিলাফতের পোষাক থেকে আমাকে বিধিত করার ক্ষমতা এখন কার আছে ।

৩। আলাহু নিজ ইচ্ছা ও পরিকল্পনানুসারে আমাকে খলিফা বানিয়েছেন।

৪। তোমরা আমাকে হাজার দোষে দোষী করতে পার, কিন্তু আমার দোষ সম্পন্ন করে তোমরা কার্যত খোদার পরিকল্পনায় খুঁত তালাশ করবে, যিনি আমাকে খলিফা বানিয়েছেন।

৫। মেজবারে হযরত আলু বকর ও উমর (রা) খলিফা হয়েছেন ঠিক সেবার মহিমান্বিত খোদা আমাকে হযরত মির্য সাহেবের পর খলিফা নিযুক্ত করেছেন।

তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণায় মৌলিকী মোহাম্মদ আলী বলেছেন: “এ পবিত্র ব্যাবসায়, মৌলিকী নূরুদ্দিন, যিনি খলিফাতুল মসীহু, এই পরিভাষায় সঠিক অর্থের নির্দেশ তিনিই একমাত্র খলিফাতুল মসীহু হওয়ার যোগ্য।”

এর মাধ্যমে মৌলিকী মোহাম্মদ আলী হযরত একথা বুঝিয়ে থাকবেন যে এ শব্দের আসল অর্থের দিক থেকে মৌলিকী নূরুদ্দিনকে খলিফাতুল মসীহু মেনে নিলেও তার অর্থ এই নয় যে এরপর খিলাফতের প্রতিষ্ঠান অব্যাহত থাকবে।

কিন্তু হযরত খলিফাতুল মসীহু তার এ ঘোষণার মাধ্যমে এ বিষয়ে সম্পর্কিত সকল সম্প্রতিক নিরসন করেছেন: “তোমরা এ বিভাগ থেকে আদৌ লাভবন হতে পারবে না। কেউ তোমাদেরকে খলিফা বানাবে না আর আমার জীবন্ত প্রতি কেউ খলিফা হতেও পারবে না। আমি যখন মারা যাবে শুধু তিনি দূরভাগ্যমান হবেন যাকে আলাহু তাআলা বেছে নেবেন এবং আলাহু স্বর্গা তাকে দাফাতির করাবেন।”

১৩৬
খলীফার পদমযাদা

এর মাধ্যমে বুঝা যায়, খিলাফত প্রতিষ্ঠাতাই ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের মূল কারণ ছিল। অন্যান্য মতবাদগত বিরোধগুলো খিলাফতের বিরোধীরা নিজ অবস্থানকে মজবুত ও দৃঢ় করার জন্য পরে আবিষ্কার করে আর ফলাফল করে প্রচার করে। সে মূল বিষয়ে তারা শত অসিছা বা অনিহা সত্বেও হযরত মৌলিকী নুরউদ্দিনকে খলীফাতুল্লাহ মসীহ মানতে সমর্থ হয়েছে। হযরত মসীহ মাওদ (আ)-এর আকামিক ইতিহাসে হতভাম হয়ে তারা এমন পর্যায়ের একটি অসুবিধাকে বলে যে খিলাফত থেকে সমৃদ্ধভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয়া তাদের জন্য সমৃদ্ধ ছিল না। তারা নিজেদের হাত খুব শত্রু করে বেঁধে ফেলেছিল। অচিরেই তারা অনুমোদন করল যে তারা একটি তুলু করে ফেলেছে এবং একটি কটন পরিষ্ঠিত থেকে যাটা সম্রাট মুখ মুখ রক্ষা করে বেঁধে আসার জন্য সরাসরি হাত পা চালাতে থাকে। তারা বুঝতে পেরেছিল, খলীফার সাথে সরাসরি সংঘর্ষ জমাতের সংঘাতগুলির শ্রেণী সহ্য করে না তাই এমন কোন পদক্ষেপ নেয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। খলীফাতুল্লাহ মসীহদিন বয়স ৭০ এর কাছাকাছি ছিল আর তার সাথের মোটে ভাল ছিল না এবং অচিরেই একজন স্থলাভিষিক্তের কথা সামনে আসবে। তাই জমাতের চিন্তাধারার প্রবাহ এখানে পরিচালিত হওয়ার উচিত যে জমাতের সার্বভৌম কর্তৃত্ব হলো সদর আজুমানের আহমদীয়া। আর খলীফা হলেন ছুধু আদ্যা যিনি তাই নিজস্বের শ্রদ্ধা ও সমান্তরে যোগ কিন্তু তিনি কোন কর্তৃত্বের অধিকারী নন। তাদের আশঙ্কা ছিল, খিলাফত সাহেবযাদা মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদের হাতে যাওয়ার সমুহ সম্ভাবনা রয়েছে অথচ তিনি একজন তুলু মাত্র যার বয়স বিশ্বাস হবে না। অথচ খলীফাতুল্লাহ মসীহদিন তার পক্ষে নিয়ম থাকেন আর তাকে আসার্থ সমান্তরে দৃঢ়তাটল দেখে থাকেন। খলীফার সাথে তুলনামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে আজুমানের অগ্রাধিকারের বৈধতা তাদের উত্তরসরূপ ছিল।

এলক্ষ্যে আর জন্য তাদের কেউ কেউ সুরূপালিত মতবাদকেও বিকৃত করতে তিনি করেন। তারা মুক্তি দেয়, আরু বকরের খিলাফতসমূহ খিলাফতের পক্ষে কুরআনের আযা (২৪:৫৬) উল্লেখ করার বুথা। কেননা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর স্থলাভিষিক্তরা তার খলীফা ছিলেন, কিন্তু প্রতিষ্ঠাত মসীহদিন তিনি নিজেই হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর একজন খলীফা ছিলেন মাত্র, নিজ অধিকার বলে তিনি নরী ছিলেন না তাই তার কোন খলীফা হতে পারে না। দৃঢ়তাসমূহ ১৯০৮ সালের ২৭শে মে তারিখে হযরত মৌলিকী নুরউদ্দিনকে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য কে লিখিত অনুমোদন করা হয়েছিল তাতে একজন সাক্ষরকারী ছিলেন ধাম বায়ারত আহমদ। সে একথা লেখার দৃষ্টিতে দেখায়।

১৩৭
হযরত মৌলভী নূরউদ্দিন (রা.) - খলিফাতুল মসীহ আউয়াল

“আমরা দ্বিপ্রহিন ভায়ার বলেছি, মিয়া সাহেব নবি ছিলেন না বরং হযর (সাঙ্গ)-এর একজন খলিফা মাত্র। খাৰিফত শুধু নবুওয়াতের পরেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, খলিফার খলিফা হওয়ার বিষয়টি অর্থহীন।”

এ বিবৃতিটি সেসব স্পষ্ট হইকে রোকত্তাইর পরিপ্রেক্ষা যা সে দলের নেতৃহীনিয় লোকেরা বিভিন্ন সময়ে দিয়ে আসছেন যাদের একজন হলেন ভাঙ বাশারার আহমদ। সত্যিকার অর্থে তিনি স্বয়ং এ মতামত ব্যক্ত করেছেন, “এক কথায় নবী ও রসূল আসেন কিন্তু তারা হযরত মুহাম্মদ (সাঙ্গ)-এর অনুসারী হবেন। তাই তাদের নবুওয়াত হযরত মুহাম্মদ (সাঙ্গ)-এর খাতামান নবীদি এর পরিপ্রেক্ষা হবে না।”

উদাহরণস্পর্শে অন্যান্য দৃষ্টান্তে দেয়া হয়ে পারে। ১৯০৩ সালে মৌলভী করম দিন হযরত মসীহ মাওউদ (আং)-এর বিরুদ্ধে মানহীনর যে কোনো মামলা করেছিল এতে সাফি হিসেবে আদালতে হলফ করে মৌলভী মোহাম্মদ আলী বলেন, “বিবাদী মিয়া সাহেব নবুওয়াতের দাবীদার। তিনি তার প্রকাশনায় সে দাবীর কথা ব্যক্ত করেছেন। দাবী হলো তিনি নবী, কিন্তু শরীয়তবিহীন নবী।”

১৯০৮ সালের ১৮ই জুলাই 'আলু-হাকামে' প্রকাশিত তার এক বক্তৃতায় মৌলভী সাহেব বলেন, “এক বিবাদী এ আযাতাদের (৪:৭০) ব্যাখ্যা যাইকে করল না কেন আমাদের দুর্দশা হলো আল্লাহ তাআলা যে কোন ব্যক্তিকে নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ বানাতে পারেন। শুধু সমাজের প্রমাণ। আমরা যাকে বোঝা পেরেছি তিনি একজন মুতাবক্তী, আল্লাহ-মনানিত ব্যক্তি এবং একজন পরিতর রসূল ছিলেন। পরিবর্তনীর প্রেরণা তার মাঝে চরম পরাক্ষার লাভ করেছে।”

বাটালয়ে একটি সভায় বক্তৃতা করতে গিয়ে খাজা কামাল উদদিন বলেছেন, “তোমাদের এতদাব্লে একজন নবী প্রেরিত হয়েছেন। তাকে মানা না মানা তোমাদের ব্যাপার।”

ডাঙ্গ সাইদ মোহাম্মদ হোসাইন ঘোষণা করেছেন: “আমরা আল্লাহর কাছে যারপরাইকে কৃতজ্ঞ। কারণ প্রতিষ্ঠা মসীহ (আং)-এর বিভিন্ন দুর্দশাই পরিপূর্ত প্রমাণ করে যে আল্লাহ তাআলা তার প্রতি যে ওহী করেছেন তা আল্লাহই উক্ত আম যিনি সে ওহী প্রাপ্ত হয়েছেন তিনি আল্লাহর সত্য রসূল ছিলেন। আল্লাহ এর সুনিশ্চিত প্রমাণ দিয়েছেন।”

১৩৮
ডাঃ মিয়া ইয়াকুব বেগ বলেন, “এটি খোদার দান যে আমাদের মত সাধারণ রোধ-রুদ্ধির মানুষের বুদ্ধি দিতী জন্য তিনি সকল যুগে নবী, ওলি ও মুহাফিকদের প্রেরণ করেন।”

সীমলার মৌলিক উমর উদীন বলেন, “আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা হাদিস ‘লা নবীয়া বা’দিয়ার’ (আমার পর নবী নহেই) ব্যাখ্যার নামে তুফান সৃষ্টি করে রেখেছে। তারা সকল অনুষ্ঠানে বার বার এটি পড়ে আর এর ভিত্তিতে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর নবুওয়াতের দাবীকে কুফরী ও প্রতারণা আখ্যা দেয়। তারা ইহুদী আলেমদদুষ্ঠ হয়ে গেছে। এ হাদিসের অর্থ হলো মহানবি (সাহ)-এর পর কৌন শরীয়তধারী নবী আসবেন না কিন্তু তাঁর পর তাঁর দাসদের মধ্য থেকে নবী হতে পারেন।”

ভিনন্দত পোষণকারী শ্রীরিয়ার পত্রিকা পয়গাম সুলহ যা লাহোর থেকে ছাপে
এর ১৯ই অক্টোবর, ১৯১৩ সালের সংখ্যায় এ ঘোষণা ছেপেছে:

“আমরা লক্ষ করেছি, কিন্তু বদুরে এ ভুল ধারণা দেয়া হয়েছে, যারা এ পত্রিকার সাথে সংঘটিত তারা বা তাদের কৌন কৌন নেতা ও পথপ্রদর্শক হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর সম্বন্ধে পদময়াদকে নাকি অধিকার করে। আমরা সকল আইহাম্মি যারা কৌন না কৌনভাবে পয়গামে সুলহ সাথে সংঘটিত;
আলাহুকে সাফকী রেখে, যিনি হুদোর গতীর রহস্যকে জানেন ঘোষণা করছি,
আমাদের সম্পর্কে এমন কথা বলা অনেক বড় একটি অপবাদ। আমরা প্রতিশ্রুত
মসীহ ও মাহদী (আঃ)-কে এ যুগের নবী, রসূল ও পরিত্যা হিসেবে বিখ্যাত করি।”

তাই হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) নবী নন, তাঁর পর খলিফা হতে পারে
না-এ অজুহাত শুধু একটি ভিত্তিতা মাত্র, বাস্তবে এ ধারণার কৌন নতুন নেই।
কিন্তু একবার এটিকে বিবর্ধকের চাষুর্ণ পুর্ণ মাধ্যম হিসেবে অবলম্বনের পর তা
বিলাফতের বিরোধী শ্রীরিয়ার বিশ্বাসের অংশ হয়ে যায়। হযরত মসীহ মাওউদ
(আঃ)-এর নবুওয়াতের অধিকারের মধ্যে তারা আরও একটি সুবিধা দেখেছে।
তারা ভেবেছে, যদি এর উপর জোর দেয়া ছেড়ে দেয় তাহলে মুসলমানদের
সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রীরী নিজেদেরকে আহমদের অংশ মনে করার ফ্রেম যে বাধা
আছে তা দুর্লভ হবে আর তারা এবং যারা তাদের মত চিন্তা করে তাদেরকে
মুসলমানদের নেতা হিসেবে সান্ন্দ্য যৌথতি দেয়া হবে কারণ তারা ইসলামের
অধ্যাত্মিক ও ইয়মি পুনর্জগারণের মৌলিক পূর্বেই আরোহিত। হযরত মসীহু
মাওউদ (আঃ) যে শিখন এবং ইসলামী শিক্ষার দর্শন বর্ণনা করেছেন তারা সে

১৩৯
হযরত মৌলিকী নূরুউদ্দীন (রা.) - খলিফাতুল মসীহ আউয়াল

শিক্ষার উপর ভিত্তি করে কাজ করবে একই সাথে তাঁর দায়িত্বকে গ্রহণের উপর খুব একটা জোর দেবে না। তাদের কেউ কেউ বিশেষ করে খাজা কামাল উদ্দীন তাঁর বক্তৃতাকে এ ছকেই সজ্জাতেন আর আত্মপ্রসাদ নিতেন যে এতে তাদের প্রভূত লাভ হচ্ছে। তারা যে কত বড়ুদ দুঃখজনক প্রক্রিয়াতে নিপীড়িত ছিল তা বুঝতে তাদের অনেক সময় লেগেছে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) তাঁর লেখা ও বক্তৃতায় বিভিন্ন কার্যে বিলাস সম্পর্কে যে জ্ঞানগতি আলোচনা করেছেন সে কথাগুলো তাদের জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত ছিল। দৃষ্টান্তসূচক ইতিহাসের মাধ্যম ছয় সপ্তাহ পূর্বে তিনি তাঁর বক্তৃতায় একথা জোর দিয়ে বলেন, “সূরীরা বলেছেন, ‘কোন শেখ, রসূল বা নবীর পর মিনি খিলীফা হওয়ার, তিনিই প্রথম ব্যক্তি যার হওয়া আলাহ সত্য গ্রহণের প্ররোচনা সৃষ্টি করেন। একজন রসূল বা জেহুরের মৃত্যু পৃথিবীর জন্য প্রচুর ভূমিকাপ্রস্তর এবং মানবতার ভয়ের কারণ হয়ে থাকে। কিন্তু আলাহ খলিফার মাধ্যমে নিরাপত্তার নিয়ন্ত্রণ দিয়ে থাকেন আর খলিফা প্রযাত্ব ব্যক্তির আগমনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় নতুন করে প্রাপ্ত সংস্কার করেন। হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) কোন খলিফা নিযুক্ত করেন নি? কেননা তিনি বালাবতে জানতেন, আলাহ তাআলা স্বয়ং খলিফা নিযুক্ত করবেন। অধিক্ষণ খলিফা নিযুক্তির বিষয়টি তাঁর সাথে সম্পর্ক রাখে আর তাঁর পছন্দের কোন বিকল্প নেই। অতএব সত্য গ্রহণের জন্য আবু বকরের হওয়া সম্প্রম প্ররোচনা সৃষ্টির পর তিনি আবু বকরকেই খলিফা বানিয়েছিলেন।”

এটি এক্ষেত্রে সম্পট প্রত্যায়ন যে তাঁর পর খলিফা হবেন আর সভাব্য ব্যক্তি হবেন হযরত নূরুউদ্দীন। কেননা তিনিই প্রথম ব্যক্তি যার হওয়া আলাহ সত্য গ্রহণের প্ররোচনা সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সম্পর্কে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলে রেখেছেন:

“তিনি আমাকে এমন সময়ে নির্দিষ্ট গ্রহণ করেছেন যখন সকল দিক থেকে আমাকে অবিশ্বাসী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যানের ধরন উচ্চকিত হয়েছিল আর যারা বয়স্কর করেছিল তাদের অনেকেই আমাকে প্রত্যাখ্যান করে বসেছিল বা একান্তিকতা হারিয়ে সন্দেহের শিকার হয়ে বসেছিল। এতে সময়ে আমার মসীহ হবার দায়িত্বকে গ্রহণ করে সম্প্রস্তর যে ব্যক্তি আমার কাছে কাদিয়ান পত্র লিখে তিনি ছিলেন মৌলিকী নূরুউদ্দীন। তিনি লিখেছেন: ‘আমরা মানন্ম এবং গ্রহণ করলাম সৃতরাং আমাদেরকে সাফ্কাদের অন্তর্ভুক্ত করুন।’”

140
খলীফার পদমর্যাদা

আতএব এটি ঐশ্বী ইচ্ছাই ছিল যা ২৭শে মে, ১৯০৮ সনে কাদিয়ানের বাগানে যারা আধ্যাত্মিক সম্পর্কের কলযানে সমর্থত হয়েছিলেন তাদের সকলের হৃদয়কে এক বাক্যে হযরত মৌলভী নূরউদ্দীনকে খলীফাতুল মসীহ মানতে এবং তাঁর হাতে বয়ানতে বাধা করেছিল, যাদের মধ্যে সর্বাধিক ছিল তারা যারা অচিরেই থিলাফতের উপর আস্থানের প্রাধান্যের দাবী করতে যাচ্ছিল। সংঘটনের সে মুহূর্তে তারা আধ্যাত্মিক বাধ্যবাধকতার তাড়নায় দ্বীধী ভাবায় একথা বলতে বাধ্য হয়েছিল, তাঁর নিদর্শন মানা আমাদের জন্য ঠিক সেভাবে আবশ্যক যেভাবে হযরত মসীহ মাওদ (আঃ)-এর কথা মানা আবশ্যক ছিল। তাঁরা নিজেদের জন্য প্রাঙ্গণের আর কোন পথ খোলা রাখে নি। নির্দেশে এটি খোদার ইচ্ছা ছিল।

মন্ত্রকাল পরেই যখন তারা মরণ হয়ে বের হওয়ার কোন পথ উদ্দীপনা ও নিধার স্থল প্রতিষ্ঠান ও হঠাৎপি স্থান পায়। যখন তাদের অপচার সামনে এলো তখন যারা আধ্যাত্মিক দৃষ্টি রাখতেন তারা সতর্ক হয়ে গেলেন।

তাদের একজন ছিলেন হযরত উমুল মু'মেনীনের ছেলে ভাই মীর মোহাম্মদ ইসহাক। তিনি ছিলেন একজন সুপরিচিত আলেম ও আদর্শ খোদাইরু এবং মূর্তারিমানুষ। তিনি ১৯০৯ সনের জানুয়ারীর প্রথম দিকে খলীফা ও সদর আস্থানে আহমদীয়ার সম্পর্কের বিষয়ে কিছু প্রশ্ন লিখে হযরত খলীফাতুল মসীহ মীরের সমীপে উপস্থাপন করে এর উপর আলোকপাতের অনুরোধ করেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সেসব প্রশ্ন মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেবের কাছে পাঠান এবং তাকে উত্তর প্রদান করার নিদর্শন দেন। যখন তাঁর কাছে মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেবের মত্ত্বর্ণ পোঁছলে তিনি দেখে আশ্চর্য হলেন যে লেখক বিভ্রম পোষণকারীদের সাথে একমত যারা থিলাফত প্রতিষ্ঠানের সমন্ধে দেখতে চায়। দৃষ্টিদর্শনের নিদর্শন তিনি লিখেছেন:

"হযরত মসীহ মাওদ (আঃ)-এর ওসীদ্বিতে থেকে কোথাও একথা বুঝা যায় না যে কোন ব্যক্তি-খলীফার প্রয়োজন আছে; যদিও বিশেষ পরিস্থিতিতে তাও হতে পারে, যেমন বর্তমান সময়ে অমারা দেখি। প্রকৃতপক্ষে হযরত সাহেব আস্থানে তাঁর থিলাফত নিযুক্ত করেছেন, কোন একক ব্যক্তির থিলাফত হওয়া আবশ্যক নয়।" ২৩

তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ নিদর্শন দিলেন, প্রশ্নগুলোর বেশকিছু অনুলিপি স্পষ্টত করে জামাতের নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিকদের কাছে নিদর্শন কোন তাঁরিচে উত্তর প্রশ্নের অনুরোধ করে পাঠানো হোক আর পরামর্শের জন্য সকল জামাতের কর্মকর্তাদেরকে ৩১শে জানুয়ারী কাদিয়ান আসতে বলা হোক।

১৪১
হয়রত মৌলভী নুরউদ্দিন (রা.) - খলিফাতুল মসীহ আউয়াল

প্রশ্নাবলী যখন খাজা কামাল উদ্দিনের কাছে লাহোর পৌছলো তিনি তাঁর বসায় জামাতের একটি মিটিং ডাকেন এবং সকলকে নসীহত করেন যে জামাত একটি সংকটপূর্ণ সময়ে আতিবাহিত করছে। তারা যদি সাবধান না হয় তাহলে জামাত ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, অর্থাৎ তারা যদি এ বিষয়টি নিচ্ছিদ্র করতে না পারে যে মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর আসল খলিফা আজ্জুমান, তাহলে তারা জামাতকে হুমকির মুখে ঠেলে দেবে এবং জামাত ধ্বংস হয়ে যাবে। তিনি সকলকে এ সম্পর্কে একটি বিবৃতির বিষয়ে মনেকে পৌছার অনুরোধ করেন।

স্বাভাবিক আজ্জুমানের সেক্টরটির হাজারী মোহাম্মদ কোরাইশী এবং রেলওয়ের ফোরমান বাবুর গোলাম মোহাম্মদ সাহেব এ যুক্তির ভিত্তিতে সে বিষয়ে একমত হতে অগ্রীকৃতি জানান যে তাঁরা এক ব্যক্তির হাতে বয়স্ক করেছেন যেন তাদের তুলনায় বেশি জানি ও মুন্তাকী এবং তিনি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-কে তাদের তুলনায় অনেক বেশি সমান করতেন। তাই তিনি যে নির্দেশ দেবেন তাই মান্য করেন।

এ মিটিং এর সংবাদ কাদিয়ান পৌছলে 'আলহাকাম' পত্রিকার সম্পাদক শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব তাঁর বাড়িতে একটি মিটিং ডাকেন এতে বিভাগ ও এর সমাজ পদমর্যাদা সম্পর্কে বস্তুভা প্রদান করা হয় এবং খলিফার প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের অস্তিকার সাধু করে একটি রেজোলাশন পাশ করা হয়। উপস্থিত ৪২ জনের মধ্যে শশু দুজন রেজোলাশনের দায়িত্ব করতে অগ্রীকৃতি জানায। ৩০শে জানুয়ারীর সন্ধ্যায় বিভিন্ন জামাতের প্রতিনিধিরা কাদিয়ান পৌছেন। তাদের অধিকাংশ মসজিদের মোবারকে দোয়া ও সেজন্য রাত কাটিয়ে দেন। বাবুরা তাঁহাদের সময় তাঁদের সাথে মিলিত হন। আলহাকাম কাজ এমন বেদনাপূর্ণ আকৃতি মিন্টক করা হয় আর দিকনির্দেশনার জন্য এমন করণ্ডাবে দেনা করা হয়, মনে হচ্ছিল যেমন সকলে তাঁদের বিচার দিবস। ফজরের আয়নার পর সবাই মসজিদে পৌছেন। যারা সদর আজ্জুমানের শ্রেষ্ঠত্বের প্রবন্ধ, তারা হযরত খলিফাতুল মসীহ নামায়ের জন্য আসার পূর্বে যে সময় পেয়েছে সে যুক্তির অপেক্ষার নামায়ীদের সামনে তাদের যুক্তির ব্যবস্থা তুলে ধরার কাজে ব্যয় করে। শেখ রহমতুল্লাহকে একথা বলতে শোনা যায়: "কত বড় দুঃখের বিষয় যে কিছু দুঃখতমকারী, এক কিশোরকে খলিফা বানাতে চায় আর এভাবে জামাতকে ধ্বংস করতে চায়।"

হযরত খলিফাতুল মসীহ নামায় পড়া এলে সমবেত জনতার উপর একটি নির্বতা ছেয়ে যায়। তিনি নামায়ে সূরা ফাতেহার পর কুরআনের ৮৫ নম্বর সূরা।

১৪২
খলিফার পদমর্যাদা

পাঠ করেন। যখন তিনি ১১ নম্বর আয়ত তেলাওয়াত করলেন অর্থাৎ "যারা বিশ্বাসী পুকু৷ ও বিশ্বাসী নারীদের অনিবিষ্ট পরিস্থিতির মুখে ঠেলে দেয় এবং এরপর অনুশোচনা করে না তাদের জন্য নিষ্ক্রি জাহাজের আঘাত রয়েছে এবং তাদের জন্য রয়েছে দণ্ডকারী আদেশের শাস্তি" তার গলার স্বর মাঝখানে ডাঁড়া যেতে থাকে আর উপস্থিত সকলের আবেগের অতিভূষণে চেতনা হারানোর উপকৃত হয়। আটকে যাওয়া স্বর তিনি এ আয়তের তেলাওয়াতের পুনরাবৃত্তি করেন। মসজিদ ক্রমনিবার্থে, বিলাপর্তি ও গভীরভাবে আন্দোলিত মানুষের কান্নায় ভরে যায়। সকল হয় মনে ধারে মুখে পরিহার হয়ে যায় আর ঐশী ভয়ে ভরে
যায়। নিশ্চলুষ বিশ্বাসে সম্পূর্ণভাবে তাদের উপর ছেয়ে যায়। প্রতোকেই অনুভব করল যে সে একটি ঐশী নিদর্শন দেখেছে।

নামায শেষে হযরত খলিফােতুল মসীহু ঘাটে ফিরে যান।

ভিনমত পোষণকারীরা সমবেত জনতার এই পরিবর্তিত মানসিক অবস্থার সৃস্থলগুলোকে লুকে নিতে চেয়েছে। খাজা কামাল উদ্দিন উপস্থিত লোকদের একটি দলকে বলেন, খলিফা হয় বিদায় করে বার বার ৮৫১১ পড়ে এটি স্পষ্ট
করছেন, যারা মসীহু মাওউদ (আঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত আল্লাহকে কোন দুর্ঘটনা দেয় না যাকে তিনি খলিফার নিয়োগকন্ত রায়ে আর খিলাফতের প্রাথমিক সদিয়া দেয় তারা জামাতকে অনিবার্থ অবস্থার ভিতর ঠেলে দেয়ার জন্য দায়ী এবং তারা তার শাস্তি
পাবে। তিনি যে কত দুঃখজনক ভাবিতে ছিলেন তিনি ও তাঁর সাধারণ
অনুভবের তা টের পেয়েছেন। তার কথার সূত্র ধরে পরে ডাঁ মিরচ ইয়াকুব
বেগ হযরত খলিফাতুল মসীহুর কাছে যান এবং তাঁকে মোবারকবাদ জানিয়ে
বলেন, "সবাইকে এটি বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে আল্লাহকেই খলিফা।"

"তিনি এই উভয় পান, ‘কোন আল্লাহনামা?’ যে আল্লাহকে তোমরা খলিফা
মনে কর তা কিছুই নয়।"

দুঃখ নিরাশ হয়ে ফিরে যান কিন্তু বুঝতে পারেন যে বিষয় জ্যাতিল রূপ নিতে
যাচ্ছে। কিন্তু তিনি এবং যাদের তিনি প্রতিনিধিত্ব করছিলেন তাদের আদৌ কোন
ধারণা ছিল না, এর অব্যবহিত পর কি হতে যাচ্ছে।

সমবেত জনতা (শুরু) যাদের সংখ্যা প্রায় ২৫০ হবে, তাদেরকে মসজিদের
রৌদ্রদীঘ ছাদে উপস্থিত হবার জন্য বলা হয়। সরাই যখন এসে গেল তখন
হযরত খলিফাতুল মসীহু এলেন। আর তাঁকে ছাদের মাঝে তাঁর জন্য নির্ধারিত
একটি আসনে বসতে অনুরোধ করা হলে তিনি প্রত্যেকে করেন আর উভয়ের সারে
গিয়ে সে অংশ দাঙ্গাযে যা হযরত মসীহু মাওউদ (আঃ)-এর নির্দেশে নির্মাণ
করা হয়েছিল। ইটের ছাদটি উমুক্ত ছিল।

১৪৩
হযরত মৌলিকী নুরউদ্দিন (রা.) - খলিফাতুল মসীহ আউয়াল

কয়েক বছর পর হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী দুর্গী এভাবে বর্ণনা করেছেন: "একজন বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের দৃষ্টিতে সামান্য ইটের মেজেতে বসা ২৫০ জনের এ সমাবেশটি হাসরের ও তুচ্ছ বিষয় ছিল। কিন্তু তাদের হায় ঈমানে সমুদ্র এবং খোদার প্রতিদ্বন্দ্বিতে যাদের দৃঢ় আত্মা ছিল তারা জানতেন, তারা আহমদিয়াদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য এসেছেন যার উপর বিশেষ শান্তি ও সমৃদ্ধি নির্ভরশীল। সেদিন এ সিদ্ধান্ত হওয়ার ছিল যে আহমদীয়ার সমাজের অন্যান্য সংগঠনগুলোর একটি? নাকি মহানবিনী (সাঢ়)-এর সত্যিকারের অনুসারীদের সংগঠন যাদের মাধ্যমে ইসলামের পুনর্জীবিত হওয়ার কথা। সেদিন মানবজাতির ভাগ্য নির্ধারিত হওয়ার দিন ছিল। আজ হযরত এটি বুঝা যাবে না, কিন্তু সে সময় দূরে নয় যখন মানুষ প্রশ্নর সাথে বলবে, এ অজানা ধর্মীয় সংগঠনটি পৃথিবীতে শান্তিরূপে ও পরিবর্তন সাধনে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর তুলনায় অধিক কার্যক্রমে দৃষ্টিকোণ পালনকারী।"

হযরত খলিফাতুল মসীহ বন্দুক্তার অর্থেরও। সুগ্রীর ও সুপরিমিত কথা তিনি স্পষ্ট করেন, "খিলাফত একটি ধর্মীয় বিষয়, আর জামাতের যদি উন্নতি করতে হয় তাহলে এর কোন বিকল্প নেই। আদ্রাহ আমাকে জানিয়েছেন, 'যদি তোমাদের কেউ আমাকে পরিযায় করে তাহলে তিনি আমাকে তার স্থানে একটি বিশাল বিশ্ব দান করবেন। সুতরাং আমি তোমাদের কাছে উপর নির্দেশ করি না। আদ্রাহ দয়ার উপর আমার পূর্বে বিশ্বাস আছে, তিনি আমাকে সাহায্য করবেন।"

এরপর মৌলিকী মোহাম্মদ আলী এবং খাজা কামাল উদ্দিন প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছেন এর দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন: "আমাকে বসা হয়েছে যে খলিফার একমাত্র কাজ হলো নামায়, জানায় ও বিবে পড়ানো এবং বয়সে নেয়া। যে এমন কথা বলে সে অজ্ঞ এবং শিষ্টিচার বহির্ভূত। এমন ব্যক্তির তাওবা করা উচিত নতুন সে নিজের ক্ষতি করবে।"

তিনি নসিরহ করেন: "তামরা তোমাদের আচরণের মাধ্যমে আমাকে চরম কষ্ট দিয়েছে এবং খলিফার পদবিঃ অবমাননায় দায়ে দোষী। তিনি খলিফার মান্যতা ও তার প্রতি আনুগত্যের প্রকৃতি ও ধরন সম্পর্কে বিশ্লেষণ করেন যেন বয়স্কারের অভিজ্ঞতার সম্পর্কে কারো মনে কোন প্রকারের সত্ত্বেও অবশ্যই না থাকে। তিনি তাদের বিচারক করেন যারা খিলাফতের প্রতি অবাধ্যতার দোষে দূরে আর তাদের প্রতি অনুমোদ প্রকাশ করেন যারা তাঁর অনুমোদি ছাড়া খিলাফতের পক্ষে সমর্পিত হয়েছে শেষের দিকে তিনি কয়েকজনকে তাদের..."
খলীফার পদমূল্যাদা

মতামত প্রকাশ করার জন্য ঢাকেন। হযরত সাহেবযাদা মিয়া মাহমুদ আহমদ এবং নবাব মোহাম্মদ আলী খান সাহেব তাঁর সাথে পুরো মুনিহ প্রকাশ করেন এবং বলেন, তাঁরা কখনো কোন ভিন্ন ধরণের রাখতেন না। খাজা কামাল উদ্দীন কিছুটা অস্পষ্ট কিন্তু ইতিবাচক মন্তব্য করেন।” 

তখন খলীফাতুল মসীহ মৌলিক মোহাম্মদ আলী ও খাজা কামাল উদ্দীনকে বয়াত নবাবনের আহবান জানান। তিনি বলেন, আপনারা অন্য কোন স্থানে গিয়ে পরম্পর পরামর্শ করুন যে আপনারা এর জন্য প্রস্তুত কিনা। তিনি শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানীকে বয়াত নবাবনের জন্য ঢাকেন যিনি খিলাফতের পক্ষে মিলিং দেবেছিলেন। তিনি জনের সকলেই তাঁর কথা অনুসারে বয়াত করেন আর মিলিং শেষ হয়। একটি বিবৃতি সংকট কেটে যাওয়ায় আর মারাত্মক বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ায় সকলেই স্থির নিশ্চিতসহ নিলেন। কিন্তু মৌলিক মোহাম্মদ আলী ও খাজা কামাল উদ্দীন চাপা কেক প্রকাশ করেন। ছাড় থেকে নামার পরই মৌলিক মোহাম্মদ আলী খাজা কামাল উদ্দীনকে বলছিলেন, “আমাদেরকে সবাই সামনে সেই ব্যক্তি অপদস্থ করেছে যিনি জামাতকে নেতৃত্ব দেয়ার দায়িত্ব করেন। আমি এটি সহ্য করতে পারব না।”

খলীফা রশিদ উদ্দীন যিনি একক নিষ্ঠাবান, অনুগত ও নিবদ্ধতাপূর্ণ মানুষ ছিলেন এবং মৌলিক মোহাম্মদ আলীকে অসাধারণ সম্মান করতেন এবং তাকে জামাতের একটি খুঁটি মনে করতেন, দুঃখিত দিন পর তিনি এমন উদ্দিত অবস্থায় হযরত খলীফাতুল মসীহুর কাছে আসেন যেন আকাশ ভেসে পড়তে যাচ্ছে। তিনি বলেন: “অনেক বড় বিপদ মাঝার উপর বুঝতে, দয়া করে এটি এড়ানোর জন্য দ্বার্ত ব্যবহার নিন।” তাকে বিশ্বাসিত বলতে বলা হলে তিনি বলেন, “মৌলিক মোহাম্মদ আলী সাহেব বলছেন, ‘তাকে মারাত্মকভাবে অসামান্য করা হয়েছে তাই তিনি আমার কাদিয়ান থাকতে পারছেন না।’ তাকে বাধা দেয়ার জন্য দয়া করে এখনই কোন ব্যবস্থা নিন পাচে তিনি চলে না যান।” তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ তাকে বলেন, “আপনি যান আর মৌলিক মোহাম্মদ আলী সাহেবকে আমার পক্ষ থেকে বলন যে তাঁর যেতে আর দেরী করার প্রয়োজন নেই।” তিনি ইচ্ছা করলে এখনই চলে যেতে পারেন। খলীফা সাহেব হতভাগ্য হয়ে গেলেন আর বিড় বিড় করে বললেন, “আমার মনে হয় অনেক অশান্ত দেখা দেবে।” খলীফাতুল মসীহ বলেন: “দাঁড় সাহেব আমার যা বলার ছিল বললেই, যদি সমস্যা দেখা দেয় তাও আমার বিরুদ্ধে যাবে।” আপনার চিন্তায় কি আছে? দয়া করে তাকে বললেন, যদি তিনি কাদিয়ান ছেড়ে যেতে চান তাহলে এখনই যেতে পারেন।”

১৪৫
হযরত মৌলিকী নুরউদ্দিন (রা.) - খলিফাতুল মসীহ আউয়াল

অতএব হযরত খলিফাতুল মসীহ হাতে মৌলিকী মোহাম্মদ আলী ও খাজা কামাল উদ্দিনের বয়সু নবায়ন শুধু জীবনের পথে নিত্য সীকার ছিল নতুন আদরণের পরিবর্তনের তাদের কোন ইচ্ছাই ছিল না। শীঘ্রই তাদের আত্মরক্ত পরিপক্ক করার একটি সুমধু এলে গেল। হযরত খলিফাতুল মসীহ আউয়ালের একজন নিকট আত্মীয় তারা নিবাসী হাকিম ফয়ল উদ্দিন সাহেব, ভোরায় সদর আহমদানে আহমদীয়র নামে হিসাবে জায়েদাদ (সম্পত্তির ও সীকায়ত) হিসেবে এক সম্পত্তি রেখে যান এটা তিনি এক শিয়ার কাছ থেকে একান্ত কম মূল্যে ক্রয় করেছিলেন। সে সাময়িক কোন চাপের মুখে তা বিক্রি করে দিয়েছিল।

আহমদান জমিটি বিক্রির সিদ্ধান্ত নেয়। যখন এ জমিটি মূল বিক্রিত জানতে পারলে যে জমি বিক্রি হচ্ছে তখন কোন এ জমি হাকিম ফয়লুদ্দিনের কাছে বিক্রি করতে বাধা হয়েছিল তা উল্লেখ করে সে হযরত খলিফাতুল মসীহ হাতে চিঠি লিখে এবং অনুরোধ করে, এ জমিটি সহজ শর্তে মেন তার কাছে বিক্রি করা হয়। হযরত খলিফাতুল মসীহ পাঠির সদর আহমদানে পাঠিয়ে দেন এবং বিবেচনা করার পরামর্শ দেন। আহমদান যে উত্তর দিয়েছিল তা হলো: এ সম্পত্তি নিলামে দেয়া হবে আর পূর্ববর্তী বিক্রি দর কষাকষি অপূর্ব থেকে পারে। তারা এমন কোন ছাড় দিতে প্রস্তুত নয় যার ফলে আহমদানের ক্ষতি হতে পারে। হযরত খলিফাতুল মসীহ বুলেন, এ আচরণ শুধু মিতার বিবর্তনই নয় বরং হযরত খলিফাতুল মসীহ বুদ্ধিমানও বটে। তিনি অনুরোধ বাজি করে বলেন, "তোমরা যা ইচ্ছা কর, আমি এ বিষয়ে নিজেকে আর জড়াবো না।"

পুনরায় যখন আহমদানের ট্রাস্টদের মিটিং বিষয়টি উদ্ধৃত হয় তখন সেক্টরটির সকলকে ট্রাস্ট হিসেবে খোদার প্রতি তাদের দায়-দায়িত্বের কথা স্মরণ করান এবং জিজ্ঞেস করেন, এখন কি করা যায়? সাহেবদাদা মির্জা বীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ সাহেব বলেন, হযরত খলিফাতুল মসীহ যেহেতু চেয়েছেন তাই সম্পত্তির সাক্ষাৎ মালিককে কিছুটা ছাড় দেয়া উচিত। তার ইচ্ছার বাস্তবায়ন আবশ্যক। সেক্টরটির বলেন, খলিফাতুল মসীহ বিষয়টি আমাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। এবং তিনি তার বাক্য পড়ে শুনান। তখন সাহেবদাদা সাহেব বলেন, তার বাক্য অনুত্তরের বহিঃপ্রকাশ মাত্র, অনুমতি নয়। তাই তাদেরকে তার ইচ্ছানুসারে কাজ করা উচিত। দীর্ঘ আলোচনাকালে হযরত সাহেবদাদা সাহেবকে একজন ট্রাস্ট হিসেবে যেদিকে তাকানো কথা স্মরণ করানো হয় কিন্তু তিনি পূর্বে প্রকাশিত মতের উপর অনুভূত ছিলেন। এবং তাদের সাহসি ভোদ্দে তার অনুরোধ-ক্ষেত্রটি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

১৪৬
খলীফার পদমর্যাদা

বিষয়টি হযরত খলীফাতুল মসীহকে অবহিত করা হলে তিনি ত্রীঠিদের
dেকে পাঠান। তারা বলেন, দীর্ঘ আলোচনা ও পরামর্শের পর সিদ্ধান্তটি নেয়া
হয়েছে যাতে সাহেবাদাদা সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। সাহেবাদাদা সাহেবকে
ডাকার জন্য পাঠানো হলো। আলাদার পর হযরত খলীফাতুল মসীহ তাকে জিজ্ঞেস
করলেন, “মিয়া, আমার স্পষ্ট দিকনির্দেশনার বিরুদ্ধারম করা হয়েছে এটি
কেমন কথা?”

তিনি বলেন, “আমি কোন অন্যায় করেছি বলে মনে পড়ে না।”

“আমি তেরার হাকিম ফয়লুদ্দীন সাহেবের সম্পতির বিক্রির বিষয়ে একটি
দিক নির্দেশনা দিয়েছিলাম, এর বিরোধী সিদ্ধান্ত কেন হলো?”

তিনি বলেন, “আপনার বিরুদ্ধারমের সাথে আমার কোন সম্পর্ক ছিল না।
আমি বারংবার আপনার নির্দেশনানুসারে কাজ করতে বলেছি এবং বলেছি,
আপনার কথা অস্তিত্বের বহির্প্রকাশ ছিল, সম্মতি নয়।”

তখন খলীফাতুল মসীহ অনেদের দিকে তাকিয়ে বললেন: “আপনারা বলেন
tিনি একজন বাক্কম মাতা! কিন্তু একজন কিশোর আমার কথা বুঝলো আপনারা
বুঝতে ব্যর্থ হলেন!”

তিনি তাদের দীর্ঘ নমুনহত করলেন, আনুগত্য কল্যাণের উৎস, তাদের
আচার-ব্যবহার পরিবর্তন করা উচিত অন্যথায় তারা খোদার রহমতের অম্যাগ্য
হয়ে যাবে।

হাকিম ফয়লুদ্দীনের ভাই সেই জমি ভাল মুল্যে ক্রয় করার জন্য প্রস্তুত
ছিলেন কিন্তু যখন তিনি খলীফাতুল মসীহ ও আলুমানের মধ্যকার মতপার্থক্য
সম্পর্কে অবগত হলেন তখন পিছিয়ে যান। এর ফলে আলুমানের কাছে হযরত
খলীফাতুল মসীহ নির্দেশনা মানা ছাড়া কোন পত্যাকা ছিল না। আলুমানের
কুচক্কি ট্রান্সফার হযরত খলীফাতুল মসীহর নিকট বারবার ক্ষমা চায় কিন্তু তাদের
আচরণে কোন পরিবর্তন আসেনি আর তার বিক্রী তাদের অপক্রাচার ক্রমশ
বাড়তে থাকে। ১৯০৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি ঘোষণা করেন, যদি ঐবাল
ফিতের মধ্যে তাদের আচরণে কোন পরিবর্তন না আসে তাহলে তাদেরকে
জামাত থেকে বের করে দেয়া হবে। এইচে পরিস্থিতিতে দলের নেতারা খলীফার
কাছে এক ধরনের ক্ষমার আবেদন পেশ করে কিন্তু বাহ্যত তাদের আচার
আচরণে কোন উন্নয়ন পরিলক্ষিত হয়নি।

১৪৭
হযরত মোল্লী নুরউদ্দিন (রা.) - খলীফাতুল মসীহ আউয়াল

১৯০৯ সনের ১৯শে অক্টোবর খলীফাতুল মসীহ তাঁর ঈদুল ফিতরের খুবাই পুনরায় তাদেরকে বিশদভাবে বুঝান। অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি তিনি বলেন:

“ঈদ ও সমৰোধা ছাড়া কোন জামাত গঠিতই হতে পারে না। যতক্ষণ তোমরা একতাব্দ্ব হবে না ততক্ষণ কোন উন্নতি করতে পারবে না।”

খলীফা হিসেবে হযরত আদম, দাউদ, আবু বকর এবং যারা তাদের বিরোধিতা করেছে তাদের কথা উল্লেখ করার পর তিনি দৃঢ় প্রত্যায়ের সাথে বলেন, এখন আমি আপনাদের খলীফা। যদি কেউ বলে যে নুরউদ্দিনের নাম হযরত মসীহ মাওুদ (আঃ)-এর ওল্লিয়ে উল্লেখ নেই তাহলে আমি তাকে উত্তর দেবো যে যাদের নাম আমি উল্লেখ করলাম তাদের কথাও পূর্বের কোন ভিক্ষামানীর উল্লেখ ছিল না।

পুরো জামাত সর্বসময়ভাবে আমাকে খলীফা হিসেবে গ্রহণ করছে। যে এর বিরোধিতা করবে সে আল্লাহর বিরুদ্ধে দাউদ্বারে। যেতাবে করবামে বলা হয়েছে, “যে মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য পথের অনুসরণ করবে আমারা তাকে সে পথেই ফিরিয়া দেব যে পথে সে ফিরে গেছে এবং আমরা তাকে জাহানামে নিক্ষেপ করবে।” (৪৪১৬)। এরপর মনোহোগ সঙ্ক্রান্তি শোন, যদি তোমরা তোমাদের অশীকার পরিপূর্ণ কাজ কর তাহলে তোমাদের হুদয় কপটতায় ভরে যাবে (৪৬৭৭)। আমি কেন আপনাদের এমন নষ্টতা করছি? কারণ হলো, আপনাদের কতক এমন আছে যাদের বোধ করতে চায় তারা দুর্বলতা দেখাচ্ছে। আমি মনে করি না যে তারা আমার চেয়ে ভাল জানে।

আমি খোদাকে সাফ্তী রেখে যতটা জের দেয়া সত্য পুরো জের দিয়ে বলছি, আমি সে পোনাক খুলতে পারি না যা তিনি আমাকে পরিয়েছেন। তিনি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে আমাকে নিযুক্ত করেছেন। যদি তোমরা এমনকি সমগ্র পৃথিবীর আমার বিরোধিতা করে তবুও আমি এর তোয়াকা করি না। তোমরা অশীকার পূর্ব কর তাহলে অচিরেই তোমারা দেখবে যে তোমরা কত উন্নত আর কত সফল। আমাকে একথাগুলো বলতে হবে। কোনো এগুলো বলার আবশ্যকতা রয়েছে। তাঁর প্রতিক্ষা রয়েছে যে তিনি আমার সাথে থাকবেন।

আমি তোমাদের বয়স্তাত নবায়ন করতে বলছি না, তোমরা তোমাদের প্রথম অশীকারের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকে তোমরা কপটতায় শিকার না হও। যদি তোমরা আমার ভিতর কোন বক্তা দেখতে দেয়া মাধ্যমে আমার সংশোধনের চেষ্টা কর। কিন্তু এ ভূল ধারণা পোষণ করবে না যে তোমরা আমাকে

১৪৮
খলিফার পাদমর্যাদা

কুরআনের কোন আযাত, কোন হাদিস বা হুরাত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর কোন উদ্ধৃতির অর্থ বুঝবে। যদি তোমাদের কেউ আমাকে নাপাই মন করে তার দেখা করা উচিত যেন আল্লাহ আমাকে পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নেন। এরপর দেখা উচিত, দেখা করে বিচ্ছেদ যায়।

আর একটি ভুল ধারণা ছিল ‘মারুফ’ শব্দের অর্থ সম্পর্কে। বলা হয়, বয়তীর অধীনে তাদের শুধু সে সকল বিষয়ে আনুগত্য বাধ্য করে যাকে তারা ‘মারুফ’ মনে করে। পরিশীল পুরুষ ছিল মহানবি (সাঃ)-এর প্রতি আনুগত্যের জন্যও ব্যবহার করেছে (৬০০১৩০)। প্রশ্ন হলো, এমন মানুষ কি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দুর্বলতায় কোন তালিকা প্রস্তুত করেছে? একইভাবে হুরাত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর ‘মারুফ’ বিষয়ে আনুগত্যের কথা কি বয়তীরের শতাব্দীর অস্তিত্বের করেছেন। আমি এসব কিছু ব্যাখ্যা করছি তোমাদেরকে ভাষা থেকে রক্ষা জ্ঞান।

আর বলা হয়, আমি সবাই সাথে মিলামেশা করি। যারা আমার হতে যাত্রাত করেছে তাদের জন্য আমার সৰ্বনিজ্ঞতার উদ্দেশ্যে বলেছি, তোমরা আমার নির্দেশনায় মনের বাধ্য আমি তোমাদের নির্দেশনা প্রচেষ্টা বাধ্য নই। আমার ভয় হয়, তোমরা না আবার পরীক্ষার পরিধির ব্যবহার হও। তোমাদের মধ্যে এমন না থাকা, বোমা বিষয়ক বা ভাবাবহ ভূমিকম্প থেকেও ভয়ানক বিষয়।

তত্ঃকে কোন প্রতিক্রিয়া বুঝত করা খুব সহজ কিন্তু তা প্রত্যাহার করা সুবিধায় কাঠামো কাজ। তোমাদের অংশগুলো বলে যে তারা আমার কর্তৃত্ব সীমিত করতে চায় না কিন্তু আমার স্বাধীনতার ক্ষমতার সীমারেখা নির্ধারণ করতে চায়। কিন্তু এরা তা যে তিনি হুরাত আরুব্বাদ এবং হুরাত মির্যা সাহেব থেকে বড়ো তো হতে পারে।

আমি আজকে আর একটি কাজ করতে যাচ্ছিলাম কিন্তু খোদা আমাকে বিরত রেখেছেন। আমি তাঁর প্রতি ও সিদ্ধান্ত অভিভূত। তোমাদের মধ্যে যাদের দুর্বলতা রয়েছে তাদের তা কাটিয়ে উঠার চেষ্টা করা উচিত। আমি তাদের জামাত থেকে সের করছি না, হয়ত তারা ভুল বুঝিয়ে কাটিয়ে উঠতে পারবে আর আমি তাদের এ সূর্যোগ থেকে বিনিময় করতে চাই না। আমি আপনাদের সদুপদেশ দিচ্ছি, সকল প্রকার হিংসা ও বিদ্রো পরিহার করুন। নিরাপত্তা বা ভয়ের সাথে কোন বিষয়ে দেখা দিলে সাধারণে তা বলে বেড়াবেন না। কিন্তু বিষয়ের নিপ্পিণ্ড হয়ে যাবার পর আপনারা তা প্রচার করতে পারেন।

১৪৯
হযরত মৌলিকী নূরউদ্দিন (রা.) - কহলীফাতুল মসীহ আউয়াল

আমি আপনাদেরকে বলছি, খেচায় হোক বা অনিচ্ছায় আপনাদেরকে একথানে মানতে হবে। যদি খেচায় সমর্পণ করেন তাহলে আপনাদের জন্য মঙ্গলময় হবে। আমি যা বলছি তা আপনাদের মঙ্গলের জন্য বলছি। আল্লাহ তাআলা আপনাদের এবং আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন এবং আমাদের সবার পরিণাম শুভ হোক।”

হযরত মসীহ মাওউদ আর এর নাম উল্লেখ না করে, বিদ্রোহীদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা নিবেদিত ছিল আহমদীদের সাথে অ-আহমদীদের পার্থক্যকে চেপে রেখে, মূলধারার মুসলমানদের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভের উদ্দেশ্যে তিনি ইসলামী চিকিৎসার যে দর্শন উপস্থাপন করেছেন, তা প্রচার করার উদ্দেশ্যে তারা যে রীতি সংস্কার করছে এতে জানাতের কিছু সদস্য প্রতিবাদ করেছে। এর ফলে যে ক্ষতি হয় তারা আঁচ করে হযরত মির্জা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ এ রীতির অন্তর্বিশ্বাস ও অন্তর্বীর রূপে হারানো করেছেন, ফলে জামাতের অন্যান্য সদস্যরা এর অনুসরণ পরিত্যাগ করে।

১৯১০ সালের ১৮ই নভেম্বর হযরত খলিফাতুল মসীহ একটি ট্রু ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় আঘাত পান এর মধ্যে তার দান করলার ক্ষত ছিল মোহাম্মদ। কয়েকদিন তার অবস্থা অক্ষতজনক ছিল। এমন অবস্থায় একদিন তিনি তার প্রধান চিকিৎসক ডাঃ মির্জা ইয়াকুব বেগ সাহেবকে বললেন, “মৃত্যু কে আমি গণ্য করি না। যদি আপনি মনে করেন আমার অবস্থা অক্ষতজনক তাহলে আপনি তার তাই বিশ্বাস করিতে পারেন যে আমি কিছু দিকনির্দেশনা নিষিদ্ধ করাতে পারি।” তিনি তাকে নিজের দেন যে তিনি বৃদ্ধি করতে যদি তার অনুষ্ঠান বিভজনক রূপ ধারণ করে তাহলে তিনি তাকে সে বিষয়ে সতর্ক করবেন। পরিত্যাগ তার কাছ থেকে বিদায় দিলেই তিনি মৌলিকী মোহাম্মদ আলী সাহেবের কক্ষে তার সহকর্মীদের সাথে মিলিত হন আর তারা সকলে পরামর্শ করে তাকে (ইয়াকুব বেগ) হযরত মির্জা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ সাহেবকে ডাক উদ্দেশ্যে পাঠান। তারা আসার পর খাজা কামাল উদ্দিন নিম্নোক্ত ভাষায় চলানি পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন: “আপনাকে আমরা কেটে দিলাম কারণ আমাদেরকে বলা হয়েছে, হযরত মৌলিকী সাহেব মারা গেলাম অনধীন এবং দুর্বল। আমরা যারা লাহার থাকি তাদেরকে যেহেতু হবে। আমাদের জন্য এখানে আর দীর্ঘ সময় অবস্থান করা সত্য নয়। তাই আমরা এককে পরামর্শ করে কিছু বিষয়ে মতের ভাবে পৌঁছবে চাই যে কেন দৃষ্টান্তের মোকাবেলা করা যায়। আমরা আপনাকে নিজেদের দিষ্ট, আমাদের

১৫০
খোলার পদমযাদা

কায় খোলার হওয়ার ইচ্ছা নেই, আর মোহাম্মদ আলী সাহেবেরও নেই।”

তখন মোহাম্মদ আলীও অনুরূপ একটি মতবাদ করেন আর খাজা কামালউদ্দিন বলেন: “আপনি ছাড়া আমরা কাউকে খোলার হওয়ার যোগ্য মনে করি না এবং আমরা সবাই একমত যে আপনারই খোলার হওয়া উচিত। কিন্তু আমরা অনুরূধ করবো, লাহোর থেকে আমাদের না আসা পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত যেন নেয়া না হয় পাছে তড়িৎ করে কেউ এমন কোন পাদক্ষেপ নিয়ে বসে যা সমস্যার কারণ হতে পারে। আমাদের আসা পর্যন্ত অবশ্যই অপেক্ষা করা উচিত।”

সাহেবযাদা সাহেব কোন কিছু না বলে তার কথা গুলোনে কিছু ‘তাদের কেউ খোলার হতে চায়না শুধু তিনি খোলার হওয়ার গতিতে আগ্রহ রাখেন’ এ মনোভাবের প্রতি তাঁর চরম ঘ্রাণ হলো। খাজা সাহেবের কথা বলেন তিনি (সাহেবযাদা সাহেব) বললেন, “আমি এক খোলার জীবনধারণ পরবর্তীতে কে খোলার হতে এ নিয়ে আলোচনা করার একই পাপ মনে করি। কে খোলার হবে সে সিদ্ধান্ত তা দূরের কথা।” একথা বললে তিনি তাদেরকে তাদের মতোর মধ্যে ছেড়ে চলে গেলেন।

হযরত খোলার মসীহর কপালের ক্ষত যা অনেকটা স্থায়ী ক্ষতে রূপ নেয়, তাঁ খুব ধীরে ধীরে শুক্লা হচ্ছে। ১৯১১ সনের ১৯শে জানুয়ারী রাতে তিনি হস্তান্তরের কিছুটা চাপ অনুভব করলে কিছু লেখার জন্য কাগজ কলম আনান। একটি কাগজে মাহমুদ আহমদ লিখেন এবং খাঁচা ছুটিয়ে তা বাংলা করে দেন আর উপরে আরো এবং নিচে উর্দ্ধে লেখেন: “আবু বকর (রাও)-এর দুঃখে অনুসরণ করে তাঁর হতে বয়নাত কর যার নাম ভিতরে লেখা আছে।” তিনি খানটি তাঁর প্রিয় শিশু শেখ মাহমুদ ইতুমকরকে দিয়ে বলেন: আমার মৃত্যুর পর এতে উল্লেখিত নির্দেশ অনুসরণ হওয়া উচিত।

কয়েক দিন পর, তাঁর আশেপাশের উন্নতি হলে তিনি খানটি চেয়ে পাঠান এবং ছিড়ে ফেলেন। বিভিন্ন ঘটনা চর্চা করতে গিয়ে তাঁর এ নির্দেশনার কথা মোহাম্মদ আলী এভাবে বুঝাইয়ে করেন:

“আমি সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানি যে ১৯১১ সনের ওসীপ্ততে তিনি শ্রীমান মোহাম্মদ সাহেবের নাম উলেখ করেন।”

৫৫১
খিলাফত

খলিফার দায়িত্ব হযরত মসীহু মাওউদ (আঃ) তাঁর ওদীয়তে নিম্ন লিখিতভাবে বর্ণনা করেছেন: “খোদা তাআলা যখন থেকে পুরুষবীতে মনব সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকে সর্ব্বদা তিনি এ রীতি প্রকাশ করে আসছেন যে তিনি তাঁর নবী ও রসূলদের সাহায্য করে থাকেন এবং তাদের বিজয় দিয়ে থাকেন। যেমন, তিনি বলেন: “আলাহুর এটি সিদ্ধান্ত: “আমি এবং আমার রসূল অবশ্যই জয়যুক্ত হবে” (৫৮৪২২)। তাঁদের বিজয়ের অর্থ হলো, পুরুষবীতে খোদার ইছার বাত্তি যায় এবং কেউ যেন এর বিরুদ্ধে দাড়াতে না পারে। নবী ও রসূলদের উদেশ্য এটিই হয়ে থাকে। তিনি শক্তিশালী নিদর্শনের মাধ্যমে তাদের সত্যতা প্রকাশ করেন আর যে সত্যতা তাঁরা পুরুষবীতে প্রসার করতে চান এর সীমা তাদের হাতেই বন্ধ করেন কিন্তু তাদের হাতে একে উৎকর্ষ দেন না। তিনি তাদেরকে এমন সময়ে মৃত্যু দেন যখন তাদের ব্যর্থতার আশঙ্কা থাকে আর এভাবে শরুকদের হাসি, তির্কফার ও তুষ্টতাচিলের সুযোগ দেন। কিন্তু তাদের হাসি-ঠাট্টা ও তুষ্টতাচিলের পর তিনি তাঁর শক্তির একটি ভিন বিকাশ ঘটান আর এমন উপকরণ সৃষ্টি করেন যার মাধ্যমে বেসরক লক্ষ্য কিছুটা অস্পৃষ্ট ছিল তা উৎকর্ষ লাভ করে। সংক্ষেপে তিনি দু ঘরনের শক্তি প্রদর্শন করেন। প্রভাবী তিনি সর্বাপেক্ষায় নবীদের মাধ্যমে তাঁর কুদরত প্রকাশ করেন, দীনীগত এক রসূলের ইতিহাসের পর তাঁর জামাত যখন সমস্তের সমৃদ্ধি হয় আর তাঁর শক্তির শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং মনে করে যে এখন দাবীকারকের উদেশ্য ব্যাহ হতে যাচ্ছে এবং তাঁর জামাত ধর্ম হয়ে যায়; স্বয়ং জামাতের সদস্যরা দিশাহরা হয়ে যায় এবং তাদের মনোমাল ভেঙে যায় আর অনেক দুর্ভাগ্য সত্যি থেকে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবে। তখন খোদা তাআলা পুনরায় তাঁর অসাধারণ শক্তি প্রদর্শন করেন এবং পুষ্ট জামাতকে পুনরায় দাড়ি করান। সুতরাং শেষ পর্যন্ত যে ধৈর্য ধারণ করে সে তাঁর নিদর্শন দেখে। দৃষ্টতত্ত্বকে হযরত আবুর বকর সিদ্দীকের সময় এমনটি হয়েছে। মহানবী (সা:)-এর মৃত্যুবোধক অবশ্য মৃত্যু মনে করা হয়েছে। অনেক অজ্ঞ মরবাশী মূর্তিতাদ হয়ে গেছে আর সাহাবারা দুঃখের আতিশয়ে উদ্দাস্ত হয়ে যান। তখন খোদা হযরত আবুর বকরকে দাড়ি করিয়ে দ্বিতীয়বার নিজ কুদরত প্রদর্শন করেন আর পতনমূখ ইসলামকে নতুনভাবে শক্তি যোগান। এভাবে নিজ এ প্রতিক্রিয়া তিনি রক্ষা করলেন, “তিনি তাদের সেই
খিলাফত

ধর্মকে সৃষ্টি দান করবেন যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তিনি অবশ্যই ভয়-মৌলিতির পর তাদের নিরাপত্তা দান করবেন” (২৪৪৫৬)। হযরত মুসা (আঃ)-এর সময় একই ঘটনা ঘটেছে যখন তিনি পবিত্র ভূমির দিকে আসতে গিয়ে জাতিকে প্রতিশীঘ্রতি মোতাবেক সেখানে পৌঁছানোর পূর্বে পথিমধ্যে ইতেমক করেন। এর ফলে বনী ইস্রাইলের উপর শোকের ছায়া নেমে আসে। তওরাত অনুসারে হযরত মুসার আকারমিক ও অকাল মুহুতে শোকে তারা মুহুমানচি বিল আর চল্লিশ দিন কানারকাটি ও বিলাপ করতে থাকে। একইভাবে হযরত ঈসা (আঃ)-কে কৃপ্ষে দেয়ার সময় তার শিখরা বিক্ষোভ-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং তাদের একজন মুরতাদও হয়ে যায়।

অতএব হে বর্ধমণ! যেহেতু আদিকালই হতে আল্লাহ তাঁর বিধান এটাই যে, তিনি দুটি শক্তি প্রদর্শন করেন যেন বিরূপবাদিরদের দৃষ্টি মিথ্যা উদ্দালকে ব্যর্থতায় পর্যবেক্ষিত করা যায়। সুতরাং এখন এটাই সত্যরূপ নয় যে খোদাই তাঁর তার চিহ্নিত নিয়ম পরিহার করেন। সুতরাং আমি তোমাদেরকে যে কথা বলছি তাতে তোমরা উৎসুক ও চিন্তিত হয়ে না। তোমাদের চিন্তা যেন উৎসুক না হয়। কারণ তোমাদের জন্য বিদ্যুত কুদরত দেখাও আবশ্যক আর এর আগমন তোমাদের জন্য শ্রেষ্ঠ। কেননা, তা মূর্তি। এর ধারবাহিকতা কিয়াবাহিত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। সেই বিদ্যুত কুদরত আমি না যাওয়া পর্যন্ত প্রকাশিত হতে পারে না। যখন আমি চলে যাব খোদাই তোমাদের জন্য নে বিদ্যুত কুদরত প্রকাশ করবেন যা চিনতাল তোমাদের সাথে থাকবে।”

সুতরাং খলিফার কাজ হলো প্রভুর আগমনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের কাজকে বেগবান করা। অতএব হযরত খলিফতুল্ল মসীহুর প্রথম কাজ হলো মসীহু মাওজুদ (আঃ)-এর সময় যে সকল কাজের পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে সে সকল কাজকে পুনর্গুণিত করা।

হযরত মসীহু মাওজুদ (আঃ) ১৯০৬ সনে আহমদীয়া মাদ্রাসার নামে একটি ধর্মীয় মাদ্রাসাপ্রতিষ্ঠা করেন যার উদেশ্য হলো উচ্চ পর্যায়ের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান, এমন মোবালেগ্র ও আলেম প্রশিক্ষণ, যাদের উপর দুর্গুম্রাটে জামাতের টপরুল এবং মতাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রচারের দায়িত্ব নান্দ করা যেতে পারে। অর্থাভাবে প্রাথমিক পর্যায়েই এর অপরিমেয় স্থিতিতে হয়ে যায়। ১৯০৮ সনের জুনে হযরত খলিফতুল্ল মসীহু প্রতিষ্ঠানটিকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সাহেববাদা মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, মৌলভী মোহীম আলী, নবাব মোহাম্মদ

১৫৩
হয়রত মৌলভী নূরউদ্দিন (রা.) - খলিফাতুল মসীহ আউয়াল

আলী খান এবং খলিফা রশিদ উদ্দিন সাহেবের সময়ে একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটি একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং এর কোন কোন অংশ তৎক্ষণাৎ বান্দাবানের পরামর্শ প্রদান করে জামাতের কাছে আর্থিক সাহায্যের অনুরোধ করেন। এরপর এ প্রতিষ্ঠা একটি জামেয়ায় রূপ নেয় যেখান থেকে ভিত্তি প্রাঙ্গন বিশেষ বিভিন্ন অঞ্চলে সত্য ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

হয়রত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর স্পন্দ ছিল, জামাতের মধ্যে অসাধারণ গুরুত্ব ও যোগ্যতাসম্পন্ন কমপক্ষে একরণ এমন সদস্য থাকা প্রয়োজন, যারা আল্লাহর তাআলা, জামাত এবং হয়রত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর সমর্পণে যেসব নিষ্ঠা, যুক্তি ও প্রমাণ প্রকাশ করেছেন সেই সম্পর্কে অবহিত থাকবেন যেন সকল শক্তিতে সমালোচকদের বিভিন্ন আপতির সর্বোচ্চ উত্তর দিতে পারেন। ইসলাম সম্পর্কে আর্য এবং যুথিত গোড়ারা। যেসব সন্দেহ সৃষ্টির হীন চেষ্টা করে তারা যেন প্রত্যেক সত্যিকারীকে তাদেরকে মুক্ত করার এবং ইসলামের সৌন্দর্যবালি সত্যজ্ঞানকারী বর্ণনা করার যোগ্যতা অর্জন করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি ১৯০১ সনের ৯ই সেপ্টেম্বর একটি ঘোষণা পাত্র প্রকাশ করেন যে জানী-বুকামান এবং আলেমদের একটি শ্রেণী তাঁর বই-পুস্তক ও পাঠ করে ২৪শে ডিসেম্বর পরীক্ষা দেয়ার জন্য যেন কাদিয়ান আসন। এ পাঠ এবং পরীক্ষা প্রত্যেক বছর হওয়া বাঙালী। যে কোন কারণে এর উপর আর অনুশীলন অব্যাহত থাকেনি। ১৯০৮ সনের জুলাই মাসে হযরত খলিফাতুল মসীহ তীব্রভাবে অনুভব করান যে এমন কতক মোবালেগ সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক যারা ধর্মীয় জান গৌরবন্ধের বৃত্তিপূর্ণ পদত্তি হবেন যারা মূল্যায়ন সকল প্রাপ্তে ইসলামের বাণী পৌঁছবেন। যখন তিনি এটি নিয়ে চিত্ত তুলেন তখন ১৬ই জুলাই দৈবক্রমে তাঁর সামনে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯০১ সনের ঘোষণা এলো। এতে তিনি আবেগ প্রকাশ হয়ে পড়েন। তিনি তখনই মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর ঘোষণাটি ব্যাপকভাবে সকল জামাতে প্রচার করার নির্দেশ দিলেন আর ১৯০৯ সনের ২৪শে ডিসেম্বর থেকে আরম্ভ করে প্রতি বছর একটি নিদর্শন বই-এর উপর পরীক্ষা নেয়া উচিত। তখন থেকে এভাবে জামাতের সকল পর্যায়ে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বইয়ের ব্যাপক অধ্যয়ন অব্যাহত থাকে।

১৫৪
বিখ্যাত

হযরত মসীহু মাওউদ (আঃ)-এর ইস্তেকালের পর বিরোধীদের পক্ষ থেকে
তাঁর বিভিন্ন দাবী সম্পর্কে সমালোচনা ও আপত্তির ঝড় উঠে। জামাতের কর্তক
পদ্ধতি ও আলমে এ ধরনের আপত্তির খনন করে লিফলেট ও প্রবন্ধ লিখেছেন।
হযরত খেলীফাতুল মসীহু মাওউদ (আঃ)-এর ইস্তেকাল শিরোনামে
একটি লিফলেট রচনা করেন। তিনি পদ্ধতি করুণার আয়ত্ত 'মরিয়মের পুত্র
মসীহু একজন রসূল ছাড়া আর কিছুই নন, তাঁর পূর্বের সকল রসূল ইস্তেকাল
করেছেন' (৫৪৭৬) 'এবং মুহাম্মদ (সা:) একজন রসূল আর আর কিছুই নন তাঁর
pূর্বেকার সকল রসূল গত হয়ে গেছেন' (৩৪১৪৫) এর ভিত্তিতে এ প্রবন্ধ রচনা
করেন।

এ লিফলেটে খোদা তাতালা যে হযরত মসীহু মাওউদ (আঃ)-এর
ইস্তেকালের পর জামাতের সদস্যদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করে জামাতকে
ঘটিক হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন, এর জন্য তিনি খোদা তাতালার মহিমা
কীর্তন করেন। তিনি বলেন:

"হে প্রিয়গণ! চিন্তা কর, কিভাবে সবশক্তিমান ও মহামহিমানিত খোদা
হযরত মসীহু মাওউদ (আঃ)-এর ইস্তেকালের পর উত্তর হতে দক্ষিণে এবং পূর্ব
থেকে পচিমে গোটাজামাতের মাঝে ঐক্য ও সমকালীন প্রেরণা সংগ্রাম
করেছেন। হে খোদা! যে মহান অনুমান তুমি করেছ এর জন্য আমার প্রাণ
নিবেদিত। কেবল একজন নয় বরং হযরত মসীহু মাওউদ (আঃ)-এর চার ছেলে
এবং এক পৌত্র, একইভাবে তাঁর সুখোচ্ছ জামাতা যার নামে মুহাম্মদ এবং আলী
যুক্ত রয়েছে, অনুরূপভাবে তাঁর শ্রদ্ধারো, যিনি পিতৃসম শ্রদ্ধাভাজন;
পুরো জামাত
এবং যাদের কথা আমি উল্লেখ করেছি সকলেই এজনের হতে বয়ানাত করেছেন
যিনি তাদের পরিবারভূত নয়।

এখন তাঁর বিরোধীদের মিটিং ও উল্লাস করতে দাও। তারা ঐশী শক্তি ও
সাহায্যের প্রথম শক্তিশালী বিকাশ দেখেছে এখন তাদেরকে দ্বিতীয় কুষ্টরের
বিকাশ দেখতে দাও। এখন পর্যন্ত এ বৃক্ষের রক্ষণাবেক্ষণ শুধু খোদার দায়ী
হয়েছে। আমাদের সংখ্যা এবং কমিয়ে সংখ্যা সত্ত্বেও একই শক্তির বলে এ বৃক্ষ
বাড়াতে এবং ফুলে-ফুলে সুখোমিল হবে।

হে আমাদের তুল্যপ্রবর্তন বিরোধীরা! তোমাদের কিছুটা ধৈর্য প্রদর্শন করা
উচিত ছিল। তোমরা খোদার প্রথম শক্তির বিকাশ দেখেছে। তোমাদেরকে তাঁর

১৫৫
হযরত মৌলভী নূরউদ্দীন (রা.) - খলিফাতুল মসীহ আউয়াল

শক্তির দ্বিতীয় বিকাশ দেখার অপেক্ষা করা উচিত ছিল। কিন্তু দৈর্ঘ্য পুরোকালে আল্লাহ আমাদের জন্যই রেখেছেন। আল্লাহর মূল নিয়ম বিবিল আলামীন।

তোমারা কি দেখেন যে আমাদের ইমাম ইতেকাল করেছেন আর আমার দৈর্ঘ্যের সাথে সে দুর্ঘটে মোকাবিলা করেছি। কিন্তু তোমারা আমাদের দুঃখে, কুশপুতলিকা নিয়ে কুচকাওয়াজ আর হাসিঠারুর মাধ্যমে সমবেদনা প্রকাশ করেছ। যারা বিকৃত-প্রতিবাদ করেছে তোমাদের প্রফেসর ও সুকিয়া তাদেরকে উমাতের সেবক উপাধিতে ভূমিত করেছে। বালো-মন্দ মানুষ পৃথিবীর সর্বত্র মারা যায়, কে কোথাও পড়ে কি যে মুসলমানরা কখন থেকে এভাবে সমবেদনা প্রকাশ আরও করেছে? এমন অপকর্ম আরও করে কে 'মন্দ রীতি সূনাকারা' উপাধি পেয়েছে? লাহোরের মুসলমানরা এ সময় এমন হে চে করে যে সম্পর্কে আমার পূর্বে কোন ধরণের ছিল না। আমার আশঙ্কা ছিল, আমরা টেকশনে পৌঁছতে পারবো না। কিন্তু অক্ষুন্নভাবে আল্লাহ দুঃখের নির্দেশনা আমাদের নিরাপত্তাকে পুশিত পাঠিয়েছেন। সরকারের প্রতি সক্রিয়তার হ্রদয়ে কোন সমস্যা ছাড়াই আমরা টেকনে বসতে পেরেছি।

সকল প্রশংসা আরাহর যে হযরত মির্য সাহেব ছয় সাত রেখে গেছেন। যদি তাদের একজন বা তাদের সত্তাদের কেউ সে দুর্ঘট প্রত্যেক মহান ইমানুয়েল হন, যার জন্যের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তাহলে তখন তুমি বা তোমার বংশধরগণ পৃথিবীকে কিভাবে মুখ দেখাবে?

তখনও হযরত সাহেবের মির্যা বন্ধুর উদ্দীন মাহমুদ আহমদের বয়স বিশে পৌঁছেছি। 'মুসারিকের জ্যাচিনকে কে নির্বাণিত করতে পারে? তিনি এ শিরোনামে একটি পুটিকা রচনা করেছেন। এটি পড়ে হযরত খলিফাতুল মসীহ মৌলভী মোহাম্মদ আলীকে বলেন, হযরত মসীহ মাওদ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে উপাধিত আপতির উত্তর আপনি এবং আমি উত্তরে লিখেছি কিন্তু মির্যা মাহমুদ আহমদ আমাদের উভয়ের তুলনায় এগিয়ে গিয়েছেন। তিনি সে পুষ্টিকার একটি কপি রেজিস্ট্রি ডাকে সৌদী মুহাম্মদ হুসেন বার্লোয়ার পাঠান এবং মন্ত্রম করেন, আপনি বলেছেন, মির্যা সাহেবের সত্তারা ডালো নয়। আমি তাদের একজনের লেখা একটি পুষ্টিকা আপনাকে পাঠাচ্ছি। যদি আপনাদের কারা সত্তার এমন কিছু লিখে থাকে তাহলে এর কপি আমাকে পাঠান।'

হযরত খলিফাতুল মসীহ বহুবিধ অনন্য গুনাগুনীর শুধুমাত্র দুটি এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনি হযরত রসূলের করিম (সা:)-এর সেই

১৫৬
খিলাফত

চলিশটি হাদিস বর্ণনাকারীরদের একজন যা মৌখিক রেওয়ায়াতের অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতায় শত শত বছর ধরে চলে আসছে। তিনি তার নিজের পালায় সকল রেওয়ায়াতকারীর নামসহ অন্যান্যের মধ্যে হযরত রাশীন আলী এবং মীর মোহাম্মদ ইসহাক সাহেবের কাহে তা বর্ণনা করেন।

তিনি এমন এক সময় খানা কা'বার তওয়াফ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন যখন অন্য কেউ সাথে ছিল না।

তিনজন যুবকের বয়সকারের প্রাকালে যাদের দুজন চিকিৎসা শাস্ত্রের হাত ছিলেন, নসীহত করতে গিয়ে হযরত খলিফাতুল মসীহ বলেন, “যে বয়সআত করে, সে যে যেহেতু বহুব্যক্তিত্বের দাসত্ব বর্ণণ করে। পাষাতের মানুষ বলেন, মানুষ জনুজগতভাবে স্বধীন আর দাসত্ব একটি পাপ। কিন্তু আমি তোমাদের সমুদ্রে একটি ঘটনা বর্ণনা করতে চাই। আমার একজন আধ্যাত্মিক উষ্ণ ছিলেন মহাসমানিত আবুল মুন্নাদে। তিনি মদীনায় বসবাস করতেন। সিরিয়া, মিসর, ইউরোপ, এবং রাশিয়ার মত দূর-দূরতের বিভিন্ন দেশের মানুষ তার হাতে বয়সআত করেন। আমি প্রায়শ তাঁর কাছে যেতাম কিন্তু মনে করতাম যে পাপ-পুণ্য মেহেতু শাস্ত্রে বিস্তারিত বর্ণিত আছে, আর আমি আমার পর্যায়ে এবং শেষ করছি তাই করে। হাতে আমার বয়সআতের কোন প্রয়োজন নেই। আমি আচর্চ হতাম, এটা মানুষ বয়সআত করে কেন? এক পর্যায়ে আমি ভাবলাম, তার হাতে পরীক্ষামূলকভাবে বয়সআত করা দরকার। যদি কোন লাভ না হয় তাহলে আমি তাকে তাপ করবো। সুতরাং সে ইচ্ছা নিয়ে আমি তাঁর কাছে গেলাম। কিন্তু আমার বিবেক আমাকে দশন করলো যে বয়সআত করার পর আমি ফিরে আসবো। এটি অজ্ঞতা বিষয় এবং আমি বয়সআত না করেই ফিরে এলাম। পরে পুনরায় বয়সআতের সিদ্ধান্ত নিলাম। যখন আমি তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, বয়সআত করলে আমার কি লাভ হবে? তিনি বললেন, বয়সআত করলে অবশ্যই কথা বাঁধব জানে পরিণত হয় এবং শোনা বিষয় দেখার দিকে যোগ নেয়। আমি তাঁর কাছে অনেক কিছু শিখেছি তার অধীনে থেকে অনেক আধ্যাত্মিক উন্মুক্ত করেছি।”

রমখানের শেষ দশদিন হযরত খলিফাতুল মসীহ সাহাবীদের একটি বড় শ্রেণীকে নিয়ে ইতেকাফে বসেন যাদের মধ্যে হযরত সাহেবযাদি মির্জা বনীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ ছিলেন। পাঁচ বেলার নামাজ ছাড়া সকল থেকে সম্ম পর্যন্ত সকল সময় তিনি সাহীদের উদ্দেশ্যে করআলের দরস দেয়ার কাজে ব্যায় করতেন। তিনি কর্ধন অন্সার ব্যাখ্যা করতেন, সূক্ষ্ম বিষয়ালীর প্রতি মনোযোগ
হযরত মৌলিকী নূরউদ্দিন (রা.) - খলিফাতুল মসীহ অউয়াল

আকর্ষণ করতেন এবং প্রশ্নের উত্তর দিতেন আর এভাবে প্রত্যেক দিন কুরআনের এক দশমাঙ্ক শেষ করতেন এভাবে রমযানের শেষ পর্যন্ত পুরো কুরআনের তফসীর শেষ করেন। তাঁর বয়স, স্বাস্থ্য এবং বোঝার কষ্ট যদি সামনে রাখা হয় তাহলে দুঃখ দৈহিক শুরুর নির্দেশ এটি অনেক কষ্ট সাধ্য কাজ ছিল। এটি খেদার পবিত্র বাণিজ্য জন্য তাঁর প্রবল ভালবাসা ও প্রাণচালী ঐক্যকর্তার প্রমাণ।

১৯০৮ সনের শরৎকালে দক্ষিণ ভারতের হায়দ্রাবাদ শহর প্রবল বন্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় আর মানুষের ভোগাত্মক চরম পর্যন্ত পৌছে। শহরের সমস্ত বাড়ির বিরোধ হয়ে যায় এবং সবচেয়ে সহস্র মানুষ হর্ষীকে নিচে চাপা পড়ে প্রাণ হারায়। ক্ষতিগ্রস্থ শহরে জামাতের খবর-খবর নেয়ার জন্য হযরত খলিফাতুল মসীহ বেশ কয়েকটি রেজিষ্ট্রি চিঠি এবং জুরী টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন কিন্তু বিভাগজাতি অনিচ্ছিত পরিহিতির কারণে কোনটাই পৌছানো সম্ভব হয়নি যার ফলে কোন উত্তরও আসেনি। তখন তিনি খবর-খবর নেয়ার জন্য হাফেয আরু সাহিদ আরবেক দৃষ্টি হিসেবে প্রেরণ করেন। জামাতের সদস্যদের কাছে তাঁর যে উদ্দেশ্য ও সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে আর এর উত্তরে হায়দ্রাবাদ জামাতের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা পূর্ণ যে পত্র তিনি পেয়েছেন তা থেকে স্পষ্ট হয়, তিনি জামাতের সদস্যদের কাছ পরিহিতভাবে ভালবাসতেন অার তিনি তাদের মসলায় ও নিরাপত্তায় জন্য কোন উৎক্ষেপণ। পর্যটক এভাবে লিখে হয়েছে: 

“বিসমিল্লাহির রহমানির রহম! নাহামদুখু ওয়া নুসারি আলা রসূলিহিল কারীম। মহাসমানিত হযরত খলিফাতুল মসীহ ও মাহদী, আমিরেল মুমিনন হযরত নূরউদ্দিন, খোদা তালা তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট কল্যাণ ও মসলারাজ্যকে আমাদের জন্য স্বায়ি করূন।

আসুসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুর্তুহাই ওয়া বারাকাতুহ। হযরত খলিফাতুল মসীহুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ভাষা হায়দ্রাবাদ জামাতের নেই যার পরম দয়া ও চেয়ে প্রদর্শন করত আমাদের খবর-খবর নেয়ার জন্য এমন একটি সময়ের কয়েকটি রেজিষ্ট্রি পত্র ও টেলিগ্রাম প্রেরণ করেছেন যখন দক্ষিণের মানুষ সেভাবে বিপদগ্রস্থ ছিল, যার চিঠি কুরআনে এভাবে অংশ করা হয়েছে: 'সেদিন মানুষ পলায়ন করতে তার ভাবা, মাতা, পিতা, বাবা ও পূর্বতন হতে, (৮০:৫৪-৩৭) দুর্গতির মাত্র বিশ্বাস্থল পরিষ্ঠিতির করায় আর সকল মামলা ভার্ড আমাদের কাছ পৌছনি। এর ফলে উত্তর দেয়ার মুখে ছিল না। কিন্তু আদর্শী সহানুভূতির কারণে আমরা দূরে বসবাসকারী, সমস্যা কবলিত
লোকদের দেখাশোনা করার জন্য আমীরুল মুমিনীন এমন দীর্ঘ একটি সহরে নিজ খরচে হাফেজ আরু সাঙ্গিদ আরবের মত নিষ্ঠাবান কোন বক্তব্যে স্বর্ণালি নির্ধারণ করেন নি। অমৃপ্ততা সত্ত্বেও আরব সাহেব এখানে আসার পর থেকেই তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করেছেন আর প্রত্যেক আহমদী ভাইকে সাত্ত্বিক প্রদানের মাধ্যমে এটি প্রমাণ করেছেন যে তাঁর মধ্যে একজন আহমদীর সকল সুমহান নৈতিক গুণাবলী রয়েছে।

আরব সাহেব হযরত খলিফাতুল মসীহুর শেখমাযখা এ বাগিতে পোঁচিয়েছেন যে এ অপ্রত্যাশিত দুর্যোগের কারণে কোন পরিবারের সদস্যদের যদি স্বর্গপোষণের ব্যবস্থা না থাকে আর তাঁরা কাদিয়ান আসতে চায়, তাহলে তাদের অন্তঃবিলুপ্ত পাঠিয়ে দেয়া উচিত। এখানে তাদের যথাযথ মত নেয়া হবে আর তাদেরকে ভূমণ খরচে দেয়া হবে। হযরত খলিফাতুল মসীহুর নায় মহান ব্যক্তিত্বের কাছে এই আশাই আমাদের ছিল আর খলিফার কল্যাণময় সত্তার কাছে এর কম কিছু আশাই আমরার করব। কিন্তু হযরত এবং জামাতের অন্যান্য সমাজটি ব্যক্তিবর্গ জেনে অবশ্যই আনন্দিত হবেন, যদিও জামাতের অধিকাংশ সদস্যদের যদি এমন স্থানে অবস্থিত যেখানকার অধিকাংশ যদি মারাত্মকভাবে ক্ষতি প্রাপ্ত ও পুরোপুরি ধুলো হয়ে গেছে আর যেখান থেকে হাজার হাজার মৃত দেহ উদ্ধার করা হয়েছে কিন্তু আল্লাহ তাইলার ফয়লে কোন আহমদী এবং কোন আহমদীর কোন আতিষীতে এ ভয়াবহ দুর্যোগে প্রাণ হারায় নি। সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি করিম প্রদর্শন করেছেন।

পরিষেবার হাযরারবাদ জামাতের সদস্যরা হযরতের কাছে সর্বদা অনুরোধ করছে যে আপনি অনুগ্রহপূর্বক হাযরারবাদ জামাতের জন্য দোয়া করবেন যেন কৃপালু খোদা দুর্বোধী এই দুর্বল জামাতের ইমামকে পরিপূর্ণ দান করেন আর পরীক্ষার সময় তাদেরকে দূর্লভ দান করেন এবং তাদের আচার ব্যবহারকে সংশোধন করেন। অমরা যেন নিজেদের মাঝে পরিত্যাগ পরিনতি আমাতে পারি এবং অন্যদের জন্য উন্নত দৃষ্টি স্থাপন করতে পারি। যেহেতু এই দৃষ্টিকোণে আমাস থেকে অমরা বিদায় নেই তখন আমরা যেন জামাতের সত্যিকারের বিশ্বাসী, অনুগ্রহ ও স্থিতিবান লোকদের মাঝে গণ্য হতে পারি, আমরান।" ৯৩

১৯০৮ সনের ৩০ শে অক্টোবর শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী আল্লাহকামে লিখেছেন: দুর্কখিয় হযরত খলিফাতুল মসীহুর তাঁর সময় খোদার শিক্ষার বাস্তবায়ন এবং তাঁর সৃষ্টির সেবায় কাটান।

১৫৯
হযরত মৌলভী নূরউদ্দিন (রা.) - খলিফাতুল মসীহ আউয়াল

হযরত মসীহু মাওউদ (আঃ)-এর যুগে হযরত মৌলভী নূরউদ্দিন মসজিদে মৌলভীকে নামায় পড়াতেন। হযরত মৌলভী আবদুল করিম যখন স্থায়ীভাবে কাদিয়ান স্থানান্তরিত হন তখন তাকে মসজিদে নামায় পড়াতে বলা হয়। তাঁর ইতেমাদের পর অনিচ্ছায় সত্যেও হযরত মৌলভী নূরউদ্দিনকে পুনরায় মসজিদে মৌলভীকে নামায় পড়ানো আরাম করতে হয়। খলিফা হওয়ার পর থেকে অব্যাহত ভঙ্গ খাইখ নিয়ে তাকে নামায় পড়তে হয়েছে।

ফজরের নামায়ের পর তিনি কয়েকজন মহিলাকে কুরআন শিক্ষা দিতেন। এরপর কাদিয়ানের বাহির থেকে আগত রোগীদের জন্য একটি তিনি তাঁর ক্রিনিকে বসতেন। এরপর সাহেবযাদা মির্জা বন্দীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ এবং মীর মোহাম্মদ ইসহাক সাহেবকে পড়তেন। কুরআন শিক্ষার পাশাপাশি হাদিস এবং ফিকাহ শাস্ত্রের নীতিও পড়ানো হতো। আর এতে যে কেউ অংশ গ্রহণ করতে পারতো।

আমি নিজ চোখে দেখেছি যে তাঁর কাছে যখন চিঠি আসতো তিনি নিজ হাতে প্রত্যেকটি চিঠি নিতেন আর লেখার জন্য দেওয়া করতেন। এ কাজটি এত ব্যস্ত ছিল যে প্রত্যেক নামায় ও কুরআন কৌশলের পর তিনি তাঁর হাতে বেশ কিছু দেয়ার চিঠি নিয়ে পড়তেন এবং লেখক যে বিষয়ে দেওয়া চাইতেন তা উল্লেখ করে দেয়া করতেন। খলিফা হওয়ার পূর্বে জামাতের সদস্যদের সাথে তাঁর ভাইয়ের সম্পর্ক ছিল আর সেই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি তাদের জন্য দেওয়া করতেন। এখন তিনি তাদের আধ্যাত্মিক পিতা, আর সযহ জানে যে, এক পিতা তাঁর সত্তাদের জন্য কি প্রত্যাশা রাখেন আর কত উদ্দিন থাকেন। চার লক্ষ মানুষের একটি জামাতে অনেকেই আছেন যারা অসুস্থ, অনেকেই দুর্দশ, অনেকেই মারা যায়। কে জানে তাঁর দিয়ে তাঁর সুধা এসব কিছুর কারণে কিভাবে প্রভাবিত হতো?

যখন থেকে খোদা তাকে এ সমাজিত দায়িত্বে নিযুক্ত করেছেন তখন থেকে তাঁর অসাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি লাভ হয়েছে। কাদিয়ানের প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থা ও পরিস্থিতির তিনি সমস্ত খবরা-খবর রাখতেন এবং প্রত্যেক ব্যক্তির বাথা ও দুর্দশ একজন একাত্তে মেহিশেল পিতার মত ব্যবহিত হতেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর অনেক অনুক্রম দেখেছি। একবার আমার অসুস্থতার সময় তিনি আমাকে দেখতে আসেন এবং আমার সেবা-শুরু করেন। যখন তিনি ইতিকাফে ছিলেন তখন আমার শ্রী অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি তার দেখা-শোনা ও তাকে অবহিত

১৬০
খিলাফত

রাখার জন্য দু তিন জনকে দায়িত্বে নিয়োগ করেন। আমি নিশ্চিত, প্রত্যেক ব্যক্তি মনে করতো, সে খলিফার বিশেষ যত্ন ও মনোযোগের পাত্র যেভাবে ইমাম মাহবুব (আয়)-এর রীতি ছিল।

জামাতের শখুলনা ও ইসলামের নিরাপত্তাকল্পে অনিশ্চিত ব্যাপার থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রতিটি রোগী দেখা ও তাদের জন্য ঔষধ প্রস্তাব করা, গুরুত্বপূর্ণ পদের উত্তর প্রদান, সদর অঞ্চলের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনার দেয়া, বহিরাগত অতিথির সাধনা সাকাতের, তাদের সমস্যার কথা শোনা এবং তাদেরকে পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দেয়া এবং ইসলাম ও আহমদীয়তের প্রচারের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা করা এবং জামাতের সদস্যদের সে দিকে দৃঢ় আচরণের জন্য সময় বের করতেন। নামায়ের সময় পূর্বনির্ধারিত বিষয়, বাকী সবকিছু পরিস্থিতি ও সময়ের নির্দেশ করতেন।

তার সহানুভূতির গভীরতা ও ব্যাপকতা একটি ঘটনার মাধ্যমে বুঝা সম্ভব। সুদূর হায়দ্রাবাদে বন্যা ভাইহাব ধ্বংস সৃষ্টি করে। হযরত খলিফাতুল মসীহ এতে এত গভীরভাবে প্রভাবিত হন যে পত্র ও টেলিগ্রাম মারফত যখন খবর-খবর বা সংবাদ পেলেন না তখন সাহায্যের নিশ্চয়তা ও মন্দমাথা বাঁচার সহকারে সুদূর হায়দ্রাবাদে তার দৃঢ় পাঠালেন। এসব কিছু থেকে জামাতের সামনে একটি বিষয় নিশ্চিত হয়ে পেল যে হযরত মসীহ মাওউদ (আয়)-এর চিরদিনের পর আল্লাহ তাআলা জামাতের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য সর্বোচ্চ ব্যক্তিকে মনোনিত করেছেন। খোদা তাকে দীর্ঘকাল করুন যেন আমরা দীর্ঘকাল খোদার সে রহমতের মাধ্যমে লাভবান হতে পারি যা আমাদের উপর নূরউদ্দীনের (রায়) মাধ্যমে নায়েল হচ্ছে।

তার দোয়া সদা আমাদের সাথে আছে। ঈদের দিন তিনি এভাবে তার খুনত্বা শেষ করেন; "জামাত অব্যাহতভাবে উন্মুক্ত করক, তারা দৃঢ়চিত্রের অধিকারী হেক আর ভালবাসার সৃষ্টি প্রাপ্তি হেক। তারা রহুল কুদসের মাধ্যমে অনুস্থানিত হেক এবং পৃথিবীতে ও আকাশ থেকে উহুত সকল দূর্যোগ থেকে তারা নিরাপদ থাকবে, আর ধর্মীয় ফিতনার মুখে তারা যেন তোমার নিরাপত্তায় আশ্রয় পায়। তাদের ভিতর থেকে খোদার নিত্যবান, বুদ্ধিমান বন্ডা মুবাদলের খোদার প্রতি আহবানকারী সৃষ্টি হেক। তাদের নেতা ইসলামী শিক্ষায় সুশিক্ষিত হোন, তাদের আচার-আচরণ ও তাদের গভীর বিশ্বাসে তা প্রতিভাত হেক। নিত্যবান ও দুর্দশ শেষী তাদের মধ্যে কর্তৃত্বসম্পন্ন হেক।"
হয়রত সৌদীতী দৌলতীন (রা.) - খলিফাতুল মসীহ আউয়াল

জুমআর নামায়ের পর তার দিনের বেশির ভাগ জামাতের জন্য দোয়ার ভিত্তি কেটে যেতো। আমরা নিচে এর একটি নমুনা তুলে ধরছি। প্রথমে খোদাই জানলেন কিভাবে এবং কীভাবে বিদার্শ ভাবায় খোদার মেহের এই রাখাল খোদার কাছে রাতের অদ্বৈত ও নির্জন মুহূর্তে সবই যখন ভালীর নিদর্শ আচ্ছন তখন তাদের জন্য দোয়া করেন। খোদা তাঁর দোয়া করুন করুন আর আমাদেরকে এর রহমতের ভাগী করুন, আমীন।

১৯০৮ সনের ২৬শে ডিসেম্বর হযরত খলিফাতুল মসীহ বার্ষিক জলসায় প্রচা তিনধরা জামাতের উদ্দেশ্যে বস্তুধ্ব প্রদান করেন। কিভাবে তার তরভিন্ন আরস্ব হয় তিনি তা ব্যাখ্যা করেন। আরাহু ছাড়া কোন উপায়ে নেই এবং কিভাবে তা উৎসর্বে পূর্বে তা বর্তমান করেন। তিনি দোয়ার বুদ্ধি ও কল্যাণ, দৃষ্টি প্রচ্ছেদ, কুরআন করীম এবং প্রথম সুন্দরীত পদক্ষেপ করিয়ে দিবে। মনোযোগ আকর্ষণ করেন। এরপর তিনি কুরআনের আয়াতের আলোকে ইমান ও এর বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে বিভাজিত আলোচনা করেন। "আরাহু তালালা মুমিনদের কাছ থেকে তাদের প্রাণ ও সম্পদ কর্ম করে দিয়ে যেতেন" (১৪১১১)। যথনাক্রমে তিনি উল্লেখ করেন, হযরত মসীহ মাওউদ্দ (আ:) এর মৃত্যুর পর দিল্লি হতে প্রকাশিত কাজের ফল নিয়ে যেতে, আহমদীদের মাথা কেটে ফেলা হয়েছে, তাদের বর্তমান ইমাম মসজিদে কুরআন পাঠ করা ছাড়া আর কিছু করতে পারে না। এপর্যায়ে তিনি বলেন, "খোদা করুন আমি যেন আপনাদের সামনে সব সময় কুরআন পাঠ করতে পারি।"

২৮শে ডিসেম্বর সকালে তিনি পুনরায় জলসায় বস্তুধ্ব প্রদান করেন। তিনি খোদাপ্রেম সম্পর্কে বুদ্ধতা প্রদান করেন। তিনি প্রথমে ভালবাসা কাছে বলে তা ব্যাখ্যা করেন এবং এর বিভিন্ন পর্যায়ের উপর আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, সত্যিকারের ভালবাসা যোগ্য প্রথম সত্যায় সৌন্দর্য ও কল্যাণ অন্য সবার তুলনায় অভিজ্ঞ মাত্র সৌন্দর্য পর্ম এবং যার কল্যাণ ধরা চিন্তাহীন।

তার নির্দেশে মৌলভী মোহাম্মদ আলী ১৯০৯ সনের ২১শে জানুয়ারী এত্তিম, দরিদ্র ও যোগতাসমন্ধ ছাত্রদের সাহায্যের জন্য জামাতের কাছে একটি তহবিল গঠনের আহ্মদ জানান। এ বছর হযরত খলিফাতুল মসীহ ব্যক্তিগত অবদান ছিল সব অনুদানের পাঁচ শতাংশ।

১৯০৯ সনের ২৩শে জানুয়ারী স্কুলগতী অন্তর্বর্তী ছাত্রদের নসীহত করতে গিয়ে তিনি বদ অভাস পরিভাষা এবং রীতিমত নামায় পড়ার অভাস গড়ে।

১৬২
খিলাফত

তোলার উপর জের দেন। তিনি বলেন, “মাটিতে বাপিত আমের আটি যখন
বর্ধকালে অন্তরিত হয়, আপনারা জানেন বাচ্চারা তা টেনে উঠিয়ে ফেলে এবং
তা দিয়ে বাঁশি বানায়। কিন্তু পাঁচ ছয় বছর পর সেগুলোর মূল যখন মাটির
গভীরে প্রাপ্ত হয় তখন একজন শক্তিশালী মানুষেরও তা মাটি থেকে উৎপাটন
করতে কষ্ট হয়। অভ্যাস আর বিশাসও বৃক্ষ এবং চারার মত। আপনারা এ বয়সে
খুব সহজে বদানভায়া দূর করতে পারেন, কিন্তু একবার যদি বদানভায়া হয়ে যায়
আপনাদের জন্য তা উৎপাটন করা সত্ত্বেও নাও হতে পারে। কতক বাচ্চার মিথ্যা
বলার অভ্যাস হয়ে যায়। যদি প্রায়ই তারা এ অভ্যাসকে নির্মূল করার চেষ্টা না
করে তাহলে পরে তা করতে তাদেরকে বেগ পেতে হবে। আমি দেখেছি যাদের
শৈশবে এই বদানভায়া হয়েছে তারা সাবালক হয়েও এ অভ্যাস থেকে মুক্ত হতে
পারেনি যদিও এখন তারা বৃষ্ণি এবং আলেম হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে।

দ্বিতীয় বিষয় যে সম্পর্কে আমি আপনাদের নসীহত করতে চাই তাহলো,
সময় মত নামায় পড়া। যদি এখন আপনারা এ সম্পর্কে যত্নবান না হন তাহলে
বড় হয়ে হয়ত দেখেন যে আপনারা এ বিষয়ে উদাসীন।”

প্রায় একই সময় তার কাছে পড়ে যে এক বাক্তি বলেন, জামাতের কাছ
থেকে যে সকল উদ্দেশ্যে চাদা নেয়া হয় তা সেই সকল খাতে ব্যবহার হয় না
বহঁ স্থায়ী সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করা হয়। হযরত খলিফাতুল মসীহ সমালোচককে
এর আপত্তির বিষ্ণুরত উত্তর প্রদান করেন এবং তাকে নসীহত করেন, “শুধু
দুর্গ্রামভাষা সমালোচনা করে কারা কখনো লাভ হয়নি। অনেক এমন হৃদয় আছে যারা
আদম থেকে আর্থিক করে হযরত মুহাম্মদ (সাই) পর্যন্ত যত নবী এসেছেন
সকলের দুর্বল করেছে। ইহুদীরা চূড়ান্ত থেকে আর মুসলিমরা গত ১৩০০ বছর
ধরে তাদের সকল আপত্তি খনন করে আসছে। হৃদয় আদর্শ কোন
পরিবর্তন এসেছে কি? শিয়ারা হযরত বসুলিফ ফাতিমী (সাই)-এর সহায়তা এবং তাদের
পর যারা এসেছেন তাদের এবং উমরের মহান বৃষ্ণি মসীহের অনেক দুর্বলতা সমাদৃত
বলে বেড়ায়। বোকারী বলেন, হযরত ইবনে উমরের সামনে হযরত উমরের
সমালোচনা করা হয়েছে। এরপর দোষ-ক্রু সমালোচনার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে
আল্লাহ। নয়ন মুসলিম তাদেরকে বিশাল রাখতে পেরেছে কি? সুতরাং হৃদয়ে,
শিয়া ও আর্থিক পদাকৃতি অনুসরণ করবেন না। সে পথ বড় ভয়ানক, বড়ুর এবং
ক্ষতিকর। আমরা বোকারী সমালোচনায় যেভাবে হযরত মুহাম্মদ (সাই)
শিখিয়েছেন সেভাবে ইসলাম শিখিয়া দেই।”

১৬৩
হযরত মৌলিক নূরউদ্দিন (রা.) - খলিফাতুল মসীহ আউয়াল

কাদিয়ানের তালিমুল ইসলাম উচ্চবিদ্যালয় চালু হয় ১৮৯৮ সনের জানুয়ারী মাসে। এটা ভাল উন্নতি করছিল। কুলি এবং কুলির হোটেল শহরের অবস্থান ছিল এবং সাদামাটা কাঁচা ইং দিয়ে তা নির্মাণ করা হয়। ছিলাফতের সূচনাতেই শহরের বাহিরে একটি মসজিদসহ কুলি এবং হোটেলের জন্য বড় ও প্রথম বিষয় নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দেয় যে উদ্দেশ্যে ৫০ একর বিশিষ্ট একটি জমি ক্রয় করা হয় এবং যথাযথে মসজিদ, হোটেল এবং কুলি নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়।

যে মসজিদের নাম মসজিদে 'নূর' রাখা হয় তা নির্মিত হয় মূলত মাৰ নামের নবাব সাহেবের প্রচেষ্টায় সংগৃহীত অর্থের মাধ্যমে। ছিলাফতের প্রথম বছরে হোটেল নির্মাণের জন্য ১০,০০০ রুপি সংগৃহীত হয় এর কাছা ইং বাণিজ্যের জন্য একটি ভাটা বেলা হয়।

হোটেলের বিভিন্ন এর জন্য আরও বিশ হাজার রুপায়র প্রয়োজন ছিল। হযরত খলিফাতুল মসীহ নির্দেশ ১৯০৯ সনের মাসে মৌলিক মোহাম্মদ আলী জামাতের কাছে সে অক্ষর জন্য একটি আপিল করেন। সাদামাটা মির্জা বদীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ, ড: সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন, ড: মির্জা ইয়াকুব বেগ, খাজা কামাল উদ্দিন, মুফতি মোহাম্মদ সাদেক, শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী এবং মৌলিক মোহাম্মদ আলী সাহেবের তহবিল সংগ্রহের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। হযরত খলিফাতুল মসীহ ব্যক্তিগতভাবে ৬০০ রুপী প্রদান করেন।

যথা সময়ে কুলি ভবনে নির্মিত হয়। সরকারের পক্ষ থেকেও এতে ২৫,০০০ টাকার অনুদান আসে। কিছুকাল পর হযরত মৌর নামের নবাব সাহেবের অব্যাহত প্রচেষ্টা ফলকৃত হয় এর সাথে একটি হাসপাতালও নির্মিত হয় যার নাম রাখা হয় 'নূর' হাসপাতাল। তার মানবক্ষেত্রগুলি কর্মসূচীর আর একটি দৃষ্টান্ত হলো দরিদ্রলোকের জন্য কয়েকটি গৃহ নির্মাণ। এসব কিছুতে তাকে হযরত খলিফাতুল মসীহ দেয়া ও আর্থিক অনুদানের মাধ্যমে সাহায্য করতেন আর তিনি তাকে অন্যদের কাছে দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করতেন।

আন্দোলন হযরত খলিফাতুল মসীহ দেয়াকে অসাধারণ প্রখ্যাততাতে মোহাম্মদ দেয়া হয়েছে। ১৯০৯ সনে বদর পত্রিকার সহকারী সম্পাদক কাজী মোহাম্মদ জহর্জ আকমল সাহেব তার নিজস্ব একটি কবিতা ছাপেন যার একটি রহস্যময় লাইন হলো, 'আমার জন্য ছিল না'। একদিন দুপুরে হযরত খলিফাতুল মসীহ তার ঘরে বিশ্বাস নিচ্ছিলেন তখন তিনি তার

১৬৪
প্রথমে নয়মটি এমন সুরে পড়তে শুনলেন যা তাকে গভীরভাবে আদেশিত করল। তিনি হঠাৎ উঠে বসে গেলেন, আর বললেন সুবাহনাাঁলাহ, সমস্ত প্রশ্নালো আলাদাহ। আমি সবসময় জানতাম! তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ নয়ম কে লিখেছে? তাকে জানানো হল। আর এটিও জানানো হলো যে স্বল্প সময়ের ববদিয়াকে একের পর এক কবিতা উৎপন্নের অকাল মুখ্য হয়েছে। তিনি তৎক্ষণাত তাকে একটি প্রিন্ট লিখে পাঠান, “আমি বিপিত্ত হদয়ে আপনার জন্য দোয়া করেছি। খোদা কর্পুর আপনাকে হারানো ছেলের স্বল্প উত্তম সত্ত্বনান দান করবেন। হে আমার খোদা তোমার দরবারে আমার দোয়া কখনো নিভুল হয়নি। ১৯১০ সনে শোকস্তল্প পিতা মাতার ঘরে একটি ছেলের জন্ম হয়, হযরত খলিফাতুল মসীহু তার নাম রাখনে আবদুর রহমান। অপর ছেলের জন্ম হয় ১৯১৩ সনে। তিনি তার নাম রাখনে আবদুর রহিম। তারা উভয়েই বিশ্ববিদিয়ার যেখানে নাতক তিনি লাভ করেন এবং সফল পেশাজীবী ছিলেন।“

লাহের মেডিকেল কলেজের এক ছাত্র যিনি লন্ডনের অধিবাসী এবং প্রায় সম্প্রদায়ি, যাদিনেহতা এবং কথারাজ্যী অতি অসাধারণ কিংবা একাই আগ্রহিক আর দয়া ও মানবিক সহায়তার পরিপূর্ণ। তিনি ছিলেন খুব উদীয়মান একজন আহ্মদী আর হযরত খলিফাতুল মসীহুর একজন গভীর। তার কাছে তিনি বিশ্বাস প্রায়ই আসতেন। তার নিজ শিক্ষাক্ষেত্র সন্ত্র মনোমালিন্য ছিল এবং মনে করতেন যে শিক্ষকরা তার বিকৃত্তি বিদ্রোহ পোষণ করে। তিনি বার্তিক পরিকাঠামো দুরার কেলি করেছেন। বিনোদন হয়ে একবার হযরত খলিফাতুল মসীহুর উপস্থিতে অন্যান্য হয়ে শুনতে পাও এমন স্বরে এক বদুম কেলি বললেন যা হযরত হযরত খলিফাতুল মসীহুকে শুননার জন্য বললেন, হযরত কোন খোদা নেই যা আমার পরিকাঠামোর উপর তার কোন নির্দেশ নেই। হযরত খলিফাতুল মসীহু তার শুনন তার দিকে তাকালেন এবং বললেন, “হাঁ! সত্যিই?” এবং এরপর নিজ কাজ অবাহত রাখলেন। সে বছর সেই হতাশ ছায়া পরিকাঠামো পাশ করলেন। যখন হযরত খলিফাতুল মসীহুকে নিজ সফলতার কথা কিছুটা লজ্জায় সাথে অবহিত করলে তিনি মুহূর্তে হেনে বললেন, “তুমি কি আমার শক্তিশালী খোদা শক্তির বিকাশ দেখেছে?”

একবার হযরত খলিফাতুল মসীহু বললেন, “মুহূর্ত শুধু খোদা দয়ার মাধ্যমে অর্জিত হয় আর খোদা দয়া পরিষ্ঠ্য আচরণ এর মাধ্যমে লাভ হয়। সুখ্দুর শুধু বিশ্বাস আনন্দই যথেষ্ট নয় বিশ্বাসের সাথে সাঙ্কোচ চাই। হে!৷ এটি বিশ্বাস করে না।” একথা শুনে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, “খিলাফতের জন্য কেমন আচরণের প্রয়োজন?”

১৬৫
"খিলাফত নবুওয়েতের নায়ের আর উভয়টি খোদার দান। তবুও আমি মনে করি এ দয়া আকর্ষণ হয় মানবতার সেবার মাধ্যমে আর আমি যোগানের সূচনা থেকেই এ প্রেরণার সম্মুখ। আমি বংশ, কৃষি, দেশ ও জাতীয়তা নির্বিশেষে সকলকে নিজের জান ও কর্ম উদ্যোগের মাধ্যমে সেবা করেছি।"

হযরত শেখ ইয়াকুব আলি ইরফানী সাহেব ১৯০৯ সালের জুলাই মাসে লিখেন:

"বাহির থেকে যখন কোন অভ্যাগত প্রথমবার কাদিয়ান আসে যে ভাবতই সে হযরত খলিফাতুল মসীহ দুয়েজ। কিন্তু যখন তাকে তাঁর কাছে পাঠানো হয় সে দেখে আশ্চর্য হয় যে কিছু মানুষ অকৃত্রিমতায় কোন প্রকারের ভেদাভেদ না করে মাদুরের বলে আছে। সে তাদের মাঝে প্রদীপ চেহারার একজন রেশিয়াল ও প্রতাপ বড়ুম ব্যক্তিকে দেখে কিন্তু তাঁর বেশ-ভূষা, তাঁর ভাবভঙ্গি ও কথাবার্তার ধরন থেকে কোন ক্রমেই বুঝার উপযোগ নেই যে এ দীপ্যমান ব্যক্তিই খিলাফতের আল্লাহ অপ্রকট করেন। তিনি রোগ ও অসুস্থ সামনে দেখেন, অমুদী ও দুর্সুদ্ধতা পোষাক পরিহিত লোকদের অতি সহজভাবে এবং সকল কৃত্রিমতার উড়ে থেকে রোগ নির্যাপ ও ঐত্য প্রস্তাব করেন। এমন মানুষও আছে যারা ধর্মীয় বিষয়ে সকল প্রকার প্রশ্ন করে আর তাঁর উত্তর দেন। কিন্তু কিস্তে তাঁর অভ্যাগত ব্যক্তি বুঝে যে তার মনে বাঁকে সহ্য করেছে তিনিই সে ব্যক্তি। এটি দেখে হাত সে আশ্চর্য হয় আর রুক্তচি পারে যে খিলাফতের কাজ চলছে।

আমাদের খলিফা যিনি আমাদের নেতা, তিনি মূর্তিমান সরলতা আর কোন প্রকার কৃত্রিমতা তাঁর মাঝে নেই। তিনি সবার সাথে এমনভাবে কথা বলেন, যার সাথে কথা বলা হচ্ছে মনে করে যে শুধু তাকেই তাঁর শুরুতে ও দৃষ্টির জন্য বেছে নেয়া হয়েছে। কিন্তু বিষয় এমন নয়। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাঁর সমান লেখ ও সহানুভূতি রয়েছে। ঘর বাইরে সর্বনাশ তাঁর মূর্তিমান সরলতা। তাঁর কাজের সাদামাটা, তাঁর বেশভূষা সাদামাটা, তাঁর সাধীদের মাঝে যা তাকে সতত্ত্বা আসন দিয়েছে তাহলো তাঁর প্রভাব চেহারা। তাঁর পুরো সাময়ি সাধীদের পরিচয় ও ধর্মীয় কাজে বায়া হয়।" ৭৬

হযরত খলিফাতুল মসীহ তাঁর ভেরার বাড়ী আহমদীয়া জামাতের মসজিদের জন্য উৎসর্গ করেন। কোন প্রতিবেশী এ পুরো কল্যাণময় প্রজেক্টকে দুর্লভমূলক পরিকল্পনা আখ্যা দিয়েছে। একারণে তিনি তাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় আলমেদের কাছে নিম্নলিখিত পত্র লেখেন।

১৬৬
খিলাফত

"হযরত মৌলিকী সাহেব, এ অধম সবসময় হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ থেকে দূষিতকে যুগ্মা করে থাকে যেন ক্ষতিকর কোন ধারণা এতে স্থান না পায়। আমি ব্যক্তিগত জানের ভিত্তিতে নিষ্ঠিত করে বলতে পারি, আমার পিতা এবং পিতামহও দূষিতকে যুগ্মা করতেন। রহমান ও রহিম খোদা সত্যকে ভালভাবে জানেন আর কে তা জানতে পারে? আপনি আমার না আমার ভাইদের সাথে সময় কাটানি। তাদের কেউ দূষিতকে পছন্দ করতেন না। সকল প্রশ্নে সম্ভাব্য। আমি যতটা জানি আমার মাতা এবং মাতামহ এবং বোনেরাও একে যুগ্মা করতেন।

আমি আত্মজ্ঞানান্বেদি, না ইসলাহা ইসলালাহ মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহের সেবক করি। আমি নামায পড়ি, রোয়ায়র বাণিজ্য দেই, দু দু বাণিজ্য করেছি। আমি সহস্র সহস্র মানুষকে কুরআন শিখিয়েছি এবং তাদেরকে পুরুষ নিয়মে অনুশীলন মনে চলার শিক্ষায় দিয়েছি। সকল প্রশ্নে বিশ্বাস প্রতিপালক খোদার। আমার শিক্ষার সংখ্যা লক্ষ লক্ষ হবে যাদের মধ্যে কোন ইসলাম, মোসলম, পাঠ্যনি ও শেখ রয়েছে। আমি তাদের কাউকে ক্ষতিকর কোন কিছু শিখতে নিন। আমাদের জামাতের সদস্যরা দুর্দিত ভিড়ে চলে। তারা ক্ষতিকে বরণ করে কিন্তু ঝুঁকি ভিড়ে চলে। সবাই সমাজ নয়। কিন্তু অন্যদের সাথে তুলনামূলক দুর্দিতকেন থেকে তারা নামায রোয়ায় ও যাকাত উন্মুক্তে পালন করে।

যখন তেরাবাসীরা আমাকে মসজিদে উৎপীড়ন করে তখন ঝাগড়া এড়ানোর লক্ষ্য আমি বাড়িতে নামায পড়া আরম্ভ করি। আমি সবসময় একথা মনে রাখি ‘সে বাড়িতে অপেক্ষাকে বড় মালাম যে মসজিদে খোদার স্বর্ণের পথে বাধা সৃষ্টি করে (২:১১৫)’ আমাদের জামাতের সদস্য মসজিদে কোন অববাহ কাজের জন্য যার না। কিন্তু তাদেরকে সবসময় উৎপীড়ন করা হয় এবং অন্যায়ভাবে চুরির দায়ে অভ্যন্তর করা হয়। আমার সবসময় তাদেরকে দৈবিক শিক্ষা দেই।

যখন অত্যাচার অসহ্য হয় উঠল তখন আমারা নিজেদের মসজিদ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিলাম এবং হামূল করলাম, কাউকে এতে নামায পড়া থেকে বাধা দেয়া হবে না। আপনারা কি এটিকে দুর্দিত মনে করেন? ইসলাম লীগে ওয়া ইসলাম ইলাহে রাজেন্দ্র (২:১৫৭)।

আপনাদের মেয়েদের আমারা নিজেদের মেয়ে মনে করি। আমরা নিজেদেরই মহিলাদের পক্ষায় ব্যাপারে সচেতন। সে বিষয়ে আপনাদের চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই। কিন্তু কারা বা কোন প্রকারের বিশ্বাস এ মসজিদের উদ্দেশ্য নয়।

আপনারা আমাদের অজান্তে এমন একটি ঘর ক্রয় করেছেন যাতে আমাদের যৌথ

১৬৭
মারিকানা রয়েছে। এ পদক্ষেপ কি দুর্কৃতির সমূহ আশঙ্কা নিজের মাঝে রাখে না? আর এর উদ্দেশ্যও শান্তি শূন্তকা প্রতিষ্ঠা নয়। লা ইলাহা ইলাহালাহ মুহাম্মদুর রূপুলুলাহ সম্পর্কে অন্তর্ভুক্ত কর। আমরা মসজিদের এমন কোন প্রবেশ পথ রাখিনি যার ফলে পর্যবেক্ষণের সময় হয়ে পারে।

বলুন আমাদের কি করা উচিত? আপনারা এবং আপনাদের ফতওয়া আমাদেরকে মসজিদ থেকে বের করে দিয়েছে। এখন আমরা আমাদের যোগ্য মসজিদ বাণিজ্য চাই আর আপনারা এটিকে দুর্কৃতি আখ্যায়িত করেছেন। এটি কি ইসলাম? তাবুন এবং কোন দায়িত্বজনসম্পন্ন মুসলমানের সাথে প্রার্থনা করত আমাকে জানান। আতীতীপাত্র যতটুকু সম্পর্কে আছে ইনসাফের সাথে সে বিষয়ের সিদ্ধান্ত আমি আপনার হাতে ছেড়ে দিচ্ছি। আমি শুধু এটা বললে, আপনি শ্রীকৃত কোরাইশী আর আমরা যা আছি তাই আছি।

মৌলভী সাহেবের এর বড় তিন শলা পৈতৃক বাড়ি কেউ নষ্ট করে কি? দুর্কৃতি, ক্ষয়ক্ষতি ও অশান্তি এড়ানোর অন্য কোন রাস্তা না পেয়ে আমরা শান্তি শূন্যন্ত্র রক্ষায় খাতিরে এ পথ অবলম্বন করলাম। আপনি কি চান যে আমাদের জামাত বেদান্তের শিক্ষার হয় আর শহরের এ প্রাপ্তিও খোদার নাম নোয়া থেকে আমাদের বিশ্বাস রাখতে চান? এরপর আমাদেরকে দুর্কৃতিপূর্ণ অন্তর্ভুক্ত করতে চান? খোদার কি ভয় নেই। অভিভাবক হিসেবে আমরা শুধু তার কাছেই দোয়া করি। আমরা শুধু আল্লাহর উপরই নির্ভর করি যিনি সর্বমাত্র রক্ষকারী এবং সবচেয়ে দূরদূর লু (১২৬৫)। এর বেশি আমি আর কি বলব? আপনি বয়সে আমার চেয়ে বড়। আপনার ভাইয়েরা আপনার ছেট হওয়া সত্ত্বেও সকলেই মারা গেছেন। আমার পালায় আমি মারা যাব। এসব বাধাই ঘটের কিছুই আমাদের সাথে যাবে না।”

১৯০৯ সনের আগস্ট মাসের প্রথম দিকে হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী একটি স্থানীয় জামাত পরিদৃশনে যাওয়ার সময় হযরত খলীফাতুল মসজিদকে একটি বাণী প্রদানের অনুরোধ করলে তিনি লেখেন:

“আমি চাই আহমদীয়ার জামাত যেন ধর্মকে ইহজগতের উপর প্রাধান্য দেয়। তারা যেন মতপঞ্জক হলে বস্তুজগতের প্রতি না বুঝে। আমার এমন মোবাইলের প্রযোজন যারা দুর্দশা সংক্রমণ বহু, যারা নিষ্ঠার সাথে তবলীগ করবে আর সত্যকে আক্রান্ত হত্যার করবে। আমার দূরদূরদূরস্থান আল্লাহর প্রযোজন যারা সম্পূর্ণভাবে খোদার উপর নির্ভর করবে, দোয়ায় বিশ্বাস রাখবে এবং বাণিজ্য পায় নিয়ে গর্ব করবে না। আর সদা কিভাবে খোদার সম্পূর্ণতা অর্জন করা যায় তা নিয়ে তারা

১৬৮
ভাবে। কিন্তু এমন মানুষ কমই আছে। আমার ফরিয়াদ শুধু খোদার কাছে।"২৯
1910 সালের ১৯শে জানুয়ারী তিনি আলীগড়ের এম.এ.ও কলেজের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে লিখেন।

"প্রিয়গণ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমানতুলাহে ওয়া বারাকাতুক।
যেখানে তোমরা আছে সেখানে উচ্চমাধ্যমিক ও ডিগ্রি পরীক্ষার পাশাপাশি
ক্যাম্পাস ও অন্যান্য পরিবেশে বিবাহ করে। কিন্তু আমার তৃণমূলীন
উপত্যকার পরিবেশের জন্য লালাগিয় (যেখানে হযরত ইব্রাহীম, হযরত হাজারা
ও ইসমাইলকে রেখে এসেছিলেন— ১৪৪৮) তোমরা দুঃখ সংক্রান্তি হও যেন তোমরা
উভয় পরীক্ষার পাশ করতে পার আর সে সকল লোকদের অস্ত্রন্বয় হও
যারা মহান সফলতা অর্জন করেন (৩৩-৭৭)।"

১৯০৯ সালের সালানা জলসা ১৯১০ এর বসন্ত কাল প্রত্য স্পৃহিত রাখা হয়।
১৯১০ এর ২৫-২৭ মার্চ তারিখে এ জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এটি অন্যতম সফল
একটি জলসা ছিল এবং এতে অনেকেই বয়স্ত করেছে। কিন্তু হযরত খলীফাতুল
মসীহ সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ ছিলেন না। আর পরের জুলাইর খুব বাতাস তার অস্ত্র
প্রকাশ করে বলেন:

"আমি বড় কথা এখানে এসেছি। আমার আদেশ তাল লাগছিল না। ব্যাধি,
আমার মাথা ফেটে যাওয়ার উপক্রম। আমার এ বিস্মৃত অবস্থায় আমি তোমাদের
এবং আমার নিজের অবস্থায় গতিরভাবে বিশ্বাস করলাম। অনেক সময় আমার
দৃষ্টিশক্তি হারানোর অশ্লীল হয়েছে। আর খোদার দৃষ্টি সম্পর্কেও ভেবেছি কেন
কিন্তু যার দৃষ্টির বাহিরে নয়। এক কথায় আমি বর্ণিত বিষয় নিয়ে চিন্তা
করেছি। আমার ইচ্ছা ছিল শুধু তাশাহুদ পড়ে বলে যার কিন্তু একটি
অন্যাবস্থায়ী বিষয়ে আমাকে কথা বলতে বাধ্য করেছ। তোমরাও ধরে নিত পার
যে এটি আমার শেষ দিন আর যা আমি বলতে যাচ্ছি তা আমার শেষ বাণী।

তোমরা এখানে একটি হয়েছ আর গুরুকুলেও সমস্যানে হচ্ছে, লাহেরের
আত্মানাটি, হেমায়েতে ইসলাম এবং আলীগড়ের শিক্ষা সম্পর্কেও মানুষ একটি
হয়েছে। এতে বিভিন্ন প্রতিবেদন পাঠ করা হয়েছে। এখানেও প্রতিবেদকরণ
আমাদের সামনে আর-বারের বিবরণী উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু আমি
ভাবছিলাম, আমরা এখানে কেন একটি হয়েছ? টাকা টাকা-মাধ্যমেও পাঠানো
সহজ ছিল আর রিপোর্ট ছেপে ডাকেও পাঠানো যেতো। উপস্থিতি ছিল তিন
হাজার। যদি তাদের মধ্যে শুধু নেতৃত্বাধীনীর এবং আমার সাথে সম্বন্ধ করতো আমি
তাদের জন্য দোয়া করতাম এবং তাদের হিতোপদেশ দিতাম। কিন্তু যারা আমার

১৬৯
হযরত মৌলভী নূরউদ্দীন (রা.) - খলীফাতুল মসীহ আউয়াল

সাথে দেখা করতে এসেছে তারা শুধু যাওয়ার পূর্বে বিদায় নিতে এসেছে। মস্তক রেখে এবং একথাকে তাদের স্থান দাও, যে সকল সভার উদ্দেশ্য আধাতীত মূল্যবোধকে উল্লেখ করা নয় এমন সব সভাকে আমি চরমভাবে দৃঢ় করি। আমি পূর্বেই বলেছি, টাকা ডাক মেগেও পাঠানো যেতে আর পুরো যাত্রায় ও আতিথেয়তা হাতে বয় এড়ানো সমর্থ হতো। এখানকার দোকানমালিকরাও শুধু জাগতিক স্বার্থকেই সামনে রেখেছে। কেননা তারা বিক্রিয়ার মাত্রা বৃদ্ধির জন্যই চায় যে এ শহরে জলসা হোক। যারা শুনছেন তাদের একথাগুলো মস্তক রাখা ও অন্যদের পৌছানো উচিত যে এমন সকল জলসা যা জাগতিক লক্ষ্যে হয় আর এমন অর্থ যা পারিবারি উদ্দেশ্যে সংগঠিত হয় একে আমি দৃষ্টি করি। এ কারণে চিন্তায় চিন্তায় আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি। কত ভাল হতো যদি বিভিন্ন জমাতের সেক্টরারী ও কর্মকর্তাগণ আমার সাথে কিছু সময় কাটাতে। আমি বিভিন্ন কল্যাণকর বিষয়ে তাদের ধীরনির্দেশনা দিতে পারতাম। আমি সদর আঞ্চলের আহমদীয়ার সমস্তদের প্রতিতি অস্ত্রটি। কেননা তারা বাহির থেকে যারা এসেছেন তাদেরকে একথা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন। কত টাকা এলো আর কত সংগ্রহ হলো এতে এমন কোন অগ্রহ নেই। আমাদের বড় প্রয়োজন হলো আমাদের খোদা। আমি জানি কত সংগ্রহ হয়েছে আর আমি এর প্রতি বক্ষপথ করি না। আমি বুলায় আপনাদের বলবান, খোদাকে সবকিছুর উপর প্রাধান্য দিন। আমাদের সকল প্রচেষ্টা সে লক্ষ্যেই পরিচালিত হওয়া উচিত। যদি আমরা এটিকে অবহেলা করি তাহলে হাইস্কুল এবং স্কুল ভবন এর লাভ কী? অবশ্যই আমাদেরকে আমাদের প্রভুর সৃষ্টিই সম্ভব করতে হবে। আপনাদের সাথীদের লিখিত আর তাদেরকে সে বিষয়ে উপদেশ দিন। লাহোর এবং অমৃতসর থেকে যে সকল বন্ধু এসেছেন আমি তাদের জন্যে উপকার করেছি কিন্তু কেউ কিছু শিখায় না। আপনারা সবাই মুন্নাকি ও পুণ্যবান হেন এটিই আমার কাম্য। আর ইহজগত ও এর ফাঁদে পড়বেন না।”

হযরত খলীফাতুল মসীহকে ১৯১০ সনের ২৬শে জুলাই একটি ফেজদারী মামলায় বিবাদী পক্ষের সাক্ষী হিসেবে মূলতানে রায় কাইহ দাসের আদালতে তলব করা হয়। তিনি ২৪শে জুলাই কাদিয়ান থেকে মূলতানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং লাহোরে বিশ্বাস করে। তিনি লাহোরে অভ্যস্ত কালে একজন শিয়ার পক্ষ থেকে একটি পত্র পান যাতে তাকে ইরান থেকে আগত এক শিয়া আলেমের সাথে পরবর্তী কোন তারিখে বিতর্কের প্রস্তাব দেয়া হয়। তিনি প্রস্তাব দেন, উভয় পক্ষের সমায়ত্তে একজন বিচারকের ব্যাপারে মতোকে পৌঁছা যেতে পারে যদি বিতর্ক সম্পর্কে তার রয় প্রদান করেন। তার উত্তর ছিল:

১৭০
"আমি সত্য সন্ধানে সদা প্রস্তুত। আল্লাহর ফলে আমার বয়স ৭০ বছর। আমার দীর্ঘ জীবনের জন্য খুব একটা লালায়িত নয়। এতদসমুদ্রে যদি আমি সত্যপথ খুঁজে পাই তাহলে ইনশাআল্লাহ আমি মিথ্যার পক্ষে কোন হঠকারিতার আশ্রয় নেব না। কিন্তু বিচারক কোন ধর্মের অনুসারী হবেন আর তাঁর নিরপেক্ষতার নিষ্ঠাতা কি?" এরপর শিয়া এ বিষয়ে আর অগ্রসর হয়নি।

মুলতানের ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তি ছিল একজন অবসরপ্রাপ্ত সিপাহী যে খুন নয় বরং অনিচ্ছাকৃত হতায় দায়ে অভিযুক্ত ছিল। সে আলোচনা এভাবে সমর্থন করতে গিয়ে বলে যে সে মানসিকভাবে সুষ্ঠু নয়। হাকিম নূরউদ্দিন কুর্তক চিকিৎসা করার জন্য প্রায় তিন মাস পূর্বে সে কাদিয়ান গিয়েছে আর সেখানে এক সপ্তাহ বা ১০ দিন অবস্থান করে। সমান্তরাল সাক্ষী যখন আদালত কক্ষে আসেন তখন ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর প্রতি সকল প্রকার সমালোচনার ফাসি প্রদর্শন করেন এবং তাঁর সাথে গতির শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করেন। তিনি ক্ষমা চেয়ে বললেন, মামলার আইনগত বাধ্যবাধকতার কারণে তাঁকে সাক্ষী হিসেবে তাকে আব্দুল্লাহ হয়ে পড়েছে। তাকে সাক্ষীর কাঠামো দাড়াতে বলা হয় নি বরং চেয়ে বসেই তিনি বজ্রা প্রদান করেন। তাঁর মুখ্য সাত সংক্ষেপে নিম্নরূপ: "আমি অভিযুক্তকে চিনি। সে ৬ মাসের বেশি কাল পূর্বে চিকিৎসার জন্য আমার কাছে এসেছিল। তার সাথে আরও এক ব্যক্তি ছিল। আমার বিবেচনায় সে মেনিয়ায় আক্রান্ত ছিল। এটা এক ধরনের উম্মাদান। এর লক্ষণবলী হলো, কোন ব্যাপারে একরোখা হওয়া, তাকরের কাছে সঠিক অবস্থা প্রকাশের ক্ষেত্রে অনুহীন, কর্নিয়ার(চোখের সাদা অন্ধ) অন্তিম এবং তড়িঝড়ি ক্ষেপে যাওয়া।

সেখানে সে এক সপ্তাহ বা ১০ দিন অবস্থান করে কিন্তু তাঁর অবস্থার তেমন কোন উন্মুক্ত হয়নি। আমি তাঁকে আরও কিছু কাল অবস্থান করতে বলেছি কিন্তু সে করেনি। আমি তাঁকে দিনে একবার দেখতাম আর এতে কয়েক মিনিট লাগতো, এরপর তাকে আমার কাছ থেকে বিদায় দিতাম।

আমি হয়রান মিয়া সাহেবের প্রথম খলিফা এবং আহমদীয়া জামাতের নেতা। আমি প্রায় ৪৫ বছর চিকিৎসা পেশার সাথে জড়িত ছিলাম। আমি কাশাইরে প্রধান রাজ চিকিৎসক ছিলাম। প্রায় ১৫ বছর আমি রাজস্ব অবস্থান করি। অভিযুক্ত ব্যক্তি কাউকে মেরেছে বলে আমি জ্ঞা নিনি। তাঁর জন্য একটি ব্যবস্থাপনা লিখেছি বলে আমার মনে আছে। আমি রোগীদের কোন রেজিস্টার রাখি না। আমি প্রত্যেক রোগীকে অন্তত মাসানুমাসে দেখি কখনো প্রথাগতভাবে নয়।"
হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন (রা.) - খলীফাতুল মসীহ আউয়াল

আইনবিদ ও কোট পরিদর্শক তার প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করেন।

একবিধিন তার মুলতান পরিচালনের ইচ্ছা ছিল কিন্তু শহীরের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের অনুরোধে তার একবিধি থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন, যে সময়টি তিনি রোগী দেখার কাজে ব্যস্ত ছিলেন আর সদরে আল্লামানে ইসলামিয়ার হলে একটি বন্ধুত্ব করেন। সেদিন রাতে তিনি লাহেরের উদেশ্যে যাত্রা করেন এবং সেখানে তিনি দিন অবস্থান করেন। ৩১শে জুলাই মোহাম্মদ রোব্রবার তিনি ইসলাম এবং অন্যান্য ধরনের উপর একটি ভাষণ প্রদান করেন এবং একই দিন দুপুরে কাদিয়ান ফিরে আসেন।

১৯১০ সনের ২২শে অক্টোবর তিনি এক বন্ধু বিবাহের সূচ্যুত করে তাকে পত্র লিখেনঃ "কার বিবাহ কি, হয়ত চিরে তা দেখানো মানুষের সাধারণ। যদি কারা হলকনামা বিবাহের অপার্থি হতে তাহলে মহান আল্লাহকে সাক্ষী হিসেবে রাখার মত সেয়ের পক্ষে বড় কোন প্রমাণ নাই। আমার মৃত্যুর পর তোমরা বা অন্য কেউ আমার সাথে থাকবে না। আমার সাথী হবে শুধু আমার ইমাম ও করম। সেবন চিন্তার বিচার করেন মহান আল্লাহ, যার নির্দেশ আকাশ ও পৃথিবী নিজস্বে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

আমি হযরত মিয়া সাহেবের তাকাউয়ায় বিখ্যাতি। তিনি এ শতাব্দীর সংস্কারক। আমি বিবাহের করি, তিনি মকার আরবী নবী মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ খাতামান নবীসির (সাহি) এবং তার আনীত শরীয়তের সবচেয়ে নিঃশ্বাসান সেবক ছিলেন। হযরত মিয়া সাহেব স্রষ্টা নিজেকে আরবী নবী মুহাম্মদ (সাহি) বির আবুদুল মুতলেব বির হাশেম বির আবুদ মুনাফের সবচেয়ে নিবেদিত প্রাণ দাস মনে করেন। আল্লাহ যে ওহী করেন সে অনুসারে যিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন নবী তাকে বলা হয়। আমারা একথা বিবাহের করি না যে একজন নবীকে অবশিষ্ট শরীয়তের হতে হবে।

আমি এবং হযরত মিয়া সাহেব দুঃখভাবে এ বিবাহ পোষণ করি, কুরআন বা মুহাম্মদ (সাহি) রসূলুল্লাহ শরীয়তের একটি যের যব্যবহার যে অবশিষ্ট করে সে অবশিষ্ট এবং অভিষিক্ত। যে আমার এ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান করে বা আনীতকালীন মনে করে তাকে খোদার কাছে জবাব দিতে হবে বুঝতে।" ১৯১০ সনের নভেম্বরের প্রথম দিকে বেদর পরিকার সম্পাদক নিম্নলিখিত বিবরণ প্রকাশ করেনঃ "হযরত খলীফাতুল মসীহ দিকনিদেশনা দেন, যেহেতু তাঁর সাহস প্রায় খারাপ থাকে, আর কোন কোন সময় তিনি মারাত্মকভাবে অমুগ্ধ।

১৭২
খিলাফত

হয়ে পড়েন। অধিকাংশ মানব জীবনের যেহেতু কোন নিষ্ঠয়তা নেই, তাই কেউ যদি মনে করে যে তাঁর কাছে তার কোন টাকা আমানত রাখা আছে বা ফেরতযোগ্য ধনের টাকা রয়েছে বা অন্য কোন কারণে যদি টাকা দিয়ে থাকে বা কোন রোগী যদি মনে করে যে সে যত টাকা খরচ করেছে সে মোতাবেক সেবা পায়নি, তার এগিয়ে এসে যা সে প্রাপ্ত বলে মনে করে তা যেন নিয়ে যায়। তিনি বলেন, আল্লাহর কৃপায় এমন সকল দাবী পূরণ করা তাঁর জন্য সহজ আর আল্লাহ তাঁকে এর জন্য পর্যাপ্ত উপকরণ দান করেছেন।”

“জীবনের শেষ বার্ষিক জলসার সময় যখন হযরত খলীফাতুল মসীহু হযরত নবাব মোহাম্মদ আলী খান সাহেবের বাসার দক্ষিণে দাঁড়িয়ে ছিলেন কেউ তাঁকে কিছু টাকা দেয় তাঁর মনে নেই কে সে টাকা দিয়েছিল আর কোন উদ্দেশ্যে দিয়েছিল। সে টাকা একদিকে রেখে দেয়া হয় আর গণনাও করা হয়নি। লিঙ্গগনের পাঠক এ সংবাদ অন্যদের অবহিত করেন আর এটাকা কে দিয়েছে এবং কেন, তা উদাহরণের জন্য চেষ্টা করতে হবে।”

১৭৩
অসুস্থতা

১৯১০ সনের ১৮ই নভেম্বর জনমূর্তির খুত্তা দিতে গিয়ে হয়ে খলীফাতুল মসীহ নিমুলিখিত ভাষায় নিজের আরেক প্রকাশ করেন:

"আমার হ্রদের আকুল বাসনা হলো এটি দেখা, এ জামাত আল্লাহকে ভালবাসে, তাঁর রসূল মুহাম্মদ (সা) -এর আনুগত্য করে এবং পবিত্র কুরআনকে রুক্ষে। কোন পরিস্কার না ফেলে আমার প্রতি না চাইতেই আমায় অগণিত আচর্যজনক দানে ভূষিত করেছেন। তিনি শুরু থেকেই আমার চাহিদা পূরণ করে আসছেন। তিনি স্যায় আমার অন্য বস্ত্র ও আরামের বিধান করেন। তিনি আমায় ঘর, স্ত্রী ও সন্তান এবং অনেক নিষ্ঠিভান বন্ধু দান করেছেন। তিনি আমাকে আচর্যজনকভাবে অনেক বই দিয়েছেন এবং আমাকে তা পড়িয়ে তৌফিক দান করেছেন। আমাকে স্বাস্থ্য, ঝাম এবং প্রযোজকীয় সবকিছু দিয়েছেন। আমার এখন এটিই বাসনা, আর আমি একান্তভাবে আশা রাখি আল্লাহ আমার বাসনা পূর্ণ করবেন, তোমাদের মাঝে এমন মানুষ সৃষ্টি হোক যে আল্লাহকে ভালবাসে, আল্লাহর কথাকে ভালবাসে যা তিনি তাঁর রসূল মুহাম্মদ (সা) -এর প্রতি নায়েল করেছেন, আল্লাহর প্রতি অনুগত হবে এবং সত্যিকার অর্থে তাঁর খাতামান নবীহান (সা.)-এর অনুসারী হবে। তোমাদের মাঝে হতে এমন লোকও আছে যারা কুরআন এবং মহানবী (সা) -এর আদেশের অনুসরণ করে। আমি যখন এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে। তখন তোমাদের পক্ষ থেকে যেন আমার হ্রদই ও চক্ষু প্রশাংক লাভ করে। আমি তোমাদের নিকট কোন প্রতিসাদ চাই না আর তোমাদের কোন দানের আমার প্রয়োজনও নেই; এমনকি আমি তোমাদের কাছে নিকট সালামও প্রতিশ্রুতি করে না। তোমাদের নিকট আমার পরম চাওয়া হলো, তোমারা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং মুহাম্মদ (সা) -এর সত্যিকারের অনুসারী হয়ে যাও। পৃথিবীর সবকিছু প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার সাথে এ বার্তা পৌঁছাও, আল্লাহ ভিন্ন কোন উপাস্য নেই।" ১৯১০

নামায়ের পর তিনি নববর মোহাম্মদ আলি খান সাহেবের ঘরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন কেননা তিনি একবিন্ধু পূর্বে মালিকের কোটালা থেকে কদিয়ান ফিরে এসেছেন। দূরত্ব যেহেতু দেড় মাইলের অধিক ছিল তাই তিনি একটি খচনের বস্ত্র সিদ্ধান্ত নিলেন। এটা কিছুতার অনিয়মিত ছিল। কেউ একজন এটি তার ১১ বছরের বড়
ছেলে আবুল হাইকে উপহার দিয়েছিলেন। ফেরার পথে যখন তিনি খোচারে আরোহণ করতে যাচ্ছিলেন তখন পাশে দাড়ায়ামান একজন দেখলেন যে রেকাবটি উচু তাই তাঁর প্রয়োজন অনুসারে নিচে নামাতে চাইলেন কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করলেন না এবং বললেন, এটা বাচাচের প্রয়োজন অনুসারে বাধা হয়েছে তাই এতে হস্তক্ষেপ ঠিক হবে না। তিনি খোচারে চড়ে বিদায়া হয়ে গেলেন। যারা তাঁকে চলে যেতে দেখাচে তারা দেখে, যদিও খোচারটি দ্রুত যাচ্ছিল কিন্তু তিনি এর উপর দৃষ্টান্তে উপবিষ্ট আছেন। আর মনে হচ্ছিল যে তিনি উপভোগ করছেন। শহরে প্রবেশের পর তাঁকে সংকীর্ণ গলি দিয়ে যেতে হয়। এক পর্য্যন্ত হঠাৎ করে খোচারটি নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলে যায় এবং কাঁকুনি দিয়ে তাঁকে দান দিকে ফেলে দেয় কিন্তু তাঁর বাম পা রেকাবে আক্তবে যায় আর সে অবস্থায় তাঁকে করেছে দুই টেনে নিয়ে যায়। এরপর তিনি দান দিকে একটি চোখা পাারের উপর আঁছড়ে পড়ে।

যদি তিনি মদ্য করলেন, ‘আল্লাহর পক্ষ থেকে দায়িত্বপূর্ব ব্যক্তির সাথে সুখিনী করা হয়েছে।’ এতে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর একটি স্বপ্নের দিকে ইচ্ছিত ছিল, যাতে তিনি দেখেছিলেন, মৌলভী নূরউদ্দীন খোড়া থেকে পড়ে গেছেন। যখন এ স্বপ্ন দেখেন তখন কাদিয়ানে কোন আহমদীর কাছে আরোহণযোগ্য কোন খোড়া ছিল না। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর দুই ওইদি সাথে যে হযরত এ ঘটনার সংগ্রহ থাকতে পারে। প্রথমটি হলো: ‘একটি দ্বিতীয় জীবন’ আর অপরটি হলো ‘সে জীবন যা প্রত্যাহার করা হয়েছে।’

হযরত খলেফাতুল্লা মসীহ সম্পূর্ণভাবে প্রশাস্ত ছিলেন এবং আদৌ বিচিত্র হননি। প্রাথমিক চিকিত্সা তাক্তিকভাবে প্রদান করা হয় আর কোপারের ক্ষত অবশ না করে প্রিয়ী চিন্তায় দেওয়া হয়। যারা তা পরিচালনা করেছেন তারা সেলাই করার সময় তাঁর একটি পেশীতেও নড়তে দেখেছিল। দুর্ঘটনার খবর ছাড়ানোর সাথে সাথে উত্তেজিত পুরুষ ও মহিলারা হয়ে ভাল আছেন কিনা তা নিষ্ঠুর হবার জন্য তাঁর ঘরে জড়ে হয়। পূর্বের তিনি বলেন, তিনি তাদের জন্য দোয়া করবেন আর মহিলাদের উদ্দেশ্যে তিনি খোবর পাঠান, তিনি ভাল আছেন আর তাঁর কোন দুঃখিত বা ভয় নেই। নিজেদের নাম লিখিয়ে তাদের নিজ নিজ গৃহে ফিরে যাওয়া উচিত, তিনি তাদের জন্য দোয়া করবেন। পিছু থেকে সবচেয়ে ভাল ডাক্তার ডাকার প্রস্তাব দেয়া হলে তিনি বলেন, “আল্লাহর প্রতি তোমাদের ভরসা করা উচিত।”

১৭৫
হযরত মৌলভী নৌরুদ্দীন (রা.) - খলিফাতুল মসীহ আউয়াল

আমার ভরসা ডাক্তার কিংবা হাকিমের উপর নয়। আমি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর উপর নির্ভর করি, তামাদেরও তাই করা উচিত।”

তাঁর কপালের আঘাত একটি স্থায়ী ক্ষতে রূপ নেয়, আর তাঁর অসুস্থতা কয়েক মাস দীর্ঘম্য হয়। দুর্দিনের পর পুরো ৬ মাস অর্থাৎ ১৯১১ সনের ১৯শে মের পূর্বে তিনি মসজিদে মেটে পারেন নি আর জমুআ পড়াশোনা সক্ষম হন নিঃ। এটিও অনেক বড় একটি চাপ ছিল। কিন্তু যথাস্থায়ী পুনরুদ্ধারের এই সংগ্রামকেলা তিনি পুরো ব্যস্ততার মধ্যে কাটিয়েছেন এবং কর্তব্যপরায়ণতার একটি মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

১৯১০ সনের ২৯শে নভেম্বর তিনি জামাতের নামে একটি বাণী প্রেরণ করেন। এতে তিনি উল্লেখ করেন:

“আমি যে পরিকার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছি তা খেলার অগ্রিম রহমত, অনুকূলতা ও দয়ার কারণ হচ্ছে। আল্লাহ আমার কাছে অনেকের হন্দের প্রীতি ভালবাসার চিত্ত উমৃচ্ছন করেন, যাদেরকে আমার ভালবাসা উচিত। তাদের কতক এমনও আছেন যাদের সম্পর্কে আমার ধারণার ছিল না যে তারা আমাকে কতটা ভালবাসেন আর জামাতের সদস্যদের জন্য তাদের হৃদয়ে কতটা ভালবাসা আছে। দিনরাত তারা আমার অসুস্থতার সময় যেভাবে আমার সেবা করেছেন তা আমার জন্য তাদের প্রাপ্তি ভক্তির প্রমাণ। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাদের গুণাবলী প্রকাশ করেছেন। এটি এ অধিকের জন্য খোদাতাআলার তত্ত্বাবধানের প্রমাণ। আমি তাদের প্রতি যারপরানই কৃতজ্ঞ যারা বর্তমান অবস্থায় আমার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেছেন।

আমার মনে শান্তি আছে। আল্লাহর চেয়ে কেউ আমার কাছে বেশি প্রিয় নয় আর তাঁর মত আমার কেন সাহায্যকারী ও সহযোদ্ধাও নেই। আমার বর্তমান পরিস্থিতিতে তিনি আমার উপর অশেষ দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন। তিনি আমাকে একম স্থান থেকে রিয়ুক দিয়েছেন যা কেউ ভাবতেও পারে না। চিফ্টিসা পেশা যা আমার জীবিকার বাহিক অবলম্বন ও পেশা তাই তিনি বন্ধ কর দিয়েছেন। তিনি অজন্য স্থান থেকে আমার জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন। এমনকি আমার জীবনের দায়ে রিয়ুক পেচেছে এর জন্য আমি কাছে কঠিন বন্ধ নই বরং আমি আমার খোদার কাছে ধনী। মানুষের দৃষ্টিতে এ বিষয়গুলো বড় বিস্ময়কর!”

১৯১০ সনের ডিসেম্বরে একদিন তিনি বলেন, “রোগ-ব্যাধি বিভিন্নভাবে পরিকার কারণ হয়। খরচ বৃদ্ধি পায় আর আয় হ্রাস পায়। মানুষ পরিনির্ভর হয়ে

১৭৬
পড়ু। হাকিম হিসেবে আমার জানা আমার উৎস হলো চিকিত্সা ব্যবসা। এখন অসুস্থতার কারণে আমার সে আমার পথ বদল হয়ে গেছে। যারা আমার আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত নয় তারা মনে করে আমার জীবিকার মূল উৎস হলো চিকিত্সা পেশা। আল্লাহু এখন তা প্রত্যাহার করেছেন। আজকে আমার শ্রী আমাকে বলেছেন, তার কাছে কোন টাকা নেই এবং বলেন, আপনি আপনার অসুস্থতার কথা চিন্তা করেননি। অসুস্থতার সময় মানুষের আমার কোন উপায় থাকে না। এমনকি জীবনের নুন্ন্যতম চাহিদা পূরণেরও ব্যবস্থা থাকে না। আমি তাকে বললাম, আমার সাথে আমার খোদার ব্যবহার এমন নয়। যদি আল্লাহুর উপর আমার ভরসা না থাকত তাহলে আমি টাকা জমা করতাম।

যা দেখা গেল তাহলে তাঁর অজাতে ১০০ ও ২৫ টাকার বিলিয়নগুলো দুটি মানি অর্ডার আনে। এ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করা হলে তিনি একান্ত আবেগপূর্ব হয়ে পড়েন এবং খোদা তাআলার প্রাণচালা প্রশংসা করেন এবং বলেন, আমার সর্বশ্রমিত্তম খোদার দয়া এমনই। তিনি দেখালেন, চিকিৎসাকের দক্ষতার বরাত ছাড়াই তিনি আমাকে অকল্পনীয়ভাবে রিয়েক দান করেন, অথচ আমার শ্রী তা অনুধাবনে অপারগ। আমার বিশ্বাস দৃঢ় আমার খোদা সবসময় আমার সাথে এমনই ব্যবহার করেন।

আনাহার পফে থেকে এভাবে জীবিকার ব্যবস্থা সব সময় অব্যাহত ছিল। একদিন তিনি লেখে তিমুরকে বললেন, তাঁর অসুস্থতার সময় রোগ ও পতিত ইত্যাদি বাবদ যেসব খরচ হয়েছে এর একটি হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করে যে টাকা এসেছে তা থেকে দিয়ে দেয়া উচিত। তিনি বলেন, “আমার গ্রাহী আমার জীবিকার ব্যবস্থা করেন তাই আমি কোন মানুষের কাছে খোদা থাকতে চাই না। তিনিই আমার সকল প্রয়োজন পূরণ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।”

১৯১০ সনের ১৫ই ডিসেম্বর জানানো হয়, হয়তো খ্রিস্টধর্ম সোনার সত্যভাবনক উন্নতি হয়েছে। তাঁর কোন জুড়ো নেই আর কাশিও নেই। যদিও কিছুটা শক্তি ফিরে পেয়েছেন কিন্তু তিনি তখনও অনেক দুর্বল ছিলেন। তাঁর ফতে ধীরে ধীরে শক্তিচিহ্ন। তাঁর চোখে যে ফতে ছিল তা প্রায় ঠিক হয়ে গেছে। ফলে খাওয়া বা কথা বলতে আমি কোন কষ্ট ছিল না। কখনো কখনো তিনি অনিবৰ্দ্ধ ভূগতেন। তাঁর সামনে প্রত্যেক দিন সকাল ও সন্ধ্যা পরিচ্ছেদ করানো পাঠ করে। তিনি কোন কোন ধিক্ষা মন্ত্র করতেন আমি কোন কোন কর্মে নসীহত করতেন। একজন ইউরোপীয় মুসলমান তাঁর স্বাস্থ্যের খবর-খবর নিয়ে এলে তিনি তাঁর সাথে ইসলাম সম্পর্কে দীর্ঘ অলোচনা করেন।
হযরত মৌলভী নুরউদ্দীন (রা.) - খলিফাতুল মসীহ আউরাল

১৯১০ সনের বার্ষিক জলসা ২৫, ২৬ ও ২৭ ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। হযরত
খলিফাতুল মসীহ ২৫শে ডিসেম্বর 'লা ইলাহা ইলাহারাও' (আল্লাহ তিন
কোন উপাস্য নেই) বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। আবার ২৭শে ডিসেম্বর বিকেলে
'দৌয়ার অশ্চ' বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। তার দীর্ঘ বছর তিনি বলেন:

"আমাকে ডাক আমি তোমাদের ডাকা সাড়া দেব (৪০:৬১)। এটি একটি
অশ্চ। আর এটি খুব কার্যকরী, কিন্তু অনেক সময় ব্যবহারকারী দুর্বল হয়ে থাকে
এবং এর কার্যকারিতা অবধীকার করে। দৌয়ার অশ্চকেই বর্তমানে মানবজাতি
পরিপালন করছে। আমাদের জামাতের সদস্যদের একে শাসিত করা ও ব্যবহার
করা উচিত। তাদের অনর্গত দৌয়া করা উচিত। আর খোদার দরবারে আকুতি
মিনতি করতে গিয়ে কথনে ক্লাস্ত হওয়া উচিত নয়। আমি এট অনুস্ক যে কেউ
ভাবতে পারে না আমি কতক্ষণ বাচবে, তাই এটি আমার শেষ নীহাত।
তৌরেতের মাধ্যমে দৌয়ার অশ্চকে শাসিত কর। আল্লাহর জামাতের মাঝে কোন
অনেক থাকা উচিত নয়। কেননা কোন জামাতের মধ্যে যদি অনেক দেখা দেয়
তাহলে তা ঐশী শাসিত করা হয়। যেহেতু পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:
"অতঃপর তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছে যখন তারা তা ভুলে গেল, তখন
আমরা তাদেরকে উপদেশ দিলাম, যারা মন্দ কাজ হতে নিষেধ করত এবং আমরা
যালোমদেরকে এক কর্তার শাসনে ধৃত করলাম কেননা তারা দূর্বল করত
(৭:১৬৬)। এখন পর্যন্ত এরূপ কোন শাসন থেকে আপনারা নিরাপদ রয়েছেন।
খোদার দয়া ও রহমত যদি না থাকে তাহলে দৌয়া কোন কাজে আসে না। তাই
আমি আপনাদের উপদেশ দিচ্ছি, অনর্গত দৌয়া করতে থাকুন। আমি আবার
বলছি, অনর্গত দৌয়া করলে যেন জামাত মতভেদ থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। এখন
পর্যন্ত খোদার যে অনুরূপ জামাতের উপর অবিন্যস্ত হয়েছে তা দৌয়ারই ফল।
আমার জন্য দৌয়া করলে যেন আমার সহকর্মীরা নিষ্ঠাবান, বিশ্বাসী, খোদার
দরবারে সমর্পিত হয়, পরোপকারী ও অনুগামকারী হয় আর আমার যেন বিরোধী না
হয়। আমি যেন এমন মোবালেগ পাই যারা যুক্তিপূর্ণ আওয়ামিকাদের নিয়ে তবীবি
করবে, যারা সত্ত্বে খুবে, জাগতিক আকর্ষণবৃদ্ধি হবে আর আত্মরক্ষার
পাশাপাশি তারা যেন আঁ-হযরত (সাহ)-এর আদর্শ সম্পর্কে অহিংস হয়।"

তিনি নিম্নলিখিত কথায় মাধ্যমে বক্তব্য শেষ করেন, "আমার প্রতি আপনাদের
কিছু দায়িত্ব আছে:

১. আপনারা আমার হাতে বয়ান করেছেন তাই আমার প্রতি আনুগত্য
প্রদর্শনে আপনারা অস্তৃতীভূত। যে অস্তৃক ভঙ্গ করে সে মুনাফিক হয়ে যায়।

১৭৮
অসুস্থতা

আমি শক্তিত যে আপনাদের কেউ আমার অবাধ্য হয়ে আবার মুনাফিক না হয়ে যায়।

২. আমি আপনাদের জন্য বেদনার সাথে দোয়া করি।

৩. অসুস্থতার কারণে আমি সেজদা করতে পারি না তবুও আমি সেজদায় দীর্ঘক্ষণ আপনাদের জন্য আত্মিকভাবে দোয়া করেছি।

সুতরাং আমার প্রতি আনুগত্যের নিদর্শনস্রূপ আপনারা নিজেদের অভ্যত্রীণ মতস্ততা ও অনুকূল পরিহার করবেন।”

বার্ষিক জলসার শেষে তিনি বিভিন্ন জামাতের প্রেসিডেন্ট ও আমেলাকে ডেকে পাঠান এবং তাদেরকে বলেন:

“আপনাদের ডাকার কারণ হলো, গত বছর আপনারা আমার সাথে দেখা করেন নি। তাই আমি আপনাদের প্রতি অস্পষ্ট ছিলাম আর মনাহিঁর করেছি, যদিও আমি জীবিত থাকি তাহলে একবছর আমি আপনাদেরকে নসিহত করবো।

কখনো ভাবিনি যে আমি জামাতের আধ্যাত্মিক প্রধান হবো। কিন্তু যখন আল্লাহ চাইলেন তিনি আমাকে তৎক্ষণিকভাবে নিযুক্ত করলেন। আপনারা জামাতের কর্মকর্তব্য যা। এতে কোন সন্দেহ নেই যে আপনারা কাজ করতে গিয়ে প্রায়শ সমস্তের সন্তুষ্ট হন। কেউ হতভাগ্য পারে যে তাকে কেন পাড় দেয়া হলো না আমায় সে কারণে মনে ক্ষতি পোষণ করতে পারে। আমার ব্যক্তিগত মনোরুঢ়ি হলো, হয়ের মনীহা মাওদুল (আ) এর ভিক্ষকার পর যদি তাঁর ছোট মেয়ে আমাতুল হাফিজ বেগমকেও খলিফা নিযুক্ত করা হতো তাহলে সর্বপ্রথম আমি তাঁর হাতে বর্জন প্রণেতা করতাম। সেভাবে তাঁর এতাত করতাম এবং তাঁর পিতাকে করেছি। সাথে এ নিষ্ঠ বিস্মাদ পোষণ করতাম যে আল্লাহ সে আলাদা যেমন প্রতিপ্রশ্ন দিয়েছেন তা তাঁর হাতেও পূর্ণ হবে। আমার একথা বলার উদ্দেশ্য হলো কোন ব্যক্তির হাতে এমন বাসনা পোষণ করা উচিত নয়।

আমি আপনাদেরকে কথার দেখাই দিয়ে বলছি, আমার প্রথম নসিহত করে আপনারা হয়তো স্থান দিন। তাহলে সমস্তের মুখে ঐশী দিকনির্দেশনাকে স্মরণ রাখবেন, ভেদাভেদেকে এড়িয়ে চলবেন, পাছে আপনাদের পা পিছলে যায় এবং আপনাদের শক্তি হারিয়ে যায়। ‘তোমরা ধর্ম ধারণ কর। নিষ্ঠ আল্লাহ ধীর্যাশিদের সাথে আছেন’ (৮:৪৭)। আল্লাহ মানব প্রকৃতির প্রতি হিসেবে জানতেন যে মতানিক্ষ থাকবে। তাই তিনি নির্দেশ দিয়েছেন ধীর্য ধারণ কর; নিষ্ঠ আল্লাহ ধীর্য্যাশিদের সাথে আছেন। অতএব যদি কোন কর্মকর্তৃর সাথে

১৭৯
হযরত মৌলিকী নুরউদ্দিন (রা.) - খলিফাতুল মসীহ আউয়াল

মতানৈক্য দেখা দেয় তাহলে ধৈর্য ধারণ করলে। যে খোদার সম্ভাবনা জন্য ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ তাঁর সহায়তা হন।

আপনাদের না হইতে করা আমার দায়িত্ব। সকল ‘মা’রফ’ বিষয়ে আমার প্রতি আনুগত্যের অস্বীকার হবার সূত্রাত আমি আপনাদের বলি, নিম্নলিখিত বিষয়ে আমার আনুগত্য করুন। অত্যন্ত একাড়িয়ে চলন। যখনই আপনার মতবাদ দেখেন তখন সজ্জাবন্দ হংসে বেণ আপনাদের মধ্যে দৃষ্টিকোণ সৃষ্টি হয়। সম্ভাব্য মুখে ভয় পাবেন না। সকল পরিস্থিতিতে এর মোকাবেলা করতে হবে। আমাকে আমার সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়।

কেন কেন সদস্য বিহিন হয়েছে আর চরম অসুজ্ঞ ও অভ্যন্ত প্রদর্শন করেছে কিন্তু আমি সহায় করেছি। তাদের বোঝার হয়নি যে জামাতের ইমামের প্রতি তাদের কে দায়িত্ব। জামাতের অভাবই এসন বুদ্ধিমানতা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তাঁর দায়িত্ব, তিনি স্বয়ং তাদের হস্তকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন। হস্ত খোদার নিয়ন্ত্রণে। তিনি তাদের সকলকে আমার প্রতি আকৃষ্ট করেছেন। এভাবে তারা, আমরা এবং পুরুষ জামাত তাঁর দয়া ও অনুগত্য প্রদর্শন করেছি। সুতরাং মতবাদ একাড়িয়ে চলন এবং জামাতের সদস্যদেরও একাজে অনুগমিত কর।

এসন পরিস্থিতিতে মহিমা সৃষ্টি করতে হয়। ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিয়েছেন।

আর একটি বিষয় যার প্রতি আমি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই তাহলে যেখানে বড় বড় জামাত আছে সেখানে জামাতের উন্নতি কিছুটা স্থিতিশীল হয়ে গেছে। এর কারণ কি আমি তা জানি। আপনাদেরকে দুটি বিশ্ব সংস্কারের না হইতে করা। প্রথমটি হলো, কর্মক্ষমতার অংশ মিনিতে সাথে দেয়া করলে। আপনারা জানেন, চরম বা সূর্য এগারের সময় দেয়া করতে হয়। আ-হযরত (সা) এগারের সময় কাজের দায়িত্ব হয় পড়তেন, যদিও তিনি জানতেন যে এটি একটি প্রাকৃতিক বিধান। যেভাবে কুরআনে বলা হয়েছে, ‘আমরা চপ্রের জন্য বিভিন্ন মঞ্জুল নির্বারণ করেছি’ (৩৬:৪০)। তিনি জানতেন যে ‘গ্রহণ’-এর সময় চরম বা সূর্যের আলো হারিয়ে যাম না বর্ণ দৃষ্টিহীন হতে পার্দার আড়ালে চলে যায়। কিন্তু এ সময় তিনি ব্যতিক্রম হয়ে যেতেন। কেননা তাকে তবলিগের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তাঁর আশ্চর্য হতে যে তবলিগের পথে না কোথাও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়ে যায়। তাই ‘গ্রহণ’ চলাকালে তিনি অনেক দোয়া করতেন, সন্তান দিন তেন তাঁর কৃতদাস মুক্ত করতেন।

১৮০
অনুষ্ঠান

নিবেধ দাশনিকরা এ রহস্য বুঝতে অক্ষম। কিন্তু একজন নবী জানেন যে তিনি নিজে দৃষ্টিময় তবুও তাঁর আশক্ষা হয়, প্রহরের প্রভাবে সূর্য ও চন্দ্রের আলো যেভাবে বাধ্যপ্রস্ত হয় তাঁর আলাও না পাচ্ছে সেভাবে বাধ্যপ্রস্ত হয়। তাই তিনি দেওয়া ও সদকা করেন। উল্লিখিত পথে অস্তরায় দূর করার দ্বিতীয় মাধ্যম হলো সদকা দেওয়া। স্মরণ রাখবেন, যেখানে উল্লিখিত গতি স্থিতি হয়ে গেছে সেখানে কর্মকর্তাবৃন্দ ও মুখ করুন এবং নামায়ে খ্যাতার সমীপে দেওয়া করুন, সদকা দিন আর ব্যক্তিগতভাবে 'দাত্বা কর্ম' খরচ করুন মেনে আলাহ তাআলা উল্লিখিত পথে যে প্রতিবন্ধকতা আছে তা দয়াপরবশ হয়ে দূরীভূত করেন। আমি সদকা প্রদান আপনাদের জন্য আবশ্যক করছি। কেননা সদকা ও দাত্বা কাজে খরচ ঐশী কোথাকে দূরীভূত করে।

শেষে আমি আপনাদেরকে জামাতের টাকা কিভাবে, কোন খাতে পরিচালিত করা হয় সে সম্পর্কে সংস্থীপোষণের বিষয়ে সাবধান করছি। কেন্দ্রে যারা এর সাথে সংশ্লিষ্ট তারা সৎ এবং বিশ্বাস। সুতরাং সে বিষয়ে চিন্তিত হবেন না। যা কিছু আমার কাছে প্রেরিত হয় এর জন্য আমি নিজেও দায়বদ্ধ। আমি আপনাদের নিষ্ঠায় দিতে চাই যে আলাহ আমাকে অর্থলাভী করেন নি। টাকার প্রতি আমার কোন লোভ নেই। আমি আমার স্ত্রীকে একটি নির্দিষ্ট অংকের খরচ দিয়ে থাকি। আমার বয় হওয়ার কোন সাধ নেই।

আমি জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত। আপনাদের আত্মায় কৃতকার্য আমি আমার অবরত আপনাদের জন্য দেওয়া করি। আমি আমার সন্তানেদের জন্য কোন টাকা পাইছি রাখি নি। আমি আমার পিতা বা ভাইরের পক্ষ থেকে কোন টাকা পাইনি কিন্তু আমার খোদা আমাকে অংটালি দিয়েছেন আর দেওয়া অব্যাহত রেখেছেন। সুতরাং এবিষয়ে সকল কূথ্যায়া পরিত্যাগ করুন। পরস্পরের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করুন, অনেকা পরিত্যাগ করুন এবং কারো সম্পর্কে কুঠারণা পোষণ করবেন না। কেউ যদি আপনার সাথে রাগ করে তাহলে দৈর্ঘ্য প্রদর্শন করুন আর অনবরত দেওয়া করুন।

আপনাদেরকে বলার জন্য একধাপগুলো নিয়ে আমি সারা বছর তৈরী করে। কেউ হয়ে করবে পারে, কোন সাধ্যতে করার আমি চারছিলাম যে আপনারা আমার সাথে দেখা করুন। আপনাদের কাছে কাছে আমি কিছু চাই না। স্বর্গে আমার নাম 'আমাল বাসেত'। এর অর্থ হলো প্রাচুর্যশীল খোদার দাস। তিনি আমাকে যা প্রয়োজন হয় তাই দেন। আমার উপর তাঁর দূঃখ অতি মহান। কিছু দিন পূর্বে আমি

১৮১
হযরত মৌলভী নূরউদ্দিন (রা.) - খলীফাতুল মসীহ আউয়াল

যে জলদের পুঞ্জ আবৃহণ করলাম তা থেকে পড়ে যাই। যদি তা আমার চোখে লাখি মারত তাহলে কি আমার উপকারে আসতে? কি তার দয়ায় আমি রক্ষা পেয়েছি। বিদায়ী বছর অনেক ভুল-পাপি হয়েছে, কিন্তু আমি আশা করি আগত বছরে সকল পাপনির অবসান হবে।”

১৯১১ সালের এই জানুয়ারিতে মেডিকেল রিপোর্ট অনুসারে জলনাল দিনগুলোতে প্রত্যেক দিন হযরত খলীফাতুল মসীহুর ক্ষেত্রে পত্ত বদল করা হতো আর তিনি একটি পত্ত বেঁধে রাখতেন। এরপর কত শুকিয়ে যায় আর পত্তের খুলে ফেলা হয়। জলনাল দিনগুলোর ব্যাপতা, আগত অধিবাসীদের অভ্যুখন জানানো এবং তাদের সাথে কথা বলতে গিয়ে তিনি অমূল্য ক্রাপ হয়ে পড়েন। যে দুটো দাতের কারণে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল তা তুলে ফেলা হয়। এর কেবল হিসেবে তিনি দুদিন জুরে ভূগোল। জুর নামার পরও তিনি কখনো কখনো স্বায়ত্তি ব্যাখ্যা জরিত হন। সবসময় তিনি হাস্যক্তিক্ষণ থাকতেন আর তাঁর চেহারায় কোন কষ্ট বা উদ্দেশের লক্ষ্যে প্রকাশ পেত না। দাত উঠানার পর তিনি বলেন, প্রত্যেক ব্যাখ্যায়ই একটা পুরস্কার আছে। আমি এখন ঠাকুর পানি তৃতী সহকারে পান করতে পারি।

এক সপ্তাহ পর জানানো হয় যে তখনও মারে মারে তাঁর স্বায়ত্তি ব্যাখ্যা হচ্ছিল আর দাত উঠানার কারণে ব্যাখ্যায় মুখ ফুলে যায়।

১৯১৮ সালের জানুয়ারীতে রিপোর্ট অনুসারে স্বায়ত্তি ব্যাখ্যা ও অভিব্যক্তি অব্যাহত ছিল আর একরাত অনিদ্রায় কাটে।

২২শে জানুয়ারিতে ডাং মির্জা ইয়াকুব বেগ রিপোর্ট করেন, তিনি সার্বিক দিক থেকে উন্নতি করেছেন। সমানিত রোগী জুরমুক্ত একটি আরামদায়ক রাতি যাপন করেন। তিনি ক্রমশঃ শক্তি ফিরে পাচ্ছিলেন। পরীক্ষা নিরীক্ষণ পর ডাঙ্গ যখন প্রায় ফিরে যাচ্ছিলেন তখন রোগীকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনার বিশেষ কিছু প্রকাশ আছে কি? তিনি বলেন, “আমার খোদায় যদি আমার প্রতি সম্ভার হব তাহলে সেটিই আমার হাতের পরম বাসনা।” (একথা তিনি তিনবার বলেন)। আর আমার মনোকাঁপ্লা হলো, আপনার আনুষ্ঠানিক করন এবং বিচ্ছিন্ন হবেন না। কোন কলহে জড়িয়ে না। আর এ পৃথিবীর সবকিছু পেয়েছি। আমার পার্থিব কোন কামনা-বাসনার নেই। আমার সকল চাওয়া-পাওয়া হলো, আমি যখন মারা যেনা তখন আমার প্রস্তু যেন আমার প্রতি সম্ভাব থাকে। সবাইকে তাই বল। আর এ পৃথিবীর প্রতি ক্ষুধা করি না। আমাকে অনেক দানে ভূষিত করা হয়েছে, অনেক দেয়া।

১৮২
হয়েছে, অনেক খরচ করেছি আর অনেক কিছু ছেড়ে দিয়েছি। আমার আর কোন চাহিদা নেই। দীর্ঘ অসুস্থতা আমার ইমান নষ্ট করতে পারে এ আশঙ্কায় অনেক সময় আমি আরোগ্য কামনা করি। হে আল্লাহ! তোমার কাছে আমার মিনতি, তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হও।

আমার জ্ঞানের মধ্যে যেন ভাস্ত সৃষ্টি না হয় এটিই আমার পরম চাওয়া। আমার দৃষ্টিতে এ পৃথিবীর কোন অর্থই নেই। যদি আপনারা ঐক্যবদ্ধ থাকেন তাহলে আমি যারপরনাই আনন্দিত হবো। অসুস্থতার কারণে আমি সেজদা করতে পারি না তবুও আমি আপনাদের জন্য সেজদায় দোয়া করি। আমি আপনাদের কল্যাণের জন্য বারংবার দোয়া করেছি। আমি আপনাদের নিকট কিছু প্রত্যাশা করি না আর আমার ইহ্মাতাগতিক কোন কামনা-বাসনা নেই। আমার প্রভূ ধর্মানুসারে আমাকে প্রয়োজনের উদ্দেশ্য রয়েছে প্রদান করেন। আপনারা ভেদাভেদ ও অস্ত্রকলার সম্পর্কে সাধারণ। যদি তা পরিত্যাগ করেন তাহলে আপনাদের উপর আল্লাহর অনন্ত আশ্চর্য বরিত হবে এবং আপনাদের সমাজের ও শক্তি অতুল থাকবে। অন্যথায় আপনাদের সবকিছু হারিয়ে যাবে।

আমি কখনো কোন নির্দেশ সার্ধেরতাবশত জারি করিনি। আমার সকল নির্দেশ খোদার সত্ত্বাটির অনুরূপতাতে ছিল। একাংশ আন্তরিকতার সাথে নামাজ পড় এবং নিয়মিত দোয়া কর। নামাজ হলো দোয়া। অনেকাংশ আমার বৈরাগীকে বৃদ্ধি পেতে দেবে না। কেননা তা অনেক ক্ষতি করেছে। যদি ভেদাভেদ দেখা দেয় তাহলে নীরবতা অবলম্বন কর। নিজের জন্য এবং বিদেশীদের জন্য দোয়া কর।

'লা ইলাহা ইলাহাই মুহাম্মদুর রসূলাল্লাহ' বারংবার পড়। কুরআনকে দৃঢ়ভাবে আকর্ষণ কর। তা অজ্ঞাত ধারায় পড় এবং এর উপর আমল কর। আমার যত্নের সম্পর্কে আছে, আমি প্রভু হিসেবে আল্লাহকে, বিশ্বাস হিসেবে ইসলাম এবং বসুল হিসেবে মুহাম্মদ (সাল্লায়-এর মায়ে করে সন্তুষ্ট। এর সাথে আমি আপনাদেরকে আল্লাহর হাতে সোপার্দ করি।"

পরবর্তী মেডিকেল রিপোর্ট অনুসারে হযরত খলিফাতুল মসীহর স্বাস্থ্য ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ আরোগ্যের দিকে এগোছিল। তার অন্য সকল ক্ষত থেকে যায় কিছু দান কপালের ক্ষতটি একটি স্থায়ী জখমে রূপ নেয়। তিনি নিয়মিত তাঁর বৈঠকে কার্যক্রম চালিয়ে যেতেন আর সাধারণ শেষ সীমা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি দরস দিতেন এবং কখনো কখনো রোগীও দেখতেন আর তাদের জন্য ব্যবস্থাপনা প্রস্তাব করতেন। ৩০শে জানুয়ারী তিনি মখদুম মিয়া মুহাম্মদ সিদ্দিকী

১৮৩
হযরত মৌলিকী নুরউদ্দীন (রা.) - খেলীফাতুল মসীহু আউয়াল

সাহেবকে কাগজ কলম নিয়ে তাঁর কাছে আসতে বলেন এবং তাকে কুরআনের আযাত, ‘এটি কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে আমরা তোমাদের উপর এক উৎকর্ষপূর্ণ গ্রহ নায়েল করেছি যা তাদের নিকট আবৃত্তি করা হয়, নিচ্ছ এতে মুমিনদের জন্য বিশেষ রহমত ও উপদেশ রয়েছে’ (২৯:৫২)। তিনি বলেন পড়ার নিদর্শন দেন। তেলাওয়াতের পর তিনি তাঁকে বলেন, “এ আযাতে আল্লাহ সত্যসন্ধানী উন্মুক্তির জন্য সব কটি ধাপ বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ জিজ্ঞাসার করেন: এটি কি সে গ্রহ নয় যা আমরা মুহাম্মদ (সাও) এর নিকট প্রেরণ করেছি; যা বিশ্বাসীদের সকল প্রয়োজনপূর্ণ জন্য যথেষ্ট? এতে তাদের জন্য রহমত এবং সকল প্রকার উপদেশবাণী লিপিবদ্ধ রয়েছে।

আমি প্রকৃতির নিয়ম-কানুন এবং সকল প্রকার দিব্যদর্শন সম্পর্কে খুব ভালভাবে অবগত আছি। আমি মনে করি, এই ঐশ্বী সাক্ষর বাদ দিয়ে আধ্যাত্মিক উন্মুক্তির অন্য কোন উপায় যুক্তি বেড়ানো চরম অকৃতজ্ঞতার শাখার আর আমি একে বক্তার করিতা মনে করি। এরকম আমরা সকলই মমতা রেখে। আমার চলে যাবার পর যদি এর বিরোধিতাকে কোন ধারণা তোমাদের মনে দানা বাধে তাহলে ‘লা হাওলা ওলা কুওহাতা ইব্রা বিলাহাইল আলিয়িল আরাম’ (অন্ত উচ্চ ও অতি মহিয়ান খোদার সাহায্য ছাড়া কোন ভাল কাজ করা বা মনে করা প্রতিষ্ঠা করার সাধ্য করার নেই) এর মাধ্যমে হেদায়াত সঙ্কার করবে।

এরপর আর একটি ঐশ্বী সাক্ষরকে বিবেচনায় রাখবে যা পবিত্র কুরআনের সূচনা বর্ণিত হয়েছে। যথা ‘আমি সবকৃত্তী আল্লাহ বলছি, এটি পরিপূর্ণ গ্রহ। এতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই এবং খোদার তীরের জন্য হেদায়াত সম্পূর্ণ’ (২২:৩)। এর অর্থ হলো কুরআনই তাহলে অর্জনের একমাত্র পথ। আমি ঐশ্বী নির্দেশে তোমার সামনে এটি উল্লেখ করছি। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে করিম (সাও) আল্লাহর নিরপেক্ষতা লাভের জন্য বিভিন্ন মাধ্যম অবলম্বন করতেন। কিন্তু কুরআনের শেষ দুটি সূরা নায়েল হবার পর তিনি অন্য সবকৃত্তী বাদ দিয়ে নে দুটি সূরায় সীমাবদ্ধ থাকেন।

তৃতীয় সাক্ষর হলো: ‘তুমি বল, আমি কেবল তার অনুগমন করি যা আমার প্রভুর পক্ষ হতে আমার প্রতি ওহে করা হয় এগুলো মুমিন জাতির জন্য তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে সমাগত সমুজ্জ্বল প্রমাণ, হেদায়াত ও রহমত সম্পূর্ণ। যখন কুরআন পাঠ করা হয় নীরবে শ্রবণ কর যেহ তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা যায়’ (৭:২০৪-২০৫)।
অসুস্থতা

১৯১১ সনের ১০ই ফেব্রুয়ারী হয়ত খুলিফাতুল মসীহ উপস্থিত সাথীদের সমীক্ষনপূর্বক বলেন, "আমার উপর খোদার দয়া অতি মহান। অসুস্থতার সময় এ অধরনের জন্য তিনি তাঁর শক্তি ও শয়নের আপেক্ষিক সংযোগ রেখেছেন। দৈবার করুণাচার্যের উপর নতুনভাবে আমার বিশ্বাস জন্মেছে। দৈবার আমার জন্য তাঁর দয়ার অসাধারণ একটি মাধ্যম। আমার প্রভু আমার উপর অশেষ অনুগ্রহ করেছেন। হাঁ! আপনাদের সামনে তা বিস্তারিত বর্ণনা করার যদি শক্তি থাকত। আজ কি আমার উপর এ ওহে হয়েছে, 'আপন দানে তুমি আমার সমর্পণ কর আর তুমি ছাড়। অন্য সবার থেকে আমার বিমূর্ত করে দাও।' আমি অন্তরায় ভুগছিলাম। ভালোরা আমাকে খুদের ওষুধ প্রয়োগ করছিলেন আর বার বার বার্তা হচ্ছিলেন।

গত রাতে ওষুধ খাইনি আর আমি ৫ ঘটা ঘুমিয়েছি। খোদা সরবার্ষিকর্ম বাদাম, তিনি যা চান করেন। আমার এ নেতৃত্বে সমর্পণ রাখবেন। আল্লাহর সত্তাতে বিশ্বাস রাখবেন এবং তাঁর সত্তা অজ্ঞাতের চেষ্টা করতে গিয়ে উচ্চাঁশা পোষণ করবেন। সমস্ত দেখে হতে দাম হবেন না কারণ তা আপনাদেরকে সমান্তর করার জন্য আসে। আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবেন। এটি খুব সত্যিকর্ণ এবং ছেট কিন্তু এটি একান্ত আবশ্যক বিষয়। এটিকে সমর্পণ রাখবেন, অবহেলা করবেন না। আল্লাহ আপনাদের সাথী, হাসি ও নাসের হোন, আমীন।" ১০২

১৯১১ সনের ২৭শে ফেব্রুয়ারী কেউ হয়ত খুলিফাতুল মসীহকে প্রশ্ন করে, আহমদী ও গজরের আহমদীদের মধ্যে যে মতপার্থক্য রয়েছে সেগুলো মৌলিক না কি ব্যাখ্যাগত? তিনি বলেন, একথা বলা ঠিক নয় যে এ সকল পার্থক্য আনুসারিক। আমাদের নামেও তাদের নামেও মত আর যাকাত, হজ্জ ও রোয়াতেও তাদের সাথে কোন পার্থক্য নেই। আমি মনে করি আমাদের নেতৃত্ব বিষয়ে মতপার্থক্য আছে বা এভাবে বলা যেতে পারে, ঈমানের জন্য আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস আবশ্যক, তাঁর ফিরিশ্তা, তাঁর কিতাব, তাঁর রসূল, আদেহের ভাল মন্দ এবং পুনরুদ্ধার দিবসেও বিশ্বাস অবহারিত। কিন্তু এখানে আমাদের মতপার্থক্য আমাদের ব্যাখ্যাতার তালিকা থেকে অধ্যাত্মীয় হতে পারে না। আল্লাহর কোন প্রত্যাশিত পুনরুদ্ধার অধ্যাত্মীয় করার করলে মানুষ অবিশ্বাসী হয়ে যায়। আমাদের বিশ্বাসবাদীরা হয়ত মিথ্যা সাহেবেকে খোদার প্রত্যাশিত হওয়ার দাবীকে অধ্যাত্মীয় করে। এটি ব্যাখ্যাতার কোন বিষয়ই নয়। কুরআন বলে, 'আমারা তাদের কাছে কোন পার্থক্য করি না' (২:৫২৮)। প্রতিষ্ঠাত মসীহকে না মানা পার্থক্য করার শাসিল। আমারা হয়ত মুহাম্মদ (সাহ)কে সেভেকে খাতামান নবীন বলে বিশ্বাস করি যেভাবে কুরআনে বলা হয়েছে (৩৩:৪১)।

১৮৫
হযরত মৌলিকী নূরউদ্দিন (রা.) - খলিফাতুল মসীহ আউয়াল

আমারা বিশ্বাস করি, তাকে এভাবে যে মানে না সে অবিভাজ্য। আমারা আমাদের বিশ্বাসবাদীদের সাথে এর ব্যাখ্যায় মতপার্থক্য রাখি কিন্তু সে মতপার্থক্যের 'আমারা রসূলের মাঝে কোন পার্থক্য করি না'র সাথে কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং আমি মনে করি আমাদের ও গোরা আহমদীদের মধ্যে একটি নীতিপূর্ণ পার্থক্য আছে।

একই দিন তিনি লাহোরের নবাব ফাতেহ আলী খান সাহেবকে চিঠি লিখে মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় তহবিলে এক হাজার রূপ অনুদানের প্রতিশ্রুতি দেন আর জামাতের সদস্যদের নিম্নলিখিত নির্দেশ দেন: "ভারতে মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা রয়েছে। আমাদের কোন কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করেছেন, এ তহবিল তাদের অনুদান দেয়া উচিত হবে কি-না? জামাতের সদস্যদের অবগতির জন্য ঘোষণা করা হচ্ছে, যদিও আমাদের জামাতের অনেক দূরত্বপূর্ণ স্থানে, সেসব কাজের জন্য জামাতের সদস্যদের অনেক বড় বড় অংশ থরর করতে হয়, কিন্তু মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এটি একটি মানব ক্লায়েন্টসিল্ক প্রকল্প তাই আমি মনে করি বম্বার এ কাজকে তরাইবি করার জন্য সার্বিকভাবে অবদান রাখা আবশ্যক।" ১৯১১

১৯১১ সনের এখনের প্রথম দিকে একটি মুসলিম দৈনিক পত্র থেকে প্রস্তাব দেয়া হয়, আ-হযরত (সাহ)-এর জন্য দিবস একটি উৎসব হিসেবে উদযাপন করা উচিত। শিমলার আহমদীয়া মুসলিম জামাত এ বিষয়ে হয়ুরের দিবস নির্দেশ করে। তিনি উভয়ের বলেন, 'আ-হযরত (সাহ) মুসলিমদের জন্য শুধু দুটো উৎসব নির্ধারিত করেছেন। এছাড়া অন্যান্য একটি উৎসবের দিন। এর বাইরে কোন উৎসব হবে অনাকাঙ্ক্ষিত বিদ্যুত। এভাবে মানুষ উৎসবের পর উৎসব যোগ করতে থাকবে আর আহমদীরা হযরত মসীহ মাওলুদ (আহ)-এর প্রথম ওই প্রান্তি দিবস এবং মূর্ত্তি দিবস উদযাপন করতে চাইবে। মহানবী (সাহ)-এর সাহাবীরা তাঁর জন্য নিবেদিত ছিলেন কিন্তু তারা কোন তৃতীয় উৎসব পালন করেন নি। হযরত মসীহ মাওলুদ মহানবী (সাহ)-এর সবচেয়ে বড় প্রেমিক ছিলেন। এর উৎসবের যদি অনুমতি থাকতো তা হলে তিনি উদযাপন করতেন। এর প্রস্তাবকারী কাউকে বিবেচনা করতেন। যারা এমন প্রস্তাব করে তারা শুধু জনক্ষেত্র চায়। তারা কোন আধ্যাত্মিক প্রেরণায় উদ্দেশ্য নয়।

হযরত খলিফাতুল মসীহ দুর্ঘটনায় প্রায় ছয় মাস পর ১৯১১ সনের ১৯শে সে প্রথমবার জুমআর খুতাবা প্রদান করেন। এদিনটি ছিল পূর্বে জামাতের জন্য মহা আনন্দের দিন। এরপর বেশ কিছু দিন পর্যন্ত তিনি মসজিদে জামাতের সাথে

১৮৬
জুমাবার নামায় পড়তেন আর জুমাবার নামায়সহ অন্যসব নামায তাঁর নিদেশে হযরত মির্রা বশীর উদ্দিন মহম্মদ আহমদ সাহেবের পড়তেন। একবার মৌলিকী মোহাম্মদ আলী হাফেস রৌশন আলী সাহেবকে বলেন, হযরত খলিফাতুল মনসীহকে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যরস ও অধিক শিক্ষিত আলেম থাকতে তিনি কেন মুক্ত সাহেববাদকে নামায পড়নার নিদেশ দিয়েছেন। হাফেজ রৌশন আলী কারা নাম উল্লেখ না করে প্রথমে জিজ্ঞেস করলেন এবং এ উত্তর পেলেন, “কুরআন বলে:-নিজের আল্লাহর দুর্দশা তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সমাপ্ত সে যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক মূল্যবান (৪৯:১৪)। পুরো জামাতে মির্রা মাহমুদ আহমদের মত একজন মূল্যবান দেখাও। তবে কি আমি নামায পড়ানো ও খুব বা দেয়ার জন্য মৌলিকী মোহাম্মদ আলীকে নিযুক্ত করব?”

বৃত্তিশ সরকার যোগ্য করেন, ১৯১১ সনের ১২ই ডিসেম্বর সমার ৫ম জয়ের সম্মানে দিল্লীতে একটি রাজ্যাভিষেক দরবার অনুষ্ঠিত হবে। হযরত খলিফাতুল মসীহ ভালবেন, এ সুযোগে গভর্নরের মাধ্যমে সমারকে অনুরোধ করা যেতে পারে যে মুসলমানদের জুমাবার নামাযের জন্য দু ঘটার অতিরিক্ত ছুটি দেয়া হোক। এ উদ্দেশ্যে তিনি একটি মনোক্তিপত্র প্রকাশ করলেন এবং সে সময় সময়ের ১৯১১ সনের ১লা জুলাই নির্মোচ্য যোগ্য করেন:

“জুমাবারের ইসলামে একটি একাংশ আশিষপূর্ণ দিবস হিসেবে গণ্য করা হয়। আর মুসলমানরা এটিকে একটি উৎসব হিসেবে দেখে। জুমাবার দিন দুপুরের নামাযে অংশগ্রহণ মুসলমানদের জন্য আবশ্যক। দুটো ঈদ উৎসবের তুলনায় এতে অংশগ্রহণের উপর বেশি গুরুত্ব রাখা হয়েছে। যেমন, কুরআনের বলা হয়েছে, ‘হে যারা ইসলাম এনেছি! যখন তোমাদেরকে জুমাবার দিনে নামাযের জন্য আহবান করা হয় তখন আল্লাহর সমর্পণের জন্য দুর্দশা অর্থাৎ কাফের-বিদ্রোহ পরিত্যাগ কর’ (৬২:১০)। সে কারণে ইসলামের সূচনা থেকে জুমাবার সকল মুসলিম দেশে ছুটির দিন হিসেবে উদ্যাপিত হয়ে আসছে। ভারতের এক অন্য জুমাবার ছুটির দিন হিসেবে উদ্যাপিত করা হয়েছে। বাস্তবতে এখন উল্লেখ করা হয়েছে যে মুসলমানদেরকে এক নামায পড়ার অনুমতি দেয় না। মসজিদে আসা, খুব শুনা ও জামাতদ্বয় হয়ে নামায আদায় আবশ্যক।

সমারের ধর্মীয় বাধ্যবাধ্যতার কারণে রবীবার যেহেতু ছুটির দিন তাই সঞ্চার দুর্দিন ছুটি দেয়াকে সরকারি ব্যবসা-বাণিজ্য অনুমোদন দেয় না। তাই এমন কিছু প্রস্তাব করা দরকার যা প্রশাসনিক কোন জটিলতা সৃষ্টি না করে মুসলমানদের
হযরত মৌলভী নূরউদ্দিন (রা.) - খ্লীফাতুল মসীহ আউয়াল

কাকুক্ত লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে। একটি সহজ উপায় হলো জুমআর সময় দু' ঘটার জন্য সকল অফিস-আদালত, কুলকলেজ ইত্যাদি বন্ধ রাখা বা মুসলমান কর্মচারী ও ছাত্রদের সে সময়ের জন্য ছুটি দেয়া যাতে তারা জুমআর নামাজে অংশ গ্রহণ করতে পারে। সকল বিভাগে এ বিষয়ে একটি সরকারী নির্দেশ জারি করা যেতে পারে।

আমরা গভর্নর জেনারেলের নিকট হস্তান্তরের জন্য একটি স্মারকলিপি প্রস্তুত করেছি। কিন্তু যেহেতু বিষয়টি সকল মুসলমানদের জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ তাই আমরা এটি জমা দেয়ার পূর্বে এর উদ্দেশ্য মুসলমানদের সামনে স্পষ্ট করার লক্ষ্যে পত্র-পত্রিকা ও মুসলমান সংগঠনগুলোর সামনে তুলে ধরা আবশ্যক মনে করি যেন তারাও রেজেলিউশন, ঘোষণাপত্র ও প্রবর্তক মাধ্যমে নিজেদের সমর্থন ব্যক্ত করতে পারে। আর সরকার যদি মুসলমানদের এ প্রয়োজনীয়তার বোঝাকে অনুমান করে তাহলে যথাযথ সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে। আমরা মনে করি, এটি যেহেতু মুসলমানের সম্মিলিত স্বাধীন তাই প্রস্তাবিত অনুরোধ মুসলমানদের সর্বসম্মত মতামতের আকারে গভর্নর জেনারেলের সামনে উপস্থাপন করা যেতে পারে। আমরা একটি এটি উপস্থাপন করতে অতি উৎসাহী নই। আলাহ যেহেতু এবিষয়ে আমাদের মাঝে প্রশ্না সৃষ্টি করেছেন তাই আমরা এ প্রস্তাব রাখলাম। যদি কোন মুসলমান সংগঠন এ কারণে রাগ করে যে এরা কোন প্রস্তাব রাখলো, তাহলে আমরা সাবধান পিছে পিছে আসবে। শর্ত হলো সরকারের কাছে অনুরোধটি পৌছানোর জন্য উপযুক্ত অন্য কোন পথে অবলম্বন করতে হবে।”

আলিগড় থেকে একটি প্রস্তাব আসে যে প্রস্তাবিত স্মারককে সর্বভারতীয় মুসলিম লিগের পক্ষ থেকে জমা দেয়া যেতে পারে। হযরত খ্লীফাতুল মসীহ সমাত হলেন। স্মারকটিকে গুরুত্ব দিয়ে সরকার মুসলমানদেরকে জুমআর সুযোগ করে দিলেন।

১৮৮
শেষ নসীহত্ত

১৯১১ সনের জানুয়ারী সালানা অনুষ্ঠিত হয় ২৬ থেকে ২৯ ডিসেম্বর। হযরত খলিফাতুল মসীহ ২৭ ডিসেম্বর অপরাহ্ণে আড়াই ঘটা বন্ধুত্ব করেন। তাঁর বক্তব্য নিম্নরূপ:

"হে যার ঈমান এনেছ। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে প্রতিটি ক্ষেত্রে খোদার প্রতি তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে যথাযথ হও যেন মূঢ় যখন আসে তখন তোমাদেরকে সম্পূর্ণভাবে তাঁর দর্শনে অস্বস্য পায়। তোমরা সকলে সমবেদনাবে আল্লাহর রঙ্গে দুঃখাবে আকুড় ধরা এবং তোমরা পরস্পর বিভক্ত হয়ে না। এক্ষণ কর তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়মামতকে যখন তোমরা পরস্পর শক্ত হিলে, তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রতি সংগ্রহ করলেন এবং তোমরা তাঁর নিয়মামতের ফলঋভেতে তাই-তাই হয়ে গেলে। তোমরা একটি অন্ধকুড়ে কিনারায় হিলে। তিনি তোমাদেরকে রাখতে উদ্দার করলেন। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বর্ণনা করলেন যেন তোমরা হেদায়াত পাও। এছাড়া তোমাদের মধ্যে সদা এমন এক জামাত থাকা আবশ্যক যারা কল্যাণের দিকে আহবান করলে এবং নায়সংগত কাজের আদেশ দিবে আর অসংগত কাজ হতে পরিবে। এরাই সফল হবে। তোমরা তাদের মত হয়ে না যারা স্পষ্ট প্রামাণাদি আসার পাড় এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ে গেছে এবং পরস্পর মতবদ্ধ করেছে। এদের জন্যই এক মহাআলাইত নির্ধারিত হয়।" (৩:১০৩-১০৬)

বজ্রাকালে তিনি কয়েকটি বিষয়ের উপর জোর দেন। এগুলো নিম্নলিখিতভাবে সংক্ষেপে বর্ণনা করা যেতে পারে:

"খোদার প্রতি তোমাদের দায়ীত্ব কি? তাহলে তোমরা সঠিক মতবদ্ধকে আকুড়া ধরে আর তোমাদের কর্ম যেন এর সাথে সামগ্রিক রাখো। তোমাদেরকে খোদাকে ঠিক হতে ধরা রক্ষা করে এবং শান্তি প্রদান করে থাকো। একজন খোদাকে সকল কষ্ট থেকে পরিত্যাগ লাভ করে এবং সে আল্লাহর ভালবাসা প্রাপ্ত হয় আর তাকে এমনতাবে রয়েক দেয়া হয় যে সে নিজেও ভাবতে পারে না। তাঁর দোয়া প্রতি হবে এবং তাকে শান্তরা বিচ্ছেদে বিজয় দেওয়া হয় আর তার শক্ত নিপীড় হয়। মুহাম্মদের জন্য ঐশ্বী জানের দৃষ্ট উন্মুখীত হয়। তাই আমার প্রথম নসীহত হলো, খোদার জন্য মুহাম্মদ হও, মুহাম্মদ হও।"
হযরত মৌলিকী নৌরুল্লাহীন (রা.) - খলিফাতুল মসীহ আউয়াল

মুহাররে হও। খোদার প্রতি পূরোপূরি অনুগত হও এবং তোমাদের জীবনের সমাজে যেন তাঁর আনুগত্যের মধ্যে হয়। এমন অনুগত্য অসাধারণ নিয়মত । এমন আনুগত্যের সুবাদেই আব্দুল আহ্মিয়া হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে সকল প্রকার নিয়মমতের বোধ আখ্যায় দেয়া হয়েছে । উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে, তুমি আমার কাছে আত্মসামর্পণ কর। তিনি বললেন, আমি বিশ্ব প্রতিবাদকের কাছে আত্মসামর্পণ করলাম (২:১৩২)। সুতরাং আপনারাও যদি ঐশী নিয়মমত প্রাপ্ত হতে চান তাহলে মুহাররে হোন। একজন সত্যিকারের মুসলমানের জীবন তা প্রতিভাত হয়ে থাকে। সুতরাং মুসলমান হোন, মুসলমান অবস্থায় যেন আপনাদের মৃত্যু হয়। সুতরাং সমবেদ হোন, আপনাদের সমবেদ শক্তি নিয়ে আল্লাহর রক্ষাকে দৃঢ়ভাবে আকাঙ্ক্ষা ধরনে আর বিভক্ত হবেন না। আমি আযাতিত আপনাদের সামনে আবার পড়ছি। সবাই সমন্বিতভাবে আল্লাহর রক্ষাকে আকাঙ্ক্ষা ধরনে আর বিভক্ত হবেন না। সুতরাং আল্লাহর রক্ষাকে দৃঢ়ভাবে আকাঙ্ক্ষা ধরনে আর এটিকে ছুটতে দেবেন না। ইসলামে আল্লাহর রক্ষা বলতে কৃত্রিমাকে বুঝায়। আর্যো, ব্রাহ্মণ, সনাতনধর্মী, স্ত্রী, নাতিক এবং পৌত্তলিক সবাই সর্বশক্তি দ্বারা এটিকে তানাশ আর বাহবলে একে নিজেদের দিকে নিয়ে যেতে চায়। অপরদিকে আপনারা আল্লাহর এ রক্ষায় সাথে সংবদ্ধ থাকবে দরিদ্র। এ দরিদ্র প্রমাণপ্রতিভায় ছুটে দেবেন না। আপনারা সমবেদ শক্তি নিয়ে একে দৃঢ়ভাবে আকাঙ্ক্ষা ধরনে রাখুন ইসলামের শক্তিতে তাঁর আবার তেন। না নিয়ে যান। এটিকে ধরে রাখার অর্থ হলো আপনাদের উচিত কৃত্রিমকে জীবন বিধান ও পথপ্রদর্শন হিসেবে অবলম্বন করা। আপনাদের জীবনের সকল দিকে যেন এর অর্থনৃস্ব হয়।

আপনাদের প্রতিষ্ঠান মুক্তি, আপনাদের গতি ও স্থিরতা যেখান হতে এ পরিবত কিতাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় যা আরোগ্য ও আলো। আমি পুনরুারু আপনাদের কাছে আল্লাহর নির্ণে শুভচিত্ত তা শুনুন এবং মনের সকল শ্রবণের শুন। সবাই সমবেদভাবে আল্লাহর রক্ষাকে ধরনে আর বিভক্ত হবেন না। যদি বিভক্ত হয়ে যান এর পরিণতি কি হবে তা আপনারা জানেন কি? এ রক্ষা আপনাদের হাত থেকে খুলে পড়বে আর আপনারা সকল শক্তি হারিয়ে বসবেন। যেভাবে মহাস্মানিত আল্লাহ বলেছেন; পরমেশ্বর কলহ করবে না অন্যথায় তোমরা দুঃখিত হয়ে পড়বে (৮:৪৭)। আপনারা মূল থেকে উৎপাটিত হবেন। আপনাদের শক্তি লোপ পাবে আর আপনাদের শক্তি আপনাদের উপর প্রাধান্য বিন্ধ্য করবে।

১৯০
শেষ নগট

শুনুন! আমি খলিফাতুল মসীহ। খোদা আমাকে খলিফা বানিয়েছেন। আমার খলিফা হওয়ার কোন বাসনা ছিল না। কিন্তু এখন আল্লাহ যেহেতু আমাকে এ আহ্বাদন পরিয়েছেন তাই আমি সকল বেদানাটেকে চরমতায় গৃহা করি। আমি চাই না, আপনারা কোন মতানীকের শিকার হন। আমি অনৈকের সকল কারণ দুর করতে চাই। আপনারা ভাবতেও পারবেন না যে জামাতের মধ্যে বেদানাটের ধারণা আমাকে করতেই কষ্ট দেয়। সে বেদনার কথা আপনারা জানেন না আর আপনাদের সে সম্পর্কে কোন ধারণা নেই। আপনাদের মধ্যকার কোন ফোটল বা অনৈকের কথা যেন আমাকে ঘোট না হয়। এটি আমার কাম্য আর আমি যেন সচক্রে দেখতে পাই যে আপনারা এই নিদর্শ—’তেমন সকলেই সমবেতভাবে খেদার রস্তায় আকৃত্ড ধর এবং বহুলা বিভক্ত হবে না’ এর বাড়িবিক প্রতিফলন। অবশ্য এর পরিপূর্ণতা আল্লাহর কৃপার উপর নির্ভর করে।

যে এখানে উপস্থিত তাকে আমি পুনরায় বলছি, শুনুন এবং অন্যদের কাছে পৌঁছান আর বাকিবিষিদ পরিত্যাগ করুন। আমার মুখ্য যি পর আপনারা অনেক বাকিবিষিদ দেখবেন। হয়ত আপনারা ভাবতে পারেন যে আমি হযরত আবু বকরের মত সহজে খলিফা হয়ে গেছি। আপনারা বাস্তব পরিপূর্ণতির কথা ভাবতেও পারেন না। আমার উপর কি বোঝা ও দামিয়ু অর্পণ করা হয়েছে আর যে উৎকটার আমি সম্পূর্ণ হই তাও আপনারা চিন্তা করতে পারবেন না। এটি গুরু খোদার অনুপ্রাণ যে আমি সে বোঝা বহন করতে সক্ষম হয়েছি। সে বোঝা বহন করা তা দুরত্র কথা, আপনাদের কেউ তা সঠিকভাবে অনুমানও করতে পারবেন না। লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রতি যাকে খেলায় রাখতে হয় আপনারা কি মনে করেন সে সুখে নিদ্রা যাপন করতে পারে?

এ মসজিদে দাফিনে কুরআন হাতে নিয়ে আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমার আধ্যাতিক নেতা সাজার কোন সাধ ছিল না। কিন্তু খোদার পরিকল্পনা কি তা কেউ জানে না। তিনি যা চেষ্টকেন তা করেছেন। তিনি আপনাদের সকলকে এক্ষেত্রে সমর্পণ করেছেন। তিনি নিজে আমাকে বিলাককে পোিয়াক পরিয়েছেন, আপনাদের কেউ নয়। এটিকে সমান করা আমার দায়িত্ব। আমি আপনাদেও কাছে টাকা বা অন্য কিছু চাই না। আপনাদের কেউ আমাকে সালাম করলো কি করল না আমি এর প্রতিত্ব ভ্রমক্ষেপ করি না। গত এপ্রিল পূর্বত আমি

১৯১
হযরত মৌলিকী নূরউদ্দীন (রা.) - খলীফাতুল মসীহ আউয়াল

আপনাদের ব্যক্তিগত উপহার মৌলিকী মোহাম্মদ আলী সাহেবকে পাঠিয়ে দিতাম, কিন্তু কেউ তাকে বিভ্রান্ত করেছে তাই তিনি ভেবেছেন, এগুলো আল্লাহর সম্পত্তি আর তিনি আল্লাহর সেক্টরার হিসেবে এসেছে তাদের তত্ত্বাবধায়ক। তাই আমি তাকে এ দুটা খোদার সঙ্কটের খাতিরে পাঠানো বদ্ধ করে দিয়েছি, এটি দেখার জন্য যে তারা এ ব্যাপারে কি করে? যারা এমনটি চিন্তা করে তারা ভাবিয়ে নিপতিত এবং তারা অশ্রুতা প্রদর্শনের জন্য দায়ী। তাদের তাওবা করা উচিত। আমি আবার বলছি, তাদের অনুশোচনা করা উচিত নতুন তাদের পরিণতি ভাল হবে না।

এখন ব্যক্তিগতভাবে আমাকে যে তোহফা দেয়া হয় তা আমি পৃথক করে রেখে দিই আর খোদার সঙ্কটের জন্য খরচ করি। আমি আমার ও আমার পরিবারের ব্যক্তিগত চাহিদার জন্য আপনাদের উপর নির্ভর করি না। আল্লাহর কথনা আমাকে কারো হাতে ছেড়ে দেন নি। তিনি তার ওয়াখ থেকে আমাকে পর্যাপ্ত দান করেন। এছাড়া তিনি আমাকে যে বিদ্যা/পেশা শিখিয়েছেন আমি এখনও এতে ফিরে যেতে পারি। স্মরণ রাখবেন আমি আবার বলছি, আপনাদের টাকার কোন প্রয়োজন আমার নেই আর আপনাদের কাছে আমি তা চাইও না। আপনারা যদি আমাকে কিছু পাঠান তা যেভাবে আমি ভাল মনে করি সেভাবে আল্লাহর সঙ্কটের জন্য খরচ করি। সুতরাং কিসের লোভে আমার ভিতর আধ্যাত্মিক গুরু সাধারণ সাধ সৃষ্টি হবে? খোদা যা চেয়েছেন করেছেন। আপনারা বা অন্য কেউ এ বিষয়ে কিছু করার শক্তি রাখে না। সুতরাং আল্লাহর ইচ্ছার শ্রদ্ধা করা শখুন। এর মাধ্যমেই খোদার আশীর্বাদের অর্জন করা সত্য। এটিও আল্লাহর রঙ্গ যা আপনাদের বিক্ষিপ্তদেরকে একত্র করেছে। একে দৃষ্টান্তে ধরে রাখুন।

তালভাবে স্মরণ রাখবেন! খলীফাকে অপসরাণের কোন ক্ষমতা আপনাদের নেই। যদি আমার মাঝে এমন কিছু দেখেন যাকে আপনারা দুর্বলতা মনে করেন তাহলে তা অপদ্রুতার সাথে চিহ্নিত করুন। খলীফা খোদা নিযুক্ত করেন। এটি মানুষের কাজ নয়। খোদা 'আদমকে খলীফা বানিয়েছেন এবং দায়দেরকেও। আর তিনি ২৪:৫৬ আয়াত অনুসারে খলীফা নিযুক্ত করে থাকেন। তিনি আপনাদের সকলকেও খলীফা বানিয়েছেন। যদি আমাকে খলীফা নিযুক্ত করা হয় তাহলে এটি আল্লাহ তাঁর প্রভূত ভিত্তিতে আপনাদের মঙ্গলের জন্য করেছেন।

১৯২
খোদা যাকে খলীফা নিযুক্ত করেছেন কেউ তাকে অপসারণ করতে পারে না।
সুতরাং আপনাদের কেউ আমাকে অপসারণের অধিকার বা ক্ষমতা রাখেন না।
যদি খোদা আমাকে সরাতে চান তাহলে তিনি আমাকে মৃত্যু দেবেন। আপনারা
এটি খোদার হাতে ছেড়ে দিন। আপনারা অপসারণের ক্ষমতা রাখেন না। আমি
আপনাদের কারো কাছে ধীর নই। যে ব্যক্তি বলে যে না আমাকে খলীফা
বানিয়েছেন সে মিথ্যা বলে। একথা আমার দুর্খে দেয় যখন বলতে শুনি যে এটি
সংবিধান ও সংসদের যুগ। ইরান, তুর্কু, পার্তুগাল সবাই সংসদ গঠন করেছে।
আমি দৃষ্টিভঙ্গি বলছি, যে এ জাতিতেক সংসদীয় ও সাংবিধানিক মনে করে তার
নিজের ভূমির জন্য অনুশোচনা করা উচিত। ইরান এবং অন্যান্য দেশের জন্য সংসদ
কি কল্যাণ বয়ে এনেছে? মোহাম্মদ আলী শাহের অধীনে অনেকেই ধর্মস্বরূপ
আর তার উৎরাধিকরিকা হয়কি সম্মুখীন। তুলিরা সংসদ গঠনের পর কি
নিরাপদে যুমাতে পেরেছে?

আমি আবার আপনাদের মায়ণ করাচ্ছি, কুরআনে পরিকালভাবে বলা আছে,
খোদাহই খলীফাদের নিযুক্তি দিয়ে থাকেন। যখন তিনি আমাকে নিযুক্ত করেছেন
তিনি পরিকালভাবে বলেছন, 'আমি পৃথিবীতে একজন খলীফা নিযুক্ত করতে
যাচ্ছি' (২:৩১)। ফিরিশ্তাতারা আপত্তি করেছে, কিন্তু এতে তাদের কি লাভ
হয়েছে? কুরআন পড়ুন এবং প্রণয়ন করুন। যদি ফিরিশ্তাতাদের অবস্থা এই হয়
�বং তাদের স্বীকার করতে হয়, 'তুমি পরিত্যাগি। তুমি আমাদেরকে যা শিখাও তো
ছাড়া আমাদের কোন জন্য নেই' (২:৩৩)। তাহলে আপনাদের কি অধিকার
আছে আমার সমালোচনা করার? আয়নায় নিজের চেহারা দেখুন, ভাল হবে।
আমি একজনকে বলতে শুনেছি, ইরানে একটি সংসদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এটি
সংবিধানের যুগ। এ ধরনের মন্মনঃসিকাতা অশ্রুধার শামিল। যারা এমন চিন্তা
করে তারা ব্যাপার ইরানে খোদার আতাতিয়ামানের নির্দেশনার সাহিব্রুকঠার
ফলাফল দেখেছে। আমি পুনরায় বলছি, তাদের এখনই তাওয়া করা উচিত।

আমার কাছে একৈমন্ত ও নিউয়েদের জন্য কাপড় ও টাকা পাঠানো হয়। এসব
অর্থ আমি কুরআনের নির্দেশ 'একৈমন্তের সম্পদের কাছে যাবে না' (৬:১৫৩)।
এর অধীনে মৌলিক মোহাম্মদ আলীর কাছে পাঠিয়ে দিয়ে। অনেক সময় মূল্যবান
কাপড় আসে, আমি আমার শ্রীকে এমন কাপড় বিক্রি করে যা আসে তা থেকে
গড় মানের কাপড় প্রস্তুত করতে বলেছি যেন বেশি বেশি সংখ্যক উপযোগী

১৯৩
হযরত মৌলভী নূরউদ্দিন (রা.) - খলীফাতুল মসীহ আউয়াল

লোকের সহায়া করা যায়। আমার শ্রী জিজ্ঞেস করলেন, তিনি নিজে কিছু কাপড় ক্রয় করার অনুমতি পাবেন কিনা। আমি তাকে বললাম, না। তবে যারা আমাদের আত্মীয় নন এমন মহিলারা ক্রয় করতে পারেন। ওই সময় দরিদ্র
লোকের বিয়ে হয়ে থাকে আর কেনেকে কিছু কাপড় ও গয়না দিতে হয়।
অধিকতর কিছু অর্থ আমার তত্ত্বাবধানে খরচের সিদ্ধান্ত রয়েছে বা এমনভাবে খরচের সিদ্ধান্ত হয়েছে যার অধ্যাত্মিক কল্যাণ এক মূল ব্যক্তি লাভ করতে পারে। কিছু অর্থ সদকার জন্য আনে। কিছু অর্থ দেয়ার সময়, দাতা বিশেষভাবে আমার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য দিয়েছেন বলে উল্লেখ করেন। আমি জানি এটি আল্লাহর বিশেষ ইচ্ছায় হয়।

আমি একথাগলা আত্মীয় সমর্থন করতে গিয়ে বলছি না। আল্লাহ খুব ভাল জানেন, আমি আপনাদের পছন্দ ও অপছন্দ বা প্রতিচ্ছয়নকে কোন শরুত দেই না। আমি একথা আপনাদেরকে এজন্য বললাম কেউ না আবার সেদেহ পোষণ করে পাপ করে বসে। আপনাদের টাকার আমার কোন প্রদান নেই।
হযরত মসীহ মাওফউদ (আঃ)-এর জীবদগ্ধায় আমার কাছে এমন টাকা আসতো আর আমি তা গ্রহণ করতাম। আমি আপনাদের ভাল চাই তাই এ কথাগলা বলছি। আমি আপনাদের কাউকে বিন্দুমাত্রও ভয় করি না। আমি গুলো কথা তাআলাকে ভয় করি। বাজে চিন্তা করবেন না। যদি আমি ভালিকে থাকি তাহলে আমাকে আমার ভালিকেই থাকতে দিন। এ বয়সেও যদি আমি কুরআন থেকে কিছু না শিখে থাকি তাহলে আপনারা আমাকে কি শিখবেন? আমার অবস্থা এমন যে এক নাগ্নে বসে থাকলে পায়ে ব্যথা আরস হয়ে যায়। আমি বক্তৃতা করার জন্য দাঁড়িয়ে। কেননা আঃ-হযরত (সাঃ) দাঁড়িয়ে বক্তৃতা প্রদান করতেন। সুতরাং
দেহাছ দেখালা। আমার কথা শুনুন। কেননা আমি আপনাদেরকে তাঁর ব্যাপার
গৌরহী, আমার কথা নয়। আল্লাহর রজ্জুকে সমবেতভাবে আঁখড়ে ধরন আর
বিভক্ত হবেন না।”

১১ই জুন, ১৯১২ সালে একজন রেগীর সাথে কথা বলতে গিয়ে হযরত
খলীফাতুল মসীহ বলেন, “চিকিৎসা পেশা ছাড়া বাকী সকল পেশায় কোন না
কোন পরিকল্পনা প্রণয়ন সমুদ্র। একজন মিস্ত্রি নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি
কাঠামো গড়ে তুলতে পারে। একজন কেরানী করেক দিনেই একটি বিবরণী
প্রকাশ করার প্রতিশ্রুতি দিতে পারে। কিন্তু একজন দাঁঝ বলতে পারে না যে সে

১৯৪
শেষ নসীহত

একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একজন রোগীকে সুস্থ করে তুলতে পারবে, যদিও কোন কোন নির্বাচিত চিকিৎসক এমন দাবী করে থাকে। কিন্তু একজন ভাল চিকিৎসক এমন দাবী করার ধৃত্যাদার দেখাবে না। আমি কোন কোন সময় চীন থেকে উষ্ণ আদি থাকি। কিন্তু আমি এত সাবধান যে কিছু উষ্ণ যা চীন থেকে অনেক পয়সা খরচ করে আনিয়েছি এখন পর্যন্ত কোন রোগীর উপর প্রয়োগ করি নি। কেননা কোন চিকিৎসক এখন পর্যন্ত আমাকে সেগুলো ব্যবহারের ফলাফল সম্পর্কে অবহিত করেন নি বা কিভাবে তারা ব্যবহার করেছেন তা বলেন নি। আমি কখনও সে সকল ভেজয় বা উষ্ণ প্রস্তাব করি না যা সহজলভ্য নয়।" ।।।

লাহোরের শেখ রহমত উল্লাহ সাহেবকে হযরত মসীহু মাওউদ (আঃ) প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, শেখ সাহেব সেহামে যে বিভিন্ন নির্মাণের কথা তাকিন তিনি (আঃ) এর ভিড়িট প্রস্তুত স্থাপন করবেন। কিন্তু হযরত মসীহু মাওউদ (আঃ) সে সুযোগ আসার পূর্বেই ইতেমাল করেন। ১৯১২ সালের জুনে শেখ রহমত উল্লাহ সাহেব হযরত খলিফাতুল মসীহুকে, মসীহু মাওউদ (আঃ)-এর দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষার অনুরোধ জানান। এটা পালনে তিনি তাকিনি নিয়ে সমাধি হন। ১৫ই জুন তিনি লাহোরের যান। একই দিন অপরাহে সংক্ষিপ্ত ব্যবহার মধ্যে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করেন। এতে তিনি বলেন: "আমার নেতা ও জনামুখী শেখ সাহেবকে কথা দিয়েছিলেন, তিনি নিজ হাতে এ ভবনের ভিড়ি রাখতে কিন্তু আলাহুর পরিকল্পনামূলকে একাজ তাঁর এক দাসের মাধ্যমে সমাপ্ত হওয়ার ছিল। শেখ সাহেব আমাকে এ উদ্দেশ্যে আসার জন্য লিখেছেন। আমি ভাল নেই। আর আমার কোন কোন অংশ ব্যাখ্যা আছে কিন্তু আমি আমার প্রতি প্রস্তাব কথা বাস্তবায়নের জন্য একটি ছিলাম।

এ জমির চূড়ান্তে কর্মকর্তা নতুন বিভিন্ন নির্মাণ হয়েছে, আর কতক হচ্ছেন। কিন্তু এ প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন এর সাথে আমাদের বিশেষ ব্যাখ্যা সংশ্লিষ্ট আছে যা মূলপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও জামাত। ব্যক্তির ব্যাখ্যা হলো, মহরমি মির্জা সাহেব এর ভিড়ি রাখতে প্রতিষ্ঠিত দিয়েছিলেন আর তাঁর এক দাসকে সে দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। আর জামাত ব্যাখ্যা হলো আমাদের জামাতের এ ভবনে অন্ধ আছে। জামাতের সদস্যদের আপনাকে দোওী করা উচিত, এর চূড়ান্ত ফলাফল হেন শুন হয় আর এ ভবনে বসবাসকারী ও ব্যবস্থাপকগণ তাদের পুণ্যবান হন এবং পুণ্যকে ভালবাসেন।

১৯৫
হ্যারেট খলেফাতুল মসীহ হাম্র পূর্বতনী লাহের সকলের সময় থেকেই আহমদীয়া বিভিন্ন এর মসজিদটি নির্মিত হচ্ছিল। ১৫ই জুন লাহের আসার সাথে সাথে তিনি সেখানে যান এবং দু রাকাআত নামায পড়ে যারা মসজিদ নির্মাণের দায়িত্বে ছিলেন তাদের জন্য এবং তাদের সমাধি-সন্তির জন্য দোয়া করেন।

পরদিন তিনি জামাতের একটি বিশাল সমাবেশে বজব্য রাখেন। তাঁর বজিত্তায় তিনি বলেন, "আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে আ-হ্যারেট (সা৪)-এর পর আমাদের বাদশা হ্যারেট মসীহ মাওলাদ (আ৪)-এর মধ্যে এখানে একটি করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর আমার মধ্যে আপনাদেরকে অনেক বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেছেন। এ ঐশ্বরিক মৃত্যুকে যথাযথভাবে মৃত্যুর করুন। অর বৃথা আলাপ-আলোচনা ও কুরআনের লিপিতে হতে না। আমি বুঝি না এমন আলোচনা করে আপনাদের কি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়? সর্বশক্তিকে খোদা যাকে চেয়েছেন খলিফা বানিয়েছেন আর আপনাদেরকে তাঁর কাছে সম্পূর্ণ বাধ্য করেছেন। এটি শুধু তাদের ঘাটি যারা আল্লাহর সিদ্ধাংশের সমালোচনা করে। আমি আপনাদেরকে বাংবার বলছি আর কুরআন থেকে বাংবার দেখিয়েছি, খলিফা বানান কোন মানুষের কাজ নয়। আল্লাহই খলিফা বানিয়ে থাকেন। কে আদামকে খলিফা বানিয়েছে? আল্লাহ তাআলা বলেন, "আমি পুরুষবিতে একজন খলিফা নিযুক্ত করতে যাচ্ছি" (২:৩১)। ফেরেশ্তারা প্রতিবাদ জানায়, সে পুরুষবিতে বিশ্বকলা সৃষ্টি ও রক্ষণ করবে। কিন্তু প্রতিবাদ করে তাদের কি লাভ হয়েছে। আপনারা কুরআনে দেখে যে পরিশেষে তাদেরকে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে। যদি কেউ আমার মধ্যে দুর্বলতা দেখে, সে যদি ফেরেশ্তাও হয়ে থাকে আমি তাকে বলবো, আমাদের খিলাফতের সামনে বুকা তোমার জন্য মন্ডলজনক হবে। যদি সে অহংকারবশত প্রত্যাখ্যান করে এবং
শেষ নসীহত

ইব্লিসের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তাহলে তার স্মরণ রাখা উচিত, আদমের বিরোধিতা করে ইব্লিসের কি লাভ হয়েছে? আমি পুনরায় বলছি, ফিরিশ্ন প্রকৃতির কোন ব্যাক্তিও যদি আমার খিলাফত সম্পর্কে আপত্তি করে আর তার সত্তার যদি পরিবর্ত হয় তাহলে তা অবশ্যই তাকে আদমের সামনে বুকে অনুপ্রাণিত করবে, কিন্তু যদি সে ইব্লিস হয় তাহলে সে তাঁর মহান সঙ্গকে পরিত্যাগ করবে।

আর একজন খলিফা ছিলেন দাউদ। যেমন বলা হয়েছে, হে দাউদ! আমরা তোমাকে পুরুষীতে খলিফা নিযুক্ত করেছি" (৩৮:২৭)। তিনিও খোদা কর্তৃক খলিফা নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর বিরূপবাদীরা নৈরাজ্যবাদী ছিল। তাদের কেউ কেউ তাঁর প্রাসাদে অনুরোধের ছিল। কিন্তু খোদা যাকে খলিফা নিযুক্ত করেন তাঁর বিরোধিতা করে কে সফল হতে পারে?

এরপর সর্বশক্তিমান খোদা আবু বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ)কে খলিফা নিযুক্ত করেছেন। রাফেজিয়ারা আজও তাদের খিলাফতের ব্যাপারে হার হারান করেছে। কিন্তু তোমরা কি দেখেছি না! কেউ কেউ মানুষ আবু বকর ও উমরের জন্য দোয়া করে। আমি খোদাকে সাফ্যর রেখে বলছি, আমিও খোদা কর্তৃক খলিফা নিযুক্ত হয়েছি। এ মসজিদটি আমার হস্তায় প্রশাসিত করেছে। যারা কেন না কোনভাবে এর নির্মাণে ভূমিকা রেখেছেন আমি আত্মনিষ্ঠায় তাদের জন্য দোয়া করেছি এবং আমি নিশ্চিত আমার দোয়া আরেকে পৌছেছি। এ শহরে এসে আর এ মসজিদ দাবিও যা আমাকে খুবই গ্রেট করেছে, আমি হোঁকা করছি, যে খোদা আদম, দাউদ, আবু বকর ও উমরকে খলিফা বানিয়েছেন তিনিই ঠিক সেভাবে আমাকে খলিফা নিযুক্ত করেছেন।

যদি কেউ বলে, আবুজ্দমান আমাকে খলিফা বানিয়েছে তবে সে মিথ্যা বলে। এরপর ধারণা ধরতে যে বলে ডের এমন মানুষের করল তাকে আত্মনিষ্ঠা করেছি। পুনরায় কান খুলে শোন। কোন মানুষ যা কোন আবুজ্দমান আমাকে খলিফা বানায় নি, আর আমি মনে করি না যে কোন আবুজ্দমান কাউকে খলিফা বানানোর যোগ্যতা রাখে। কোন আবুজ্দমান আমাকে খলিফা বানায় নি। আর কেন আবুজ্দমানের এরপর করাকে আমি গুরুত্বী দেই না। কোন আবুজ্দমানের আমাকে অধিকার করার উপর আমি থু-থু ও ফেলি না। কেউ আমা থেকে এ পোষাক ছিনিয়ে নেয়ার কাম্হতা রেখে না।

১৯৭
হযরত মৌলিকী নুরুল্লাহিন (রা.) - খলিলফাতুল মসীহ আউয়াল

কাকে তারা খলিফা হওয়ার মোটা ছিল বলে মনে করে? এখানে আমার একাধ প্রিয় মাহমুদ রয়েছেন যিনি আমার নেতা ও হিতকারীর ছিলে। এরপর তার জামাতা নবাব মোহাম্মদ আলী সাহেব আছেন, তার উচ্চতর মীর নাসের নবাব রয়েছেন এবং তার নর্ম হযরত উম্মুল মুমিনীন আছেন। একমাত্র একাই এগুলো যদিও স্থলতাত্ত্বিক অধিকার আছে বলে মনে করা যেতে পারে। এসবেও মজার বিষয় হলো যারা মনে করে যে তাদের অধিকার পরদিলট হয়েছে, তারা ভাবে না যে তারা সকলেই আমার অনুগত এবং বাধা। তারা একটি সমালোচনার সামনে তাদের কোন দরী উদাপন করেন নি। হযরত মির্যাস সাহেবের সত্য-সন্ত্রাস এবং তার সকল নিকটালীয় আমার জন্য নিবেদিত। আমি তোমাদের সত্যসত্যই বলছি, আমার প্রিয় মাহমুদ, বলশী, রেশিদ, মীর নাসের নবাব এবং নবাব মোহাম্মদ আলি খান সাহেব যেভাবে আমার আনুগত্য করেন তোমাদের একজনও সেভাবে আমার আনুগত্য কর না। আমি এত সকল কথা তাদের খুশী করার জন্য বলছি না বরং সত্য হিসেবে বলছি। তারা অন্তরে সন্ত্রাসের অর্জনের জন্য আমাকে ভালবাসেন। আমি উম্মুল মুমিনীনকে বেশ করেন একথা বলতে শেষ হয়েছে, তিনি নিজেকে আমার চাকরিয়া মনে করেন। মির্যাস মাহমুদ বড় হয়েছেন। তিনি নিজেই বলতে পারেন যে তিনি আমাকে অন্তর্খালে মানা করেন। কোন সমালোচক হযরত বলতে পারে, তিনি অন্তর্কালে আমার আনুগত্য করেন না। কিন্তু আমি নিজেদিগকে জানি, তিনি সত্যকার অথবাই আমার অনুগত। আর তোমাদের যে কোন ব্যক্তির তুলনায় অধিক অনুগত। হযরত মির্যস সাহেবের পরিবারের প্রতিটি সদস্য সেভাবে আমার আনুগত্য করেন যেভাবে আলী, ফাতেমা এবং আবাস হযরত আবু বকর (রা) এর আনুগত্য করেছেন বরং আরও বেশি। তাদের প্রতিকেই আমার প্রতি এত নিবেদিত যে আমি ভাবতেই পারি না তাদের কেউ আমার সম্পর্কে কোন ভূল ধারণা পোষণ করতে পারেন।

শুনুন! আমার খলিফা হবার কথায় কোন সাধ ছিল না। হযরত মির্যস সাহেবের শিক্ষাত্ব বরণের পূর্বে আমি সেভাবে পোষাক পরিধান করতাম যেভাবে আজ কে পরি। একটিভাবে পোষাক পরিধিত অবস্থায় সমানের সাথে বড় বড় ও ক্ষমতাধর লোকদের সাহচর্যে থাকার আমার সুখ্যাত হয়েছে। হযরত মির্যস সাহেবের শিক্ষাত্ব বরণের পর আমি আমার জীবন পদ্ধতিতে কোন পরিবর্তন আনি
নি। তাঁর মৃত্যুর পর আলোচ যা চেরেচেন করেছেন। আমার মনে কোন সময় ধারণা ও জাগরণ যে আমি খলিফা হবো। কিন্তু খোদা তাঁর প্রজা অনুষ্ঠানে তাই ইচ্ছা করেছেন এবং তিনি আমাকে আপনাদের ইমাম ও খলিফা নিযুক্ত করেছেন।

যাদেরকে আপনারা এখানে যে মনে করতেন তাদেরকে আমার অনুগত করেছেন। এখন আপনারা আপনি করার কে? যদি দুর্লভতা সম্পাদন করতে হয়, তাহলে খোদার মধ্যে সম্পাদন কর! কিন্তু এখন ধৃষ্টতা দেখাতে পিয়ে অর্জন ও অশিক্ষার শাস্তি সম্পর্কে সাবধান থেকো। আমি কেন তেরামোদ করি না? আর আমি করো সালামও পেতে চাই না। আমি আপনাদের উপরের বা কোন দানও চাই না। আল্লাহ আমাকে তাদের কাছে হার পাতার ধারণা থেকে দুরে রাখেন। সর্বশক্তিমান খোদা আমাকে এখন ধন দিয়েছেন যে সম্পর্কে কেন মনুষ্য বা কোন প্রাণী কিছুই জানে না। আমার সীতা ও স্তম্ভন আপনাদের কারা উপর নিবেদন করে না। খোদা তাদের ভারতীয়-পোষণের ব্যবস্থা করেন। আপনারা কাউকে কি-ই বা দিতে পারেন? 'আল্লাহ স্বর্গসম্পূর্ণ; আপনারাই তাঁর মুখাপেক্ষা' (৪৭:৩৯)। যে উপস্থিত তার মনোযোগের সাথে শুনে যারা অনুপস্থিত তাদের কাছে একথা পূর্ণাঙ্গ উচিত। যারা খিলাফতের যোগ্য ছিল তারা বিশিষ্ট'-এ ধারণা পরিবর্ত্যগ করা উচিত। এটি রাফিজীদের ধারণা। সর্বশক্তিমান খোদা নিজ হাতে তাকে খলিফা বানিয়েছেন যাকে তিনি খিলাফতের যোগ্য মনে করেছেন।

যে তার বিশেষতা করে সে হাতিতে নিগতিত ও বিদ্যাভীষিকা। কর্মে সম্পর্কে আপনাদের অপরিণ মধ্যে রাফিজীদের পাইয়েছে। খোদার কাছে আপনাদের অভিযোগ করা উচিত যে ভেরার একবন্ধুত্ব খলিফা হয়ে গেল। এমন কেউ কেউ আছে যারা বলে খলিফারা কি করে? কেউ কেউ বলে তিনি শুধু বাচাও পাঠান।

কোন কোন লোক বলে তিনি বহিয়ের পোকা আর বহি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। তামরা আমার মধ্যে হার সহায় কৃষ্টি খুঁজে বের করতে পার, কিন্তু তামারা দুর্লভতা সম্পাদন খোদার বিচারে যাবে যেন আমাকে খলিফা বানিয়েছেন। এ সকল দুর্লভতা সম্পাদন শিয়াদের মত যারা আবু বকর (রা) ও উমর (রা) এর দোষ খুঁজে বেরায়।

আর একটি প্রশ্ন: যে বিষয়ে তামরা মতভেদ রাখ এবং বিতর্ক কর, তাহলো আমাদের বিরোধীদের অবস্থান কি? এখন মনোযোগ সহকারে শোন।

১৯৯
হযোত মৌলিক নূরদীন (রা.) - খলিফাতুল মসীহ আউয়াল

নবীদের গ্রহণ ও বর্জন সমপ্রকাশ নীতি আল্লাহর বাণী পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন। যখনই নবী আসেন তখন গ্রহণকারী এবং বর্জনকারী শ্রেণীকে পৃথক করা কাঠামো কিছু নয়। প্রতিলিপি সামাজিক প্রথার উদ্ধেরে থেকে সর্বশক্তিমান খোদা অবিশ্বাস, ঈমান ও শিরকের নীতিসমূহ সৃষ্টিভাবে বর্ণনা করেছেন। অতিংতেও নবী এসেছেন। সত্ত্বে কিছু মানুষ ঈমান এনেছে আর কোন কোন লোক অস্বীকার করেছে। যারা তাদের গ্রহণ করে নি তাদের ব্যাপারে তোমাদের কোন সন্দেহ জেগেছে কি বা তাদেরকে চিহ্নি করতে তোমাদের কোন সমস্যা হয়েছে কি?

আপনাদেরকে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের নীতিমালায় বলে দেয়া হয়েছে। হযোত মির্জা সাহেব খোদার রসূল ছিলেন। তিনি নিজের জন্য যদি নবী পরিভাষা ব্যবহার না করতেন তাহলে মুসলিম শরীফকে বর্ণিত হাদিসকে অধীনকরে দায়ে তিনি দেয়া সাব্যস্ত হতেন, যাতে অগত ব্যাপক নবী বলা হয়েছে। তাকে মানুষ ও না মানুষ বিষয়টি স্পষ্ট। তাকে প্রত্যাখ্যানকারী যদি মুসলমান হয় দীর্ঘ দয়া করে, তে আপনাদের ভার্তা নিকটতর হবে ক্ষুধার ইহুদীদের তুলনায় আপনাদের নিকটতর। যেসব মুসলমান হযরত মির্জা সাহেবকে অস্বীকার করে তারা অন্যদের তুলনায় আমাদের কৃত্ত নিকটতর, তাও একই মাঝামাঝি বিবেচিত হবে। যে হযোত মির্জা সাহেবকে মানে কিন্তু আমাদের প্রত্যাখ্যান করে সে রাজীবীদের নয় যারা মূল্যবান সাহাবীদেরকে প্রত্যাখ্যান করে। বিষয়টি অতি স্পষ্ট। কিন্তু অক্ষরাপো এ নিয়ে বৃথা বিতর্কায় লিখি হয়।

এরপর আমার কোন কোন বদু বলেন, লাহেরের জামাত বিলাতকে বাড়িগ্রস্ত করবে। আমি শিক্ষকের নিকট কুরআন এবং হাদিস পড়েছি এবং আত্মরক্ষার লেগুলো বিশ্বাস করি। আমার হোদ কুরআন ও হাদিসের ভালবাসায় পরিপূর্ণ। ‘জীবন চরিত’ ও ‘ইসলামের ইতিহাস’ সঙ্ক্রান্ত বই ক্রয়ের জন্য আমি সহস্ত সহস্ত রাণী বাণী করেছি। এই সব কিছুর অধ্যয়ন আমার মধ্যে এ বিশ্বাসের জন্য দিয়েছে, আল্লাহ যদি কিছু করার সিদ্ধান্ত নেন তাহলে কেউ সে কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। আমি উল্লেখ করেছি, আদম এবং দাউদ খলিফা ছিলেন। আর হযোত আবু বকর (রাহ) এবং উমর (রা) -এর কথাও বলেছি যারা খলিফা হিসেবে আমাদের নেতা ও মনিরের (স্তি) স্ন্যায্যিক্ত হয়েছেন। আমি একথা বলেছি যে মাত্রে আবু বকর এবং উমর খলিফা ছিলেন একইভাবে
সর্বশক্তিমান খোদা হয়ত মিষ্টা সাহেবের পর আমাকে খলীফা নিযুক্ত করেছেন।
কিন্তু আমার কথা আছে: খোদা বলেন, এরপর আমার তোমাদেরকে পৃথিবীতে
খলীফা নিযুক্ত করেছি (১০:১৫)। অপনাদেরকেও পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করা
হয়েছে যদিও সেটি ভিন্ন ধারার থিলাফত। অতএব খলীফা শ্রুত আল্লাহই বানিয়ে
থাকেন, কেউ তাকে বাধা দেয়ার ক্ষমতা রাখে না।

লাহোর আমার বাড়ি নয়। আমার বাড়ি তোমার আর বর্ষমানে কাদিয়ানে।
আমি অপনাদেরকে বলছি, লাহোরের কেউ আমার থিলাফতের পথ বাধা সৃষ্টি
করে নি আর করতে পারবে না। কারা স্নাতির প্র্যাস্থি হবে না। যদি আপনারা
বিশ্বাস করে থাকেন, তাহলে খোদার প্রতি কৃতজ্জ হোন একই সাথে দৈবের জন্য
দেয়া করলেন। অনুমতি করে দাঁড়ানো আমার জন্য কষ্টসাধ, এসত্বেও আমি
এ সুযোগ নিচ্ছি অপনাদেরকে শ্রুত একথা বুঝানোর জন্য যে থিলাফত ধেনেন
কেন বিষয় নয় যাকে হাক্কাভাবে নেয়া যেতে পারে। এ ধরনের বিতভায় লিঙ
হয়ে অপনাদের কেন লাইন নেই। কেউ তোমাদেরকে খলীফা বানিয়ে না, আর
আমার জীবনন্তু কেউ খলীফা হতেও পারবে না। যখন আমি মারা যাবে তখন
খোদা শ্রুত দাঁড়াবে যাকে খোদা চাইবেন। আর আল্লাহ দ্বারাং তাকে দাঁড়
করাবেন। তোমারা আমার হাতে বয়ানামে করেছ সুতরাং খলীফার ভূমিকায়
অবতীর্ঘ হবার শ্রুত দেখবে না। খোদা আমাকে খলীফা বানিয়েছেন, তোমাদের
কথায় আমি অপসারিত হতে পারি না আর আমাকে অপসারণ করার ক্ষমতা
কারা নেই। যদি তোমারা বেশি কথা বল তাহলে জেনে রাখ, আমার কাছে এমন
খালিদ বিন ওয়ালিদ আছে যারা তোমাদেরকে সেভাবে শান্তি দেবে যেভাবে
বিশ্বাসঘটকদের শান্তি দেয়া হয়।

খোদা আমার অর্থে পৌছে আর আমার প্রভু দেয়া করার প্রবীর
আমার আন্ত পূরণ করেন। আমার সাথে বিতভায় লিঙ হওয়া আল্লাহর সাথে
বিতভায় লিঙ হবার নামনাত। সুতরাং বিত আর অনুশোচনা কর। কিছুকাল
অপেক্ষা কর, যিনি আমার পর আসসবেন খোদা যেভাবে চাইবেন সেভাবে তিনি
তোমাদের সাথে ব্যবহার করবেন।

এমন বিষয়ে যে সম্পর্কে অপনারা মতভেদ রাখেন হযরত মিদ্রষ সাহেব
সেসব বিষয়ে সুসম্প মতামত দিয়ে গেছেন। যে তার কথার বিবেচনা যায় সে
আহমদী নয়। যে সকল বিষয়ে তিনি কেন মতামত ব্যক্ত করেন নি সে সম্পর্কে

২০১
হযরত মৌলভী নূরউদ্দিন (রা.) - খলিফাতুল মসীহ আউয়াল

আপনারা আমার অনুমতি ছাড়া অতি বেশি দর্শন খাড়ার সাধারণতা রাখেন না। যতক্ষণ খলিফা সেগুলো সম্পর্কে কথা না বলেন আপনাদের কল্লা ও জিংকার সংযোগ রাখুন। সেসব বিষয় ব্যাখ্যা করতে যাবেন না যে সম্পর্কে আমাদের নেতা ও ইমাম নীরব ছিলেন, নতুন আপনাদের লেখা বৃত্তি যাবে। আপনারা এ অনুযায়ী দেখাতে পারেন না, যেহেতু আমি কল্লা হাতে নিই না তাই আপনাদের কল্লা ধরতে হলো। কিন্তু নিখতে হয় তা আমার ভাল জানা আছে। আমার বই ‘নূরউদ্দিন’, ‘তসলাক বারাহিনী আহমদীয়া’, ‘ফসলুল খেতাব’ ও ‘ইবতাল উলুমচার্যদের মসীহ’ পড়ুন তাহলে আপনারা এ কথাটি বুঝতে পারবেন। শুধু ঐশ্বর্য প্রভু আমাকে বিষয় রেখেছেন। পুরুষীয় বলছি, সতিন খোদা তাআলা আমাকে বিষয় রেখেছেন।

আমি পুরুষীয় আপনাদের নসীহত করছি। আমার বয়স ও অসুখীতার কথা কিছুটা বিবেচনা করুন। এরপর চিন্তা করুন, আপনাদের জীবনের আমাদের হৃদের নিকটতম কথাটি কেন করুন? যদি না হয় তাহলে আমি যা বলি তা মনের যোগ দিয়ে থাকুন আপনি পালিত জন্য হাসরে ভালবাসা সৃষ্টি করুন। এমন আচার-ব্যবহারের ভাবে হন যা দেখে আমি সেভাবে আনন্দিত হতে পারি যেভাবে এ শহরে এসে এ সমস্ত দেখে আমি আনন্দিত হয়েছি। আল্লাহ করুন আমি ফিরে গিয়ে যেন এ সংবাদ শুনি যে আপনারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন এবং একে অন্যের প্রতি ভালবাসা রাখেন। অনবরত দোয়ায় রছত থাকুন, আমিও আপনাদের জন্য দোয়া করব।”

হযরত খলিফাতুল মসীহ প্রায়শ এ ঘটনা বর্ণনা করতেন। এটা ছিল তার মৃত্যুর প্রদানের বিশেষ রীতি। একজন অ-আহমদী মৌলভী আমাকে সাহসীভাবে আমদান জানায়। আমি সেখানে যোগ দেখি, তিনি আমার পালিত মানুষ বললেন। তিনি মতবাদগত বিষয়ে আমার সাথে আত্মরক্ষার কথা বললেন। তিনি বললেন, তিনি বিশ্বাস করেন ঈসা (আঃ) স্বভাববিশিষ্ট মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি হযরত মির্জা সাহেবকে একজন মুতাকী মানুষ হিসেবে প্রদান করেন। আর সকল বিষয়ে তিনি তার সাথে একমত এবং তার শিখার মত কিন্তু একটি ছোট বিষয়ে তিনি আমাকে প্রশ্ন করতে চাইলেন আর তাহলে, যে তার দায়িত্বে উদ্দেশ্য করে না তাকে আমি কি মনে করি? আমি তাকে বললাম: এ প্রশ্নের উত্তর নির্দেশের একটি সহজ উপায় আছে।

202
শেষ নসীহত

আমাদের সামনে হযরত মূসা (আ্য) আছেন আর হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাহ)-ও। আবার আমাদের সামনে মুসার শরীয়তের অধিনস্ত মসীহ রয়েছেন আর ইসলামী শরীয়তের অধিনস্ত ঈসা (আ্য) ও। যে মূসাকে অধ্যক্ষ করে তার সম্পর্কে কি মতামত পোষণ করা উচিত আপনি তা ভাল জানেন। আর যে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাহ)-কে অধ্যক্ষ করে তার সম্পর্কে মতামত কিনা হওয়া উচিত আপনি তাও জানেন। মুসার মসীহর প্রত্যাখ্যানকারী সম্পর্কে আপনার যা মতামত একই কথা ইসলামী মসীহর প্রত্যাখ্যানকারীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এ উত্তর হুনে মেজদুবান তাঁর ছেলেকে ডেকে বললেন, "তাড়াতাড়ি খাবার দাও। তাঁর সাথে তর্ক করা সহজ নয়।" ১৯১২ সালের ২৫শে জুলাই হযরত খলিফাতুল্লাহ মসীহ তালীমুল ইসলাম হাই স্কুলের ভিত্তি রাখেন এবং এ মেহবাবু করেন, "আমি কোন স্থানে পড়েছি, যদি চলিন্ত বিষ্ণুবিকোন বিষ্ণু বিষ্ণু একত্র দোয়া করেন তাহলে খোদা একস্তিক করণাবশত সে দোয়া প্রার্থনা করেন। এ অনুষ্ঠানে আজকে আমরা চলিন্তের অধিক মানুষ একজন হয়েছি। আমাদের কেউ কেউ হযরত কোন স্থল-স্থানিত্ব করে থাকবে। এর জন্য তাদের অনুশোচনা করা উচিত এবং ক্ষমা চাওয়া উচিত।

এরপর আমরা একতার দোয়া করব যেন মহির্মান্ত খোদা। এ স্কুলে পুণঃসনাতন ও ধর্মের প্রকৃতি শিক্ষাপ্রাপ্তি সেবক গড়ে তুলেন আর এমন লোকদের এ স্কুল থেকে দুরে রাখেন যারা দুর্ভিক্ষ এবং যারা অন্যদের পছন্দ করে পারে। এমন কেউ যদি এখানে এসে থাকে তিনি তাদের যেন সত্যিকার অর্থে অনুশোচনা করার মৌলিক দান করেন। ধার্মিক, খোদারচুরি ও মানুষ দুর্ভিক্ষ তোলাহই এ স্কুল প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশ্য।" 1912 সালের লেখায় বোধ দেন।

এরপর উপস্থিত সবাই তাঁর সাথে দোয়ায় যোগ দেন।

হযরত খলিফাতুল্লাহ মসীহকে একজন গরের আহমদী মৌলিক প্রতি তোলেন। মিয়া সাহেব কি একজন সুশিক্ষিত ধর্মীয় আলেম ছিলেন? তিনি উভয়ের বলেন: "প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিষয়ে তিনি খুব একটি শিক্ষিত ছিলেন না। তাঁর পিতা বাল্যকালে বাটালার একজন শিয়া মৌলিক ওল আলী শাহকে তাঁর শিক্ষক নিযুক্ত করেছেন। কিন্তু সর্বশেষকালে খোদা তাঁকে এমন পাতিত্য দিয়েছেন যে ভারত ও আরবের বড় বড় আলেমেরাও তাঁর আরবী বই এর সমতুল্য বই লিখতে পারে নি।

২০৩
হযরত মৌলভী নূরউদ্দীন (রা.) - খলীফাতুল মসীহ আউয়াল

দোয়াতে তাঁর গৌরবী বিশ্বাস ছিল। তাঁর দোয়া প্রহর করত আল্লাহ তাআলা তাঁকে প্রয়োজনীয় সকল জান দান করেছেন।"৩৮

হযরত খলীফাতুল মসীহ বিশ্বাস করতেন, তাঁর প্রতিশ্রুত পুত্র সাহেবতাদা মির্জা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রয়োজা। তিনি (সাহেবতাদা) তাঁর কাছে যা শিখেছেন তা নিম্নলিখিত ভাষায় বর্ণনা করেছেন:

"আমি হযরত খলীফাতুল মসীহর কাছে ছয় মাসে পরিত্র কুরআন শিখেছি। আমার গলা মোহু স্পষ্টকরণ ছিল তাই তিনি আমাকে কুরআন তোলাওয়াত করতে দিতেন না। তিনি নিজে পড়ে অনুবাদ করেছেন আর আমি শুধু পড়েছি। এরপর তিনি কোনো কোনো বিষয়ে মৌখিক তফসীল আরাম করে একসময়ে তা শেষ করেন। আমি তাঁর সাধারণত্তে প্রদত্ত কুরআনের দরসেও যোগ দিয়েছি, কিন্তু ব্যক্তিগত পাঠ তিনি আমাকে এতুকই দিয়েছেন। এরপর তিনি তিন মাসে আমাকে 'রুকারির হাদিস সংকলন পড়ান। হাফেজ রোশন আলীও আমার সাথে পাঠে যোগ দেন। তিনি খুব বুদ্ধিমান ছিলেন আর প্রায় সময় ব্যাখ্যা চাইতেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ ব্যাখ্যা করতেন। দু একবার আমিও প্রথায় জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বললেন, মিয়া! হাফেজ সাহেব মৌলভী ধরনের মানুষ। তিনি জিজ্ঞেস করেন আর আমি প্রশ্নের উত্তর দেই, কিন্তু আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দেব না। আমি যা জানি তা তোমাকে বলি যা আমি জানি না তা আমি তোমাকে বলতে পারি না। তুমি খোদার বাদা, একইভাবে আমিও। তুমি আল্লাহর রসূল মুহাম্মদের (সাহ) অনুসারী আর আমিও। ইসলামের প্রতিপালক করা কেবল আমার একার দায়িত্ব হয় তোমারও বটে। তুমি নিজে চিতা করে উত্তর বের কর। আমাকে জিজ্ঞেস করবে না। এরপর আমি তাঁকে আর কোনো প্রশ্ন করি নি। আমি মনে করি এটি একটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা যা তিনি আমাকে দিয়েছেন।"৩৮

মানুষ বিভূত পাপ এড়িয়ে চলতে পারে, এ প্রশ্নের উত্তর হযরত খলীফাতুল মসীহ অনেক প্রথম ব্যক্তিগত জিজ্ঞেস করেছেন। মৌলানায় মোহাম্মদ কাসেম নানুত্তীর উত্তর ছিল: "মৃত্যুর স্মরণ মানুষকে পাপ থেকে দূরে রাখে।"

"শাহ আবদুল গলী মুজাদ্দেদী যে ব্যবস্থাপনা প্রস্তাব করেছেন তাহলো, "যে সব সময় আল্লাহর হস্তকে জাহান্নাম রাখে সে পাপ থেকে বেঁচে যায়।""
হযরত মসীহ মাওুদ (আও) বলেছেন, “খোদার কাছে পাপের প্রবণতাকে দমনের জন্য অনবরত দোয়া করতে থাকা পাপ থেকে বাচার একমাত্র উপায়”।

হযরত খলিফাতুল মসীহর অভিজ্ঞতা হলো, পুণ্যবাদনের সাহচর্য এবং অনবরত দোয়া করতে থাকা পাপ থেকে বাচার সহজ মাধ্যম। নিজের বেলায় একবার তিনি একটি প্রশ্ন রেখে করেন তাহলে, করআরের একটি বিষয় সমস্ময় সাথে রাখা, যার মাধ্যমে তিনি নিজেকে নসিহত করতেন, তুমি এলাকা বিশাল কর এবংও এটিকে অন্য কর হো? যতক্ষণ পাপের ধারণা তার মন থেকে বেরিয়ে না যেতো এটি তার রক্ষণক্ষেত্র করতো। তার মতামত হলো, এখনো সবই উপকারী। কারা উপর কোনটির প্রভাব পড়ে আবার কেউ অন্যটি দ্বারা প্রভাবিত হয়। আসল বিষয় হলো যতক্ষণ না সফলতা লাভ হয় মানুষের চেষ্টা অব্যাহত রাখা উচিত।

1912 সনের বার্ষিক জলসা হয় ২৫ থেকে ২৭ ডিসেম্বর। তার বজ্রভায় হযরত খলিফাতুল মসীহ বলেন, “খোদার সাথে কারা সম্পর্ক যদি অব্যাহতভাবে উন্মুক্ত করতে থাকে তাহলে আল্লাহ জিলাইলেন তার সাথে সম্পর্ক সমাপনের নির্দেশ দেন। সে ফিরিষ্টাদের মাধ্যমে লাভবান হতে থাকে। এমন অভিজ্ঞতা দক্ষ হারিয়ে যাচ্ছে। আমি আত্মগাম্য, অহংকার বা গর্ভশস্ত্র একথা বলছি না বরং স্থির খোদার নিয়মমত বিচ্ছিন্নতাভবন্ধ বলছি, আমি এমন ফিরিষ্টা দেখেছি আর তারা আমাকে এমনভাবে সাহায্য করেছে যা কল্পনাও করা যায় না। তারা আমাকে তাদের সাহায্য পছন্দ নেয় করতে বলেছে।”

নেক লোকদের সাহচর্য থাকার বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি রসূল করিম (সাহ)-এর সাহাবাদের অসাধারণ সফলতার বিভিন্ন দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন এবং আনুগত্যের কল্যাণ ও আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণের উপর জোর দেন। জীবনের প্রতিটি মুহুর্ত সকল অর্থে খোদার প্রতি তোমাদের যে দায়িত্ব বর্তমান যে পালনে যত্নবান থাকতে যেন মৃত্যু যখনই আসে তোমাদেরকে তার কাছে পুরোপুরি সম্পূর্ণ পায়। সমবেতভাবে খোদার রঙ্গক্ষে আক্ষর্দু ধর আর বিভ্রম হবে না (৩:১০৩-১০৪)। তিনি পারস্পরিক ভালবাসা, প্রেমপ্রিয়তা ও ঐকীকর উপর জোর দেন এবং শক্রতা, বেরিয়ে ও অনেকাং এভাবে চলার জন্য উদাত্ত আহবান জানান।

২০৫
হযরত মৌলভী নূরউদ্দিন (রা.) - খলিফাতুল মসীহ আউয়াল

তিনি এভাবে বস্তুত শেষ করেন: “জাগতিক চিন্তাধারার মানুষ আমাকে বললেন, আমরা আপনাকে আমাদের প্রধান নিযুক্ত করেছি, আপনার মসিক ভাতা কত হওয়া উচিত? আমি খোদার প্রতি যুক্তলাম এবং দোয়া করলাম, হে খোদা! তুমি কখনো আমাকে কার্ক হাতে ছেড়ে দাও নি। এখন কি তুমি আমাকে তোমার সুচিত হাতে ছেড়ে দেবে যখন আমি জীবনের শেষ প্রাপ্তে উপনীত? তিনি আমার প্রতি একান্ত সুপাশীল আর আমাকে এমন স্থান থেকে রিয়ক দেন যা আমি ভাবতেও পারি না। মোটকথা আমি আপনাদেরকে যা বলতে চাই তাহলো, নিজেদের ঈমানকে পার্থিব জীবনের উপর প্রাধান্য দেন। লোভ, খোঁকা ও দুঃখিত পরিহার করুন।”

২৭ ডিসেম্বর শুক্রবার জুমুআর খুবহু হযরত খলিফাতুল মসীহ বলেন, “আমার নামে এ মসজিদের নামকরণ করা হয়েছে। কিন্তু এটি ছোট। এর সম্প্রসারণ আবশ্যক, কিন্তু তা হওয়া উচিত পুণ্যের খাঁচার। এতে বিদ্যুত আইন শিক্ষার জন্য মূলকের ব্যবস্থা থাকা উচিত। তাদের ইসলাম স্কুলের ভবনটি ভাল, সরকার থেকে তহবিল পায় আর যাহোয়াহাতারে এর দেওয়ানো করা হয় যদি নেয়া হয়, কিন্তু কেউ মদ্রাসা আহমদীয়ার দেখানো করে না। এটা অবহেলিত। আমি এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি এবং একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। কিন্তু কার্যমূল এর কোন ফলাফল সামনে আসেনি।”

হাফিজ রোসান আলী যিনি হযরত খলিফাতুল মসীহুর অতি মন্দির শিয়া ছিলেন তিনি বলেন: হযরত খলিফাতুল মসীহ এক লোট বুকে কাদিয়ানে বসবাসের ফলে তার বে লাভ হয়েছে এর কিছু উল্লেখ করেছেন। সেগুলোর একটি হলো: কাদিয়ানে আসার পূর্বে এমন একজন বন্ধ লাভের সুত্রাপ্ত চেষ্টা করেছি, যে আমাকে যথে খোদার খাঁচার ভালবাসবে আর এ কাজে আমি অনেক অর্থ বায় করেছি, কিন্তু আমি সফল হইনি। যখন আমি কাদিয়ান আলী খোদা তাআলা আমাকে এমন বন্ধনের একটি জামাত দান করেছেন যার জন্য আমার আত্মা উপাখিত ছিল। আর এর জন্য আমার এক পয়সাও খরচ হয়নি।

আর একটি কল্যাণ যা আমি হযরত মির্যা সাহেবের সাহচর্যে লাভ করেছি তাহলো: “আমার হদয় থেকে ইহজগতের মৌহ সম্পৃক্ততাবে শিখিল হয়ে গেছে। আমার জীবনের প্রতি দিক দেখুন! কোথাও আমার মাঝে ইহজাগতিক আকর্ষণের একটি কণো আছে কি? এসব কিছু হযরত মির্যা সাহেবের পবিত্র সাহচর্যের ফল। একটি প্রেরণা প্রবাদ আছে, ইহজগতের ভালবাসাই সকল

২০৬
শেষ নসীহত

অপরাধের উৎস। আমি এ কল্যাণ হযরত মির্যা সাহেবের সাহচর্য থেকে লাভ করেছি আর সকল ঐশ্ব শিক্ষার উদেশ্য এটিই এবং এটিই মুক্তির উপায় যা এ পৃথিবীতেই বর্তমান জীবনে ধন্য করে।” ২২০

সাহরাবানপুরের একটি ব্যক্তির প্রধান শিক্ষক ডাঃ বক্তব্য দাস কুশ্তা ১৯১৩ সনের ২২শে মার্চ হযরত কলিফাতুল মসীহ কাহার আসেন এবং ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন। নতুন বয়ানাতকারীকে তিনি এতাত নসীহত করেন: “লা ইলাহা ইলাহাহার অর্থ হলো শুধু আল্লাহই সৃষ্টি করেন আর মানুষের যা কিছু প্রয়োজন সব দান করেন। অন্য কারো ইবাদত করা যাবে না বা খোদা হিসেবে অন্য কাউকে খোদা বানানো যাবে না। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করা বা এক ব্যক্তির অন্য কারো সামনে মাথা নাড়া করা হলো বহু ইসলামবাদ। ইসলাম যেখানে একত্ববাদের শিক্ষা দেয় সেখানে এ বিশ্বাসেরও শিক্ষা দেয় যে মুহাম্মদ (সাল্লাল্হু আলাম) তার বান্দা ও রসূল। এটি এ কারণে যে পুরুষ পৃথিবীতে কোন মূর্তিকে এসেছেন সৃষ্টিকরী পর তাদের অনুসারী তাদেরকে খোদার আসল বসিয়েছে। রামচন্দ্র এবং কুক্কুল কে তাই হয়েছে। হযরত ইসুকারশেখার হাঁটা বানানো হয়েছে, যাইতে তিনি বলেছেন, ‘আমাকে খোদা কেন বলেন?' সত্যিরকারের খোদা ছাড়া অন্য কোন খোদা নেই। সে কারণে মহানবী (সাল্লাল্হু আলাম) পাওয়া তাকে খোদা বানানো হতে পারে এ আশঙ্কায় লা ইলাহা ইলাহালাহার সাথে নিজেকে বান্দা ও রসূল হিসেবে অমূল্য করেছেন। ইসলামের দ্বিতীয় দিক হলো, খোদার সৃষ্টির প্রতি দর্শন প্রদর্শন। যাকাত ও হজ খোদার সৃষ্টির প্রতি দায়িত্ব প্রহরকার। নামায়, রোয়া মানুষের নিজ কল্যাণের নিমিত্তে হয়ে থাকে। রোয়ায় প্রভূত কল্যাণ নিহিত আছে। এটি মানুষকে কোন কিছুর অবৈধ ব্যবহার থেকে বিরত থাকার প্রশিক্ষণ দেয়। কোনো ব্যক্তি রমযানে বৈধ জিনিসের ব্যবহার থেকে বিরত থাকার প্রশিক্ষণ দেয়। কোনো ব্যক্তির রমযানে বৈধ জিনিসের ব্যবহার থেকে বিরত থাকার প্রশিক্ষণ দেয়। সুতরাং কল্যানের অর্থ হলো খোদার একত্ববাদকে নিজের জীবনে বান্দাবানান, মুহাম্মদ (সাল্লাল্হু আলাম)-কে তার বান্দা ও রসূল হিসেবে মানা। আর নামায়, রোয়া, হজ ও যাকাত ব্যক্তিগত সার্থ ও বৃহত্তর পরিসরে সামাজিক কল্যাণের নিমিত্তে সৃষ্টিত হয়েছে। কোন ব্যক্তির কোন ধর্ম গ্রহণের প্রতি কর্তব্য তার পায়ে পানিতে ছিটা দিলে লাভ কি? হযরত ইসুকার (আলাম) বলেছেন, এক ধর্মীয় ব্যক্তির খোদার রাজত্বে প্রবেশের চেয়ে একটি উটের সুইয়ের ছিড়-পড়ে প্রবেশ বেশি সহজ।” ২২২
হ্যারেট মোহনী নৌকুলনী (রা.) - শ্রীফাতুল মসীহ আউয়ার্ল

তিনি বয়াদিরামী জন্য দোয়ার মাধ্যমে শেষ করেন আর নবদিকাক্তের নাম রাখেন আবদুলরাহ হু।

হ্যারেট সাহেবরাদা মির্জা বনীর উদীন মাহমুদ আহমদ ১৯১২-১৯১৩ সনের শরৎ ও শীতে মিশার ও হেজাজ গমন করেন এবং সে যাত্রায় তিনি হজ পালন করেন। ১৯১৩ সনের ৩রা ফেব্রুয়ারী তিনি কাদিয়ান ফিরে আসেন। সে বছর গ্রীষ্মে তিনি হ্যারেট শ্রী মসীহ মসীহুর অনুমোদন সাপেক্ষে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেন যার নাম পরে 'আলু ফযাল' রাখা হয়। প্রথম সংখ্যা প্রকাশ হয় ১৯১৩ সনের ১৯শে জুন। এরপর এটি দৈনিক প্রকাশিত হতে থাকে আর তখন থেকে অর্ধশতাব্দীর বেশি কাল ধরে এটি আহমদীয়া জামাতের অফিসিয়াল মূল্যায়ন হিসেবে চলে আসে।

২৫শে জুন হ্যারেট শ্রীফাতুল মসীহ প্রচুর জীবনে ভোগ করেন। পরের দিন যদিও তিনি বহু দূর্বল ছিলেন কিন্তু প্রাণীকরণ কৃষ্ণমণ্ডল রূপে নিয়েছেন, সে ক্ষেত্রের শেষরাশির দিকে বলেন: "যখন আমি অর্জু হই আমার আশ্রয় হয়, হয়ত এটিই আমার জীবনের সমাধিত। এবারও আমার তাঁই মনে হয়েছে। আমি দু রাকাআত নামায় পড়লাম। প্রথম রাকাআতে সুরা ফাতিহার পর আমি সুরা মোহা। (৯৩) পড়েছি দ্বিতীয় রাকাআতে সুরা ইনশেরোহ। (৯৪) পড়েছি। এরপর আমি খোদার প্রশংসা-কীর্তন ও ইন্দিগফার রত হই। এরপর আমি একটি দোয়া করেছিলে যে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত, সে দোয়া তাত্ত্বিক হয়েছে। আমি তা পুনরাবৃত্ত করেছি যেন আল্লাহ হাফিজ কৃপাক উপাস্য নেই যিনি সুবর্ণীর ও অভিনবীশীল, আল্লাহ হাফিজ কৃপাক উপাস্য নেই যিনি মহাশেষ প্রভু, আল্লাহ হাফিজ কৃপাক উপাস্য নেই যিনি আকাশ ও পূর্বদিক প্রভু এবং মহা সুস্মারিত আরেকের প্রভু। আমি তোমার কাছে তোমার রহমাতের উৎস কামনা করছি, তোমার কৃষ্ণ সম্পর্কে নিষ্ঠুর হতে চাই, সকল কল্যাণের প্রভুত অবশেষে ভিক্ষা চাই আর সকলের হাত থেকে তোমার কাছে নিরাপত্তা কামনা করি চাই। হে সর্বনাশে দয়ালু প্রভু! আমার কৃপাক পাপকে ক্ষমার গভীর বহির্ভূত করো না। আমার কৃপাক দূর না করতে রেখো না। আর আমার কৃপাক বৈধ প্রয়োজনকে অপূর্ণ ছোড়া না। প্রভু আমাদের পিতা দেয়ালে ঠেকে গেছে, আজকে ইসলাম মারাত্মক আক্রমণের সম্মুখীন। মুসলমানরা উদাসীন। সমাজ, কুমারান বা আ-হ্যারেতের (সাই) আদর্শ সম্পর্কে তাদের সামাজেতে আলাদা আছে। শুভে অগ্রসর হচ্ছে। হে প্রভু, তুমি কৃপাক ব্যক্তিকে হাড় করাও যার ব্যক্তিকে ।

২০৮
চুম্বকের মত আকর্ষণী শক্তি রাখে, যে অলস হয় না বরং অভ্যন্ত সৎসাহসী, ধর্মযীন, স্বাভাবিক দোষায় অন্যন্ত এবং তোমার সম্পূর্ণ কাজ করবে। জীবন ও সত্তর প্রাণের জন্য রাখে। এরপর তাকে এমন একটি জমাত দাও যার তার মতৈ সেয়া গুরু ও গুণানুষ্ঠিত হবে। হে আল্লাহ! যদি পরিক্ষা আসার থাকে তাহলে তাদেরকে দুর্দৃঢ়ত কর তার তাদের উপর এমন বোধা চাপিও না যা বহন করার শক্তি তাদের নেই (২:২৮৭)। আর তাদের সেভাবে লালনপালন কর যেভাবে আমি দেয়া করেছি।

আমার বিশ্বাস আল্লাহ আমার দেয়া গ্রহণ করবেন। আপনারই একই চেতনা নিয়ে দেয়া করুন আর আল্লাহর ধর্মের সাহায্যকারী হয়ে যান।”

পরের দিন ছিল জুড়ান। তিনি সমভরে লোকদেরকে খুঁতবার দ্বিতীয় দিনে এভাবে নষ্ঠিত করেন: “দেয়া ছাড়া আর কিছু উপর জোর দেয়ার প্রয়োজন নেই। দেয়ার স্থান অন্যান্য গাড়ো তুলেন। আপনাদের নিজেদের কল্যাণচর্চা আমি এ বিষয়ের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাতে দিচ্ছি। আমি আপনাদের কাছে কিছু চাই না, এমনকি আপনারা আমার সম্পর্কে দাড়িয়ে এটিতে আমি চাই না। যদি আমি আপনাদের কাছে কিছু প্রত্যাশা করি তাহলে এটি খোদার প্রতি চব্বি অক্ষুন্ন হবে। তিনি সাথে জীবন আমার দেখাতে করেছেন তিনি কি বৃদ্ধ বয়সে জীবনের বাকী কয়েকটি দিনের জন্য আমাকে আপনাদের দয়া-মায়ার উপর ছেড়ে দেবেন? তার অব্যাহত নিয়মতরের বাধা হলো, আমি যেন পুরান্ত তাঁর হয়ে যাই। আমার সকল শক্তি-রূপন্ত ও সাধন তাঁর দান। আমি যে সমান ও শ্রদ্ধা পাই তা সবাই তাঁর উপহার।”

এটি আস্তঘরের বিষয় যে জমাতের সদস্যদের প্রতি ন্যায়কাত্ত মসীহের ঐক্য ও সমীক্ষার স্থাপনের সমস্ত আকৃতি আর বিভিন্ন ও তুষার-ভেদের মিশ্রায় পরিণতি সম্পর্কে তার সকল স্বথবাগীর, ভিন্ন মত পোষণকারী শ্রেণীর মূল হোতার উপর আদৌ যদি কোন প্রকার গত্তি থাকে তা ছিল একবারেই ক্ষয়স্থায়ী। সত্য বলতে কি, তারা বরং তাদের হল্লাদিরতা বদ্ধমূল হয়ে যায়। এটি সত্য কথা, যথাযুক্তভাবে সাবধান করার করারে জমাতের সাহায্যপ্রাপ্ত শ্রেণী সংখ্যালঘু কিছু প্রতিব্যস্তী সংক্রান্ত মনার ধূর্ত প্রতারণা থেকে নিরাপদ থাকে। এটি সত্যকার অর্থে অনেক বড়ো সফলতা। কিছু দুঃখের সাথে বলতে হয় এসবকিছু সত্যেও বিচ্ছিন্নতাকে সম্পূর্ণভাবে এড়ানো সম্ভব হয় নি।

২০৯
হয়রত মোলভী নুরউদ্দীন (রা.) - খলিফাতুল মসীহ আউয়াল

ভিন্নমত পোষণকারী শ্রেণীর নেতৃবৃন্দের বেশির ভাগ লাহোরে থাকত। হয়রত খলিফাতুল মসীহ সাহেবের অবস্থা অপরিহার্য চলে আসছিল। এরপর কিছুটা অবনতি হয়। বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী অবশ্যই সংঘটকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে সক্রিয় প্রস্তুতি আরম্ভ করে। তাদের প্রথম প্রকাশ্য পদক্ষেপ হলো, লাহোর থেকে 'পঞ্চমে সুলাহ' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করা। ১৯১৩ সনের ১০ই জুলাই এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। হয়রত খলিফাতুল মসীহ এর গ্রাহক হন কিন্তু পরে তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাতেন তিনি এর নীতি ও অনুসরণ গ্রহণ করে। এত ক্ষুদ্র ছিলেন যে এর নাম রেখেছেন 'যুদ্ধের পঞ্চমে'(যুদ্ধের বাগী)। মাঝে মাঝে এতে খলিফাতুল মসীহের প্রভূত আনুগত্যের অস্বীকার ছাপা হতো কিন্তু এতে দৃষ্ট কোন প্রত্যেক দেখা যেত না। হয়রত সাহেবযাদা মির্জা ব্যারী উদ্দীন মাহমুদ আহমদ এর ছুঁড়াও খলিফাতুল মসীহের সমাজাধিকৃত হিসেবে জামাত তাকেই নির্বাচিত করেন। খলিফাতুল মসীহ যে সাহেবযাদা সাহেবকে গৌরীর প্রভূত দৃষ্টিতে দেখতেন তা তিনি কখনো গোপন করেন নি। হয়রত মসীহ মাওদ (আহ) জামাতের যে স্বতন্ত্র বিশ্বাস ও মতবাদ নির্ধারণ করেছেন তা বারবার হয়রত খলিফাতুল মসীহ কোনও জোরালোভাবে সমর্থন হয় আর তখন পর্যন্ত নেতৃস্থানীয় বিশ্বাসীরা সেগুলোর প্রতি সমর্থন জানিয়ে আসছিল। কিন্তু মূলধারার লোকের মাঝে জনপ্রিয়তা লাভের উদ্দেশ্য পর্যায়ক্রমে তাদের সে বিশ্বাস হারিয়ে যেতে থাকে।

হয়রত খলিফাতুল মসীহ সাহেবের কৃমাবনতি সত্যতে ১৯১৩ সনের রমযানে পুরো কুরআনের দরস দেন।

সুলাহ ও কাপুরুষোচিত মূল আক্রমণ করা হয় ১৯১৩ সনের আগস্টে একদিন পর এক ইহাদুল্লাহ হক 'এক' এবং ইহাদুল্লাহ হক 'দুই' নামে দুটো বেনামিটে ট্রাইয়ে (রচনা) প্রকাশের মাধ্যমে। এগুলো হয়রত খলিফাতুল মসীহ ও হয়রত উমমুল মু'মিনিনসহ হয়রত মসীহ মাওদ (আহ)-এর পরিবারের সদস্যগণ সম্পর্কে যুদ্ধ ও লজ্জকর অপকৌশল মাত্র যা মিথ্যা ও কল্পক্ষয় অপবাদে পরিপূর্ণ ছিল। অস্বীকার করা সত্যে এগুলো যে ভিন্নমত পোষণকারী শ্রেণীর নেতৃত্বাধীন লোকের প্ররোচনায় লেখা হয়েছে তা প্রমাণিত হয় ১৯১৩ সনের ১৬ই নভেম্বরের পঞ্চমে সুলাহ তে প্রকাশিত সম্পাদকদের নির্মাজ্জ মতব্যের মাধ্যমে:

২১০
রচনায় আমরা যা দেখেছি এর ভিত্তিতে বিন্দুমাট্র সনদেহ পোম্যের অবকাশ দেই যে এতে উল্লাপিত অধিকাংশ মন্তব্য সত্য.... লাহোরের আনসারকুলাহু যদি এ ব্যাপারে কিছু করার প্রয়াস পায় এবং তারা যদি এতে অন্তর্ভুক্ত মন্তব্যগুলোর প্রতি আমাদের সমর্থনের কারণে ভূবুদৃশী সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আমাদের বিকৃতি কিছু লেখার কথা বাহে তাহলে প্রত্যেকের আমরা যা প্রকাশ করব এর জন্য তারা নিজেরাই দায়ী থাকবে।”

হযরত খলিফাতুল মসীহু আল্লাহু আন্সারকুলাহুকে এর উত্তর প্রকাশ করে প্রকাশের নির্দেশ দেন। যখন উত্তরের পাশ্চাত্য তার সামনে উপস্থাপন করা হয় তিনি দেখে সেখানে মন্তব্য করেন যে পঞ্চায় (সুলাহ) খোলা চিত্র প্রকাশ করে যুক্ত বার্তা প্রকাশ করেছে এবং সহশ্র অভিশ্চেপের ভাষী হলে আর একইসাথে মুলাফিক হওয়ার কথা স্থির করেন যে একটি সুন্দর বিষয়কে জাগানোর চেষ্টা করে সে অভিশ্চেপ

ঋতুর দুটো হায়দ্রাবাদের আকারে প্রকাশ করা হয়। প্রথমটি ২৩শে নভেম্বর ‘খিলাফতে আহমদীয়া’ নামে আর দ্বিতীয়টি ‘ইহুদার হামীকত’ নামে ১৯১৩ সনের ২৮শে নভেম্বর প্রকাশ করা হয়। মসীহু শরা রচনায় উল্লাপিত সকল মানহানিকর, আগবাদপূর্ণ ও ঢাহা মিশ্র আগ্রহ দায়ভাঙ্গা উত্তর ছিল এভাবে। আর এটি জামাতেক সে সকল অদৌই থেকে সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ রেখেছে যা সে রচনাটির উদ্দেশ্য ছিল।

রচনার থেকে প্রতি ব্যাপার পর হযরত খলিফাতুল মসীহু মারাত্মক অসুস্থ অবস্থায় যাত্রা দেখেন, কেউ তার পকেটে একটি রুপি রেখেছে তিনি এর তারীখ করেছেন, তার ঘরে একটি রুপি সমানের জন্য হবে। ১৯১৩ সনের ১৮ই নভেম্বর তার ঘরে ৫০ ছেলের জন্মের মাধ্যমে এ রুপি পূর্ণ হয়। তিনি তার নাম রাখেন আলুপ্রাহ।

১৯১৩ সনের বার্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত হয় ২৫ থেকে ২৭ জুলাই। পূর্বের যে কোন জলসার তবলায় উপস্থিতি বেশি ছিল। হযরত খলিফাতুল মসীহু তাঁর বদ্ধমুখ বলেন, “অস্থির রক্ষা করা একটি আবশ্যকীয় দায়িত্ব। আমি একটি অস্থিরকারের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো যেন আপনারা গীতিকারের ক্ষেত্রে দেখতে পারেন যে আপনারা কতটা সে অস্থিরকার রক্ষা করছেন। সেটি হলো, আপনাদের আনুগত্যের অস্থিরকার যা আপনারা আমার সাথে করছেন।

২১১
হযরত মৌলিকী নূরউদ্দীন (রা.) - খনিফাতুল মসীহ আউয়াল

এছাড়া আপনাদের মধ্যে এমন দুর্ভাগা কোন কোন লোকও আছে যারা বলে, খনিফা আবার কি? তিনি তো একজন অনৈতিক বৃদ্ধ। দেখুন, শুনুন এবং মনে রাখুন যে মহিমান্ত খোদা স্বয়ং আমাকে খনিফা বানিয়েছেন। আমি কোন কিছুর জন্য আপনাদের কারো উপর নির্ভরশীল নই। আমি বাধ্যতামক পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পাবার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেছি আর তিনি আমাকে নিরাপদ দিয়েছেন। তিনি আমাকে তার কালামের জান দান করেছেন। আপনারা আমার যে সমালোচনা করছেন তা খোদা কর্তৃক অনুমোদিত নয়। তিনি আমার জন্য ঈরা রাখেন। আপনারা কুদারণা পোষণের জন্য অনুশোচনা করুন। তিনি আমার সকল শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির হেফাজত করেছেন। সকল প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্ত কেননা তিনি পরম দানশীল।

আপনারা শান্তি-নিরাপত্তা বা ভয়াতি সংক্রান্ত কোন ওজন ছাড়াই যাবেন না, যে নিরাপত্তাকে যাফির মুখে ঠেলে দিতে পারে। এ ধরনের সব কথা আপনারা আপনাদের আমার বা প্রেসিডেন্টকে জানাবেন আর সঠিক পদক্ষেপ নেয়া তাঁর দায়িত্ব। যারা 'ইহাসারুল হক' নামে দুটি ট্র্যাক্ট (রচনা) এবং আনসারাল্লাহর উদ্দেশ্যে খোলা চিঠি লিখেছেন আর খিলাফত সম্পর্কে আলোচনা করেছে তাদের এমনটি করার কোন অধিকার ছিল না। খোলা চিঠি আমার হয়ে প্রচেষ্টা আয়ত করেছে। এরপর একজন আমাকে একটা ছাপানো কাফ্ত পাঠিয়েছে আর তা প্রকাশের অনুমতি চেয়েছে। আমি তাকে বলেছি, আপনি কুরআন বিরোধী কাজ করেছেন। তিনি সে কাজ করার অনুমতি চাইছেন যা ইতিমধ্যে করে ফেলেছেন। এমন ব্যক্তি কুরআনের শিক্ষার পরিপূর্ণ কাজ করে আর এমন জামাতকে দ্বিক্ষিত করতে চায় খোদা যাদেরকে আপন অনুগ্রহ এক ব্যক্তির হাতে ঐক্যবদ্ধ করেছেন। এদের ব্যাপারে সাবধান!

এরপর একজন বলেছে, আমি খচ্ছ থেকে পড়ে গেছি এটি আমার খিলাফতের পদমর্যাদা থেকে খুলিত হবার ইচ্ছিত বহন করে আর এটি নাখি আমার দৈনিক অভাবে হয়েছে। এটি হযরত মসীহ মাওদু অ(আ)-এর একটি দিব্যদর্শনের প্রকাশ্য ভূল ব্যাখ্যা। আল্লাহ আমাকে এমন সব কথার উত্তর শিখিয়েছেন। এমন লোকদের এড়িয়ে চল আর সকল কুদারণাকে পরিহার কর।"২৩

জলসার পর তিনি নিম্নোক্ত লেটার লিখিয়েছেন: "মহিমান্তি খোদা পবিত্র কুরআনে বলেন, যদি তোমারা আমার দানের জন্য কৃতজ্ঞ হও তাহলে আমি সে

২১২
সকল নিয়মগতকে অবশ্যই বৃদ্ধি করব (14:8)। ঐশ্বী দানের জন্য কৃতজ্জ্বতা প্রকাশ অধিকতর দানের কারণ হয়, সুতরাং ঐশ্বী দানের কৃতজ্জ্বতার নিদর্শন-স্বরূপ আমি আমার প্রভুর দর্শাবে কৃতজ্জ্বতা জাপন করছিল কারণ তিনি আমাদের প্রতি পর্ম অনুগ্রহিল।

চলতি বছরে কেন কেন নিবেদিত জামাতের মধ্যে অশাস্তি সৃষ্টির পায়তারা করছিল আর সে লক্ষ্যের সাথে যেখানে নেই বেশিরভাগের প্রচার করছে, যাতে আমাদের আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে তাদের উদাহরণ ছিল জামাতের মাঝে সমিতি বুঝি বুঝি সৃষ্টি করা। কিন্তু আদর্শ কর্মী এমন দূষিত থেকে জামাতকে এবং আমাদের নিরাপদ রেখেছেন। তার সাহায্য ও সমর্থন এমন ভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে দূষিতকারীদের সকল ভুলের ঘটনা স্থাপন করে এবং জামাতকে সকল অনিষ্ঠার হাত থেকে রক্ষা করা হয়েছে। আর একটি বার্ষিক জনসাধারণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সর্বশক্তিমান খাদ্য বিশেষ সাহায্য ও সমর্থনের এটি একটি বিশিরকার যে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতি এবং “ইন্দ্ররহমন হক” নামে মরমীদায়মান ট্যাঙ্কার প্রকাশ করা সত্যের এ বছরের জনসাধারায় উপস্থিতি বিনিময় বহরগুলো তুলনায় বেশি। অন্য রকম কাজের চেহারায় প্রকাশিত ভালবাসা ও আত্মবিশ্বাসের লক্ষ্য থেকে সৃষ্টি করে প্রতীয়মান হয়, আহমদীয়া জামাত সকল ক্তিকার প্রভাব থেকে মুক্ত। এছাড়া তাদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জামাত এমন দৃষ্টিভঙ্গি স্থাপন করেছে, যা খোদার বিশেষ রহমতের প্রমাণ।

চলতি বছরে জামাত ঠাকুর অনেক ভারী বোঝা বহন করেছে। এ সত্যের সদর আদর্শ ঘটিত মধ্যে রয়েছে। জামাতগুলো হাসিমূখে বহুলভূতভাবে ঘটিত পূর্ণ দায়িত্ব কার্য নিয়েছে আর বেশ বড় অক্ষ নগদ হিসেবে দেয়া হয়েছে।

সর্বমাত্র যে পরিমাণ ওয়াদা ও নগদ আদায় হয়েছে তা গত বছরের মোট ঠাকুর তিনগুলি। জামাতের নগণ্য জনসংখ্যার নিরিখে মনে হয় এটি বিশেষ ঐশ্বী রহমত।

সমীক্ষণে সেসব লোকদের কথার পরে দাতাবাদা জন্য দেয়া হয় যারা আমার খচ্চর থেকে পড়ে যাওয়াকে যালীফার পদ ও মর্যাদা থেকে অপসারিত হওয়া হিসেবে অপব্যাখ্যা করেছে। যখন খিলাফতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও হৈ হৈ আরম্ভ হয় তখন খোদা আমাকে একটি এক্ষেত্রে দেখিয়েছেন, আমি যেহেতু কাটে এমন প্রায়মূল সফর করছি যা ছিল সুখ্স ও পরিত্যক্ত। আমি যেহেতু কাটাকে সামনে চলাচলের চেষ্টা করি, তা এব দ্রুত দৌড়াতে আরম্ভ করে যে আমার জন্য নিয়মকরণ করা কঠিন।

২১৩
হযরত মৌলরী নুরউদ্দিন (রা.) - খলিফাতুল মসীহ আউয়াল

হয়ে পড়ে কিন্তু আল্লাহর দয়ায় আমি দুঃখভাবে এর পিঠে বসে থাকি। দীর্ঘ দূরত্ব অতিক্রমের পর ঘোড়াটি একটি সরুজ উপত্যকায় প্রবেশ করে, যেখানে সবর্ব দু ফুট উচু ঘন সরুজ ক্ষেত চোখে পড়ে। ঘোড়া অনবরত দৌড়াতে থাকে আর যখন উপত্যকার মাঝামাঝি পৌঁছে তখন আমার যুম ভেঙে যায়। এ স্থলের আলোকে আমি বুঝতে পেরেছি, আমি খিলাফত থেকে বিচ্ছিন্ন হবো বলে যারা অপলাপ করেছিল তারা ভাষা প্রমাণিত হবে। আর আল্লাহ প্রথম আমাকে খিলাফতে অধিষ্ঠিতই রাখবেন না বরং সফলতা দান করবেন। এটি খোদার কৃপা যে তিনি আমার এ স্পন্দু পূর্ণ করেছেন। এ বছরের বার্ষিক জলসা প্রমাণ করেছে, এটি একটি সত্য-স্পন্দ ছিল। বিবর্ণিতা ও বেনামি ট্রায়ট (রচনা) প্রকাশিত হওয়া সত্যেও তিনি সম্পর্কের পর সমার্থী জুড়িয়েছেন। তিনি জাতিতের সদস্যদের অডঃ প্রতিনিধি ভালবাসা ও আত্মাবাদ এ প্রেরণা বুদ্ধি করেছেন, তাদের হদয় আমার প্রতি আকৃষ্ট করেছেন, তাদেরকে আনুগত্যের প্রেরণায় সমক্ষ করেছেন আর দুর্কৃতিকরীদের প্রতি প্রভাব তাদের নিরাপত্তা বিধান করেছেন।”

১৯১৪ সনের ২রা ফেব্রুয়ারী হযরত খলিফাতুল মসীহ নিম্নীক্ত নির্দেশ জারি করেন: “স্মরণ রাখবেন আমার সত্তাদের কোন দাত্ব তহবিল, কোন সাদক্ষি, যাকাত বা এতেমুদর কলায়নের নিমিত্তে রাখা তহবিল বা দরিদ্র তহবিল থেকে যেন কিছু দেয়া না হয়। খোদা তাদের জন্য কোন ব্যবস্থা করবেন। কেউ যদি আমার জীবন বৃদ্ধি লিখে, সে যেন আমার এই নির্দেশের কথা উল্লেখ করে আর এতে কোন পরিবর্তন থেকে যেন বিশ্বাস থাকে। আমার কাছে কোন অর্থ নেই। আমার সকল খানা পরিশোধ হয়ে গেছে। কেউ আমার কাছে কিছু পাবে না। কেউ যেন আমার সত্তাদের নিকট কিছু দাবি না করে।”

২১৪
ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ

আমার পিতা চৌধুরী নাসরুল্লাহ খান ছিলেন পাঞ্জাবের সিয়ালকোট কর্মরত একজন আইনজীবী। শতাব্দীর প্রারম্ভে তাকে একটি দিওয়ানী মামলায় বিবাদিত পক্ষের উকিল নিযুক্ত করা হয়, যেখানে বিচার বিভাগীয় সিদ্ধাংশের নিমিত্তে অনেক মজার-মজার প্রশ্ন সামনে আসে। কয়েক বছর পূর্বে সিয়ালকোট সেনা ছাউনির সুরুহুৎ ও সুসজ্জিত জামে মসজিদের ইমাম ও মুতাওয়ালী মৌলিকী মোবারক আলী আহমদীয়ত প্রচার করেন। এমন মতবাদের সাথে তার সন্নিকটতা, প্রথাগত মুসলমানদের আলেম শ্রেষ্ঠ কর্তৃক চরমভাবে সমালোচিত। এটি নামায়িদের একটি বুদ্ধিবেদনের জন্য মাধ্যমগত ও অবিচ্ছিন্ন করণ হয়ে উঠে। তাকে উকিলী দিয়ে ক্রমশ অসহনীয়তা ও শত্রুতার পরিস্রাবে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের কয়েকজন অবশেষে প্রতিনিধিত্বমূলকভাবে এ নিদর্শ দেয় একটি মামলা দায়ের করে যে আহমদীয়া জামাতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে বিবাদিত মৌলিকী মোবারক আলী আর মুসলমান রইলেন না। সে কারণে তার জামে মসজিদে ইমামতি বা মুতাওয়ালী ধারক কোন অধিকার নেই। সে যুগে সিয়ালকোট কোন আহমদী উকিল ছিল না তাই আমার পিতা বিবাদিত পরামর্শদাতা নিয়োজিত হলেন। 'একজন আহমদী মুসলমান পণ্য হতে পারে না' বাদীপক্ষের এ দাবীর সমর্থনে উকিলের মতবাদগত যুদ্ধপ্রধান আমার পিতা বিশ্বাসের অধ্যায় করলেন এবং তার হৃদয়ে আহমদীয়া দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি সহানুভূতি সৃষ্টি হয়। আর একটি বিষয় যা তাকে গতিরোধের প্রতিবাদ করেছে তাহলে, বাদী পক্ষ ও তাদের সমর্থকেরা যেখানে দেখেছে যে প্রশ্নের সরাসরি উত্তর প্রদান তাদের বিপক্ষে মতে পারে সেখানে শেষ পর্যন্ত করেও মিথ্যা বলতে বা সত্যকে বিকৃত করতে তারা দ্বিধাবোধ করে নি অথচ বিবাদীপক্ষ ও আহমদী সাহিত্যের একত্র প্রতি আদালতে ভ্রমক্রমে করেন নি যে তাদের পৃথিবী তে মামলার উপর বিচার প্রভাব পড়ে পারে বরং দৃঢ়ভাবে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, আহমদীদের উদ্দেশ্য নেতিক্ষেপ হিসেবে এমন আকর্ষিত হয়ে পাওয়া তাদের সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার সাহায্য বহন করে। বিচারক বিবাদী পক্ষে রায় প্রদান করেন এবং মামলা খারিজ হয়ে যায়। রায়ের বিকৃত্তে বাদীর আপিলও খারিজ হয়ে যায়। এ মামলার কার্যবিবরণী আমার পিতাকে আহমদীয়তের প্রতি গতিরোধে আকৃষ্ট করে।

২১৫
হযরত মৌলভী নুরউদ্দিন (রা.) - খলিফাতুল মসীহ আউয়াল

এর অন্দ কিছুকাল পর তাকে একটি কৌজদারী মামলায় বিবাদী পক্ষের সাক্ষী হিসেবে গুরুদাসপুরের ম্যাজিস্ট্রেট কোটে উপস্থিত হবার নির্দেশ দেয়া হয়, যে মামলায় একজন চরম বিরুদ্ধবাদী মৌলভী করমদিনের তথ্যকথিত মানহানির দায়ে আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্জা গোলাম আহমদ সাহেবের বিরুদ্ধে চিরকাল কার্যক্রম চলছিল। এটি তাকে সেই মহান ব্যক্তিরের সাথে সাক্ষাৎের সুযোগ এনে দেয় আর তিনি তাঁর উন্মুক্ত আধ্যাত্মিকতায় গতিরভাবে প্রভাবিত হন।

প্রায় একই সময়ে, ১৯০৪ সনের গ্রীষ্মে, আমার মা আধ্যাত্মিক গুরুত্বমমন্ত বেশ কয়েকটি ঘট্ট দেখেন। এতে তিনি একজন উচ্চমার্গের আধ্যাত্মিক ব্যক্তির সংস্পর্শে আসেন, অথচ আহমদীয়াতের সাথে তাঁর কেন যোগাযোগ বা আহমদীয়াতের কন্স জন ছিল না যদিও তাঁর পিতা ও একমাত্র ভাই কিছুদিন পূর্বে জীবনকাল হয়েছিলেন। তিনি অনুরোধ করেন, সেই বুদ্ধিয়া তাকে খোদাইরের পথে পরিচালিত করতে চাইছেন। ঘট্ট তাকে উদ্যোগ করে এবং তাঁর মনে গভীর রেখপাত করে। তাঁর কোন ধারণা ছিল না যে সেই সমাজের ব্যক্তি কে? তৃতীয় স্তরে তিনি তাঁকে তাঁর পরিচয় দেয়ার অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, তিনি আহমদ। যখন তিনি একথা আমার পিতা তাকে অপরাধ করতে তিনি বলেন, আহমদ হযরত মুহাম্মদ (সাহেব)-এর একটি নাম। হযরত তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের দেখাও লাভ করেন। তিনি বলেন, তাঁর মতামত হলো, তাঁর স্বপ্নে দেখা মানুষ একজন সামাজিক যুগের জীবিত মানুষ যার মাধ্যমে তাঁকে সত্য ও তোকবারের পথে পরিচালিত করা হচ্ছে। কিছুদিন পর তাঁর ভাই তাঁর সাথে দেখা করতে আসেন এবং তাঁর শেষ স্পর্শের কথা রয়ে তিনি তাকে বলেন, আহমদ প্রতিক্রিয়া মসীহর নাম, যাচাব তিনি স্বপ্নে দেখেছেন। তিনি বলেন, আমি নিশ্চিত যে আল্লাহ তাআলা যিনি আমাকে পথ-প্রদর্শনের এ পদ্ধতি বেছে নিয়েছেন তিনি যথা সময়ে তাঁর উদ্দেশ্য আরও সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করবেন।

থেকে থেকে, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) লাহোরের সফরে এসেছেন এবং তাঁর উপস্থিতিতে ১৯০৪ সনের ৩শে আগস্টে তাঁর একটি প্রবন্ধ পাঠ করা হবে। সে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আমার পিতা লাহোরের যান আর পাম সৌভাগ্যক্রমে আমাকেও সাথে নিয়ে যান। যে মুহূর্তে আমার চোখ সে পবিত্র চেহারার উপর পড়ল আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। আমার বিমুখ নয়ন, মৌলভী
আবদুল করীম কর্কুক সন্দর্ভটি পাঠের পুরো সময় তার জ্যোতিমিতি চেহারায় স্থির ছিল আর তার সত্যতা আমার অস্ত্রাত্মায় স্থান করে নেয়। আমি অনুভব করলাম, আমি সম্পূর্ণরূপে তার জন্য নিবেদিত। যদিও বছরে তখন আমি একজন স্কুল ছাত্র ছিলাম মাত্র। কিন্তু আমি নিষ্ঠিত এ সুযোগ দিয়ে আলাহু আমাকে তার অফরান কলায়ে সমৃদ্ধি করেছেন।

১৯০৪ সনের ২৭শে অক্টোবর হযরত মসীহ মাওউদ (আয়) তার পরিবারের সদস্যগণ, মৌলভী নূরউদ্দীন এবং কয়েকজন শিক্ষাসহ সিয়াঁলোকের আসেন। পরবর্তী দিন সকালে আমার আর যখন আদালতে যাচ্ছিলেন তখন আমার মা বললেন, ইনিই তার স্পন্দে দেখা সমান ব্যক্তি কিনা তা নিষ্ঠিত হবার লক্ষ্যে তিনি মহামারিতে অতিথির সাথে দেখা করার জন্য যেতে পারেন কি?

তিনি বললেন, “অবশ্যই যাও এবং নিষ্ঠিত হও। কিন্তু চুলান্ত কোন সিদ্ধান্ত নেবে না।”

“খোদা আমাকে যে সুম্পত্তি দিবনন্দন্তা দিয়েছেন এর পরও যদি আমি পিত্তিয়া থাকি আর ইনিই যদি সে ব্যক্তি হয়ে থাকেন তাহলে আমি খোদার দৃষ্টিতে দোহাই সাধ্যত হবে।”

“এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আমরা এ বিষয়ে দীর্ঘ-দীর্ঘতা হই তা আমি চাই না। আপনি জানেন, আমি এ বিষয়ে পড়লেখা করছি। আমরা এককে এ সম্পর্কে আলোচনা করবো। আর আমি আশা করি আমরা একই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবো।”

“আপনি নিষ্ঠিত মানুষ, আমার কোন পুনর্ব্যাপ্ত জন্ম দেই কিন্তু আমি অনুভব করি যে খোদা কর্মণধার্য আমাকে হেদযাত দেয়ার জন্য তার নিজস্ব পথে বেছে নিয়েছেন। যদি আমি দেখি যে তার পননিদর্শনা এদিকে ইনিত করছে তাহলে আমাকে অবশ্যই সেভাবে এগাঙে হবে। যদি তিনি কিছু হয় তাহলে আমি সাঙ্গে আপনার সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো আর আমরা একত্রে সিদ্ধান্ত নিতে পারবো।”

“সামাজিক বিলম্বে কোন প্রতি হবে না। এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের পরিস্থিতের বিপরীত মেরুতে অবস্থানের ব্যাপারে আমার ভয় হয়।”

“আমার অনুভূতি সম্পর্কে আমি আপনাকে অবহিত করেছি।”

যে অনুসন্ধানের 'মা' সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন আর যে দিকে তার আত্মা তাকে উদাঘাত আহবান জানাচিল সে পথের সহায়ে যখন তিনি বেরিয়ে
হযরত মৌলিকী নূরুদ্দিন (রা.) - খলিফাতুল মসীহ আউয়ালান

পড়লেন তখন আমি তাঁর সাথে ছিলাম। যে বাড়িতে হযরত মসীহ মাওদুদ ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা অবস্থান করছিলেন সে বাড়িতে এসে তিনি হযরত উমুল মুমিনীনের সমীপে উপস্থিত হন এবং তাঁর মহাসমান্তি স্বামীকে এক ঝলক দেখার অর্জন করে দেয়ার অনুরোধ জানান। তাঁর কাছে অনুরোধ পৌছানো হলো। তিনি বলে পাঠালেন, কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি এ পথে পার্থক্য মসজিদে নামাজের জন্য যাবেন আর পথে কয়েক মিনিট দাঁড়াবেন। তিনি এলেন এবং যেখানে আমি এবং আমার মা বসেছিলাম সেখান থেকে কয়েক ফুট দূরে হযরত উমুল মুমিনীনের পাশে বসলেন। তাকে দেখতেই তাঁর চেহারায় আনন্দ বিলম্ব করে উঠে এবং মুদ্রা হেসে তিনি নিবেদন করলেন, “হযরত! আমি বয়ারাত করবে চাই।” তিনি তাঁর উভয়ের সেয়ার ইতিবাচক সাজে দেন, “আমি যা বলি তা আমার সাথে পুনরায়গঠন করুন.” এরপর তিনি বয়ারাতের বাক্যালাম একের পর এক পড়লেন আর আমার মা তাঁর সাথে পুনরায়গঠন করলেন। শেষের দিকে তিনি নীরব দোয়া পরিচালনা করলেন যাতে পরিবারের মহিলারা, আমার মা ও আমি যোগ দিলাম। এরপর তিনি চলে গেলেন। আমি পরে জানতে পারলাম আর আমার নিজের অভিজ্ঞতাও এটি যে তাঁর পক্ষে এমনটি করা খুব অস্বাভাবিক বিষয় ছিল, অধিকসংখ্যা নবদীক্ষিতা একজন মহিলা, যার স্বামী জ্ঞাতার সদস্য নন। কোন পক্ষে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে নি। বয়ারাতের নির্দিষ্ট শব্দ ছাড়া আর একটি বাক্যও বিনিমিয় হয় নি। এমন মোট হয়ে লাগল, সদ্ভাবী ও যারা সদ্ভাব হচ্ছেন তাদের উভয়ের মাঝে পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক বোঝাপূর্ণ ছিল। আমার মায়ের আত্মা ছিল প্রশংসিত। তাঁর অনুসারী তাকে আধ্যাত্মিক জানাতের দিকে পরিচালিত করেছে। সম্প্রতি হযরত তিনি তাকে আর কক্ষনা দেখেন নি। কিন্তু তাঁর জীবনের শেষ নির্ধারণ পর্যন্ত, এক শতাব্দীর এক তৃতীয়াংশ কালেরও বেশি সময় ধরে সকল পরিক্রাম মুক্ত তাঁর প্রতি তাঁর আত্মতন্ত্র ছিল প্রশংসিত ও নির্ভরজন্য। কোন কিছু কখনো তাঁর নিশ্চিতে দোস্তুল্মান করতে পারেনি। সকল প্রতিক্রিয়ার মুখে তাঁর বিশ্বাসই ছিল সবকিছু, যা সকল পরিস্থিতিতে তাকে সমৃদ্ধ রেখেছে।

তিনি হযরত উমুল মুমিনীনের সাহচর্যে আধা ঘন্টার মত অবস্থান করেছেন। সে সময়ের মধ্যেই তাদের মাঝে এক গভীর বন্ধুত্বের ভাব রচিত হয়। এটা সারা জীবন স্বরূপ ছিল। যখন আমারা ঘরে ফিরে আসি তিনি অবশ্যই ভেবে থাকবেন, দু ঘন্টার মধ্যে তাকে হযরত জীবনের সবচেয়ে কঠিন পরিক্রাম সমুদ্রীন হতে হবে। কিন্তু তিনি নিষ্ঠিত ছিলেন, যে পদক্ষেপ তিনি নিয়েছেন তা ঐশ্বর
ব্যক্তির স্মৃতিচরণ

ইচ্ছায় পরিচালিত আর এ বিশ্বাস তার মাঝে বস্তুমূল ছিল, যিনি তাকে এ পর্যন্ত পথের দিশা দিয়েছেন তিনি তাকে শেষ পর্যন্ত সহায়তা দেবেন। তার শ্যামীর সাথে তার কথায় তেমন মারাত্মক মতবন্দল হয় নি। এখন তারা একটি সংকটের মুখোমুখী যা তাদের আত্মার মুক্তির সাথে সম্পর্কিত। শ্যামীর বৃত্তি ফিরে আসার অপেক্ষায় তিনি অবশ্যই দীর্ঘমেয়াদ ও শক্তির জন্য দোকান করে থাকবেন।

তিনি ঘরে পৌছেন। পুনরায় যা ঘটেছে তাও দেখার সৌভাগ্য হয় আমার। তার সত্ত্বা সীম্রাত ভালবাসা যোগ করে তিনি অধিক আগ্রহ ও উদ্দেশ্যে সাথে জিজ্ঞাস করেন, “আপনি কি গিয়েছিলেন?”

“হা, আমি গিয়েছি।” “এরপর?”

“তিনিই সে ব্যক্তি।” কিছুটা ক্রমপরম ঘরে মা উদ্ধার দেন।

“আমি বিশ্বাস করি আপনি কোন চূড়াত সিদ্ধান্ত নেন নি।” তিনি তার বক্তঃ দান হাত রেখে দৃঢ়তার সাথে বলেন: “আমি বয়স্কর করেছি।”

তার চেহারা অন্ধকারে ছেড়ে যায়, ঠোঁট কেপে উঠে। কিন্তু তিনি আত্মসংরক্ষণের চেষ্টা করেন এবং বলেন, “ভাল হয়নি।”

এরপর তিনি (বাবা) তার চারকে ডাকেন এবং বলেন, “আমার বিষ্ণু পাশের ঘরে নিয়ে যাও।”

এতে তিনি (মা) কিছুটা উচ্ছবে চাকরকে বলেন, “তার বিষ্ণু পুনরুদ্ধারের ঘরে নিয়ে যাও।” এতে তিনি (বাবা) আশ্চর্য হন আর আহততার বলেন, “কেন?”

“কেননা, খোদা নিজ কৃপায় আমাকে আলো দেখিয়েছে আর আপনি এখনও অজ্ঞাত।”

তিনি (বাবা)জানতেন, তিনি (মা) জয়যুক্ত হয়েছেন। তিনি(বাবা) চাকরের দিকে তাকিয়ে তাকে চলে যেতে বলেন, একই সাথে ব্যথিতলাই মন্তব্য করেন, “তিনি (মা) অবশ্যই জয়যুক্ত হবেন।”

সংকট কেটে যাওয়ায় সকলেই যত্ন ফিরে পায়। কিন্তু আমার পিতার তখনও বয়স্কের সিদ্ধান্ত নেয়া বাকী ছিল। আর আমার মা তাদের অধ্যাত্মিক পুনর্জীবনের জন্য দোকান অব্যহত রাখেন।

বার এসোসিয়েশনে তার এক সাথী ও জমাতের ব্যপারে আগ্রহ রাখতেন। আমার পিতা যিনি স্বয়ং তখন এগিয়ে যাওয়ার বিষয়ে অধ্যাত্মিক ছিলেন, তাকে

২১৯
হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন (রা.) - খলিফাতুল মসীহ আউয়াল

জিজ্ঞেস করলেন যে তিনি তার সাথে একত্র বয়স্কত করবেন কিনা। তার সহকর্মী বললেন, এখনও তার কেবল বিষয় সপ্ত হওয়া বাকী আছে। তারা মতোকে পৌছলেন যে মৌলভী নূরুদ্দীনের কাছে দিকনির্দেশনা চাইবেন, যিনি একাদ দেরের সাথে প্রত্যেক সদর্য্যায় প্রায় এক ঘণ্টা সময় দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। চারটি বেঠক হয়। এতে আমারও উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। এটি আমাকে মৌলভী নূরুদ্দীনকে কাছে থেকে দেখার সূচরে করি দিয়েছে আর তিনি হযরত আমাকে তার বন্ধ নাসরজ্জাল খানের ছেলে হিসেবে দেখেছেন। শেষ মিটিং থেকে ফিরে আসার পথে আমার আক্রমণ তার সহকর্মীকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রয়াসে পৌছেছেন কিনা। তিনি বললেন, তিনি যে প্রথম উঠিয়েছেন এর সব কটি সমাধান হয়েছে। আমার পিতা জিজ্ঞেস করলেন, ।

"তাহলে কি আমরা বয়স্কত করতে পারি?"

তিনি বললেন, "আপনি কি মনে করেন?"

"যদি আপনি প্রস্তাত হন তাহলে আমিও প্রস্তাত।"

"বেশ তো, আগামী কাল সকালে যখন আপনি নামারের জন্য আসবেন আমাকে সাথে নিয়ে যাবেন আমরা বয়স্কত করবো।"

পরদিন সকালে ফজরের নামারের জন্য আমি আমার পিতার সাথে গেলাম।

পথে আমার তার সহকর্মীকে সাথে আসার আহবান জানালাম কিন্তু তিনি মনে করলেন, বয়স্কতের পর এসব দায়িত্ব অপরিপূর্ণ হবে সে বেখা বহনের জন্য তিনি প্রস্তাত নন। সুতরাং আমার পিতা ফজরের নামারের পর এক ব্যক্তিগত বেঠকে হযরত মসীহ মাওজুদ (আঃ)-এর হাতে বয়স্কত করেন। আমিও উপস্থিত ছিলাম। আমার মারের বয়স্কতের কিছুদিন পর পিতার এভাবে বয়স্কত করাও আমার মারের একটি সময়ের পূর্ণতা ছিল। পরিবারে সুখে সমবোতা ফিরে আলে। ১০ বছর পর একটি খানিক এসেছিল আর সেটি একইভাবে কেটে যায়।

জামাতে অন্তর্বতু হবার পর আমার পিতা সেপ্টেম্বর, জেলা আলতার ছুটির দিনে, বেশির ভাগ সময় কাজিয়ানে অতিবাহিত করেন। তিনি রীতিমত ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে জামাতের বার্ষিক জলসারো যোগদান করতেন। এসব আনুষ্ঠানিক আমি তার সাথে থাকতাম। হযরত মসীহ মাওজুদ (আঃ) পূর্বে যখন ইটিতে যেতেন আর যুবক ও আসারের পর যখন মসজিদে মালাবারকে বসতেন তখন তার সাধারণ লাভের সূচয় হতো। বাকী সময় যখনই পেরেছি আমি হযরত মৌলভী নূরুদ্দীনের সাধারণে থাকার সকল সূচয় গ্রহণ করেছি। আমার

২২০
মনে আছে একসময়ে তিনি পূর্বে মৌলানা জালালুদ্দীন রোমীর মসন্দিবার দরস দিতেন।

১৯০৭ সনে মেহরাবি পাস করার পর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রীর লক্ষ্য নিয়ে আমি সে মাসে লাহোরের সরকারী কলেজে ভর্তি হই। তিন বছর শ্রীমতী যখন আমি সিয়ালকোটে নিজ বাড়িতে অবস্থান করছিলাম তখন আমার পিতা এ মমে হযরত মৌলভী নূরউদ্দীন কর্তৃক প্রেরিত একটি পোষ্কাকার পান, হযরত মসীহ মাওউদ (আহ)-এর হাতে আমার বয়স্তত্ব করা উচিত। আমার নিজের বিশ্বাস অনুসারে আমি ১৯০৩ সালের এপ্রিল মাসে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্য হওয়া যখন আমার লাহোরের হযরত মসীহ মাওউদ (আহ)-এর পবিত্র চেহারা দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল আর কয়েক সপ্তাহ পর আমার উপস্থিতিতে পিতা-মাতা সিয়ালকোটে যে বয়স্তত্ব করেছেন আমি নিজেকে এতে অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেছি। যাতে হযরত নূরউদ্দিন (রাখ)-এর পরমাণুনসারে ১৯০৭ সালের ১৬ই ডিসেম্বর আমি হযরত মসীহ মাওউদ (আহ)-এর হাতে কাদিয়ানে বয়স্তত্ব করি। আমি হযরত মৌলভী সাহেবের কাছে তাঁর এ দিকনির্দেশনার জন্য একাধারে কৃতজ্ঞ। কেননা ১৯০৮ সালের ২৬শে মাসে তারিখে হযরত মসীহ মাওউদ (আহ)-এর নিদর্শনের সাথে-সাথে তাঁর সম্মানীত সাহেবদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবার পর চূড়ান্তভাবে মন্তব্য হয়ে গেছে। হদয় বিদারী সে ঘটনা এবং চরম দুঃখের সে দিনে আমি লাহোরের ছিলাম আর পবিত্র নেতার পূর্ত মরদেহের সাথে কাদিয়ান গিয়েছি। সেখানে পরের দিন দুপুরে হযরত মৌলভী নূরউদ্দিন (রাখ) সম্মানিত খলীফা নির্বাচিত হন আর আমি সহ কাদিয়ানে উপনির্বাচিত সবাই তাঁর হাতে বয়স্তত্বের অগ্রগতি করেছি।

কলেজ জীবনের বাকী দিনগুলোতে আমি প্রায়শই কাদিয়ানে বেড়াতো। শ্রীমতীর ছুটির একটি অংশ সেখানে কাটাতাম আর রীতিমত জলসায় অংশ গ্রহণ করতাম। এভাবে হযরত খলীফাতুল মসীহুর সাথে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হবার সম্মান লাভ করলাম এবং তাঁর অনেক দৃষ্টি এবং অনুগ্রহের পাত্র হলাম।

১৯১১ সনের এপ্রিলে আমার স্নাতকত্বের ফাইনাল পরীক্ষা শেষে আমি সিয়ালকোটে নিজ বাড়িতে যাই আর কয়েক সপ্তাহ পিতা-মাতার সাথে অতিরিক্ত করে জুন মাসে কাদিয়ান আসি। হযরত খলীফাতুল মসীহু তখনও চলাচলের কারণে পারসবনে না। দরস, জামাতী কার্যক্রম পরিচলনা, রোগী দেখা এবং দর্শনার্থীদের সাথে সাক্ষাতের কাজে নিজ বৈঠকে দিন অতিরিক্ত করতেন।

২২১
হযরত মৌলভী নুরউদ্দীন (রা.) - খলিফাতুল মসীহ আউয়াল

তার দান কাপালের আঘাতপ্রাপ্ত স্থানটি হাম্মি ক্ষতে রূপ নেয়। এতে প্রত্যেক দিন পাটি পরিবর্তন করা হতো। তার বিদায় নেয়ার পর তিনি কিছুদিন বিছানায় শায়িত থাকতেন। তার একজন ছাত্র একাদশ কোমল হাতে তার বিভিন্ন অংশে মালিশ করতেন। তখনো তিনি প্রাতিহারিক নামায়ের জন্য মসজিদে যেতে পারতেন না। যে কারণে তার সুবিধার্থে তার বৈঠকে নামায হতো। তার আশ্রয় গ্রহণ ছাত্র শেখ মোহাম্মদ তৈমুর নামায পড়াতেন আর হযরত খলিফাতুল মসীহ বসে নামায পড়তেন। প্রথম চার বা পাঁচ জন ছাত্রের জামাত হতো। পার্থিবতা মসজিদ থেকে যখন আযানের ধরনি শোনা যেতো হযরত খলিফাতুল মসীহ অপর সকলকে মসজিদে গিয়ে নামাযে যোগ দেয়ার নির্দেশ দিতেন। আমার কাদিয়ান আসার পর প্রথমদিন যখন যুহরের আযান কানে এলো, সবাইকে নামাযের জন্য পাঠিয়ে দেয়া হলো। আমিও প্রশাসনের নিমিতে দাঁড়ালাম। হযরত খলিফাতুল মসীহ লেখ পরবশ হয়ে তখন বললেন: মিয়া তুমি এখানে আমাদের সাথে নামাযে যোগ দাও। সে মোতাবেক আমি যুহর ও আসারের নামায বৈঠকে পড়লাম।

ইমামের পিছনে নামায়ের দ্বারা একটি সারি হতো। হযরত খলিফাতুল মসীহ বাম পাঠে তার বিচ্ছিন্ন পাশে বসেন। আব্বা তার দান দিয়ে দাঁড়ালাম আর অন্যান্য নামায়িরা আমার দানে দাঁড়ালেন। তার অসুবিধার কথা ভেবে এবং শ্রদ্ধাবশত আমি তার গা এবং দাঁড়ানা পছন্দ করিনি। কিন্তু তিনি নিজ বাচ্চা আমার নলায় জড়িয়ে আমাকে কাছে দেনি নিলেন। একবার যুহরের নামায়ের জন্য শেখ তৈমুর না থাকায় হযরত খলিফাতুল মসীহ এদিক-সেদিক তাকিয়ে আমাকে বললেন, মিয়া তুমি কুটোন পড়ছে তাই নামায পড়াও। আমার জন্য নির্দেশ মানা হাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না।

একদিন ডাক্তার তার ব্যাডেজ পরিবর্তন করে ফিরে গেলে আমি একই কক্ষে ছিলাম। পা কিভাবে টিপতে হয় তা আমার ঠিক জানায় ছিল না। আমি ভাবিলাম, আমি কি কক্ষ থেকে নিরবে বেরিয়ে যাবো না-কি মহান যোগ্য শরীর মালিশ করার চেষ্টা করব! এতে হযরত কষ্ট বেড়েও যেতে পারে। তার কষ্টের কারণে তিনি বাম দিকে কাঁধ হয়ে থলে ছিলেন। নিরবে আমি তার আসনের পিছনে গিয়ে বসলাম এবং সালেহ কর্মমান হাতে তার শরীর টিপা আরম্ভ করলাম। প্রায় ৫ মিনিট পর তাকে বিশ্বাসের সুযোগ দিয়ে বেরিয়ে পড়ার উদ্দেশ্যে আমি থামলাম। এটি বুঝতে পেরে তিনি তার দান বাচ্চা উঠান আর কোমলভাবে তা আমার কাছে রাখেন এবং আমার মুখমণ্ডল তার মুখের কাছে বুঝিয়ে নিরবে

222
ব্যক্তিগত স্মৃতিচরণ

প্রায় দুঃ মিনিট আমাকে সে অবস্থায় ধরে রাখেন। আমাকে ছেড়ে দেয়ার পর বললেন, মিয়া তোমার জন্য আমি অনেক অনেক দোয়া করেছি। এটি সত্যিকার অর্থে একটি আশীর্বাদ ছিল। এর সৌভাগ্য প্রায় ৭০ বছর আমার সাথী হয়েছে।

আমি তখনো কাদিয়ানেই ছিলাম যখন আমার পিতা হয়রত খলিফাতুল মসীহুর কাছে উপস্থাপনের জন্য কয়েকটি বিষয় লিখে পাঠান। এর একটি ছিল আমার ইংল্যান্ডে উচ্চশিক্ষা অর্জনের অনুমতি প্রার্থনা। আমি লিখিতভাবে তার কাছে আবেদন জানালাম। আমার নিজের সম্পর্কে লিখিলাম, আল্লাহর রহমতে ডিগ্রী পরিক্ষা আমার এত ভাল হয়েছে যে আমি পাশ করার আশা রাখি আর যদি তিনি অনুমোদন ও অনুমতি দেন তাহলে আমার পিতার ইচ্ছা হলো আমি যেন উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিলাত যাই। হয়রত খলিফাতুল মসীহু আমাকে এবং আমার পিতাকে সুন্নত মোতাবেক ইস্তিকারার মাধ্যমে দিকনির্দেশনা চাওয়ার প্রয় দিলেন। দোয়ার ফালফলবর্দ্ধন যদি আমরা উভয়ই নিশ্চিত হই তাহলে আমার পিতার বাসনানুসারে আমি যেতে পারি। আমি আমার পিতাকে তাঁর নিদেশ সম্পর্কে অবহিত করি আর এক সত্য ঐশী দিকনির্দেশনার জন্য দোয়া করি। শেষের দিকে আমি আমার পিতার ইচ্ছার অনুকূলে পরিক্ষার ইতিপাতক পেয়েছি যদিও ব্যক্তিগতভাবে আমি বাইরে যাবার বিষয়ে ততটা উৎসাহী ছিলাম না।

পরীক্ষার ফলাফল ঘোষিত হয়েছে। এক বছর আমাকে লাহের থেকে লিখেছেন, আমি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছি। আমি পাটুল হয়রত খলিফাতুল মসীহুর কাছে উপস্থাপন করলে তিনি এত অনন্দিত হন যে সেদিন সিকার যে-ই এসেছে তিনি তাকে বললে: “আমি আজকে অত্যন্ত অনন্দিত। আমার দিকে ইংরেজি করে তিনি বললেন, সে বিএ. পাশ করেছে। আশীর্ভাবের বিষয় হলো সে জানতো যে সে পাশ করবে।”

পরে দেখা গেল, আমি আরো অনার্স প্রথম স্তর অধিকার করেছি। যদি আরো তামাকে আমার এমএ করার ইচ্ছা থাকতো তাহলে আমি ভাল অংকের বৃতি পেতাম। সেটি আমার কাছে আকর্ষণীয় মনে হচ্ছিল। কিন্তু আমার পিতার ইচ্ছা সবচেয়ে অধ্যুত্ত ছিল।

আমার পর হয়রত খলিফাতুল মসীহু তাঁর সাদামাটা বাসনানের খোলা উঠানে বের হতেন যা বিন্দুর সে সময় তাপ কমার করারে অনেকটা আরামদায়ক

২২৩
হয়রত মৌলিকী নূরউদ্দীন (রা.) - খলিফাতুল মসীহ আউয়াল

হয়ে যেতো। সেখানেও আমি তাঁর সাথে ছিলাম। একদিন তিনি বললেন: “এটি খেলাধূলার সময় তোমার কি কোন ব্যাপার করার ইচ্ছা নেই?”

“আমি সম্রাট নিবেদন করলাম, হয়োর, যেখানে আছি সেখানে আমি যারপরনাই আনন্দিত।”

লভন যাবার প্রস্তুতির লক্ষ্যে বাড়ি যাবার জন্য অচিরেই আমাকে অনুমতি নিতে হলো। আমার মা দীর্ঘ বিচিত্রতার অশ্লীল ছিলেন আর আমিও বিশাল অজানা খণ্ডে বাক দেয়ার চিন্তায় সংকুচিত হচ্ছিলাম। এমন অবস্থায় সফর করতে যাচ্ছি যার সমস্তে আমার জানা খুব সামান্যই আর যা জানতাম তাও শুধু শোনা কথা। এমন লোকদের মধ্যে যাচ্ছি যাদের বিশ্বাস, সংস্কৃতি, জীবনযাপন প্রস্তুতি সম্পূর্ণভাবে অজানা। সুতরাং প্রস্তুতির মধ্যে কোন উন্নতজনা ছিল না বরং আমার যথেষ্ট শক্তি ও অস্ত্র ছিল।

বেধে থেকে ট্রেনের পর্যায়ে আমার সফরের ব্যবস্থা হয় একটি বামপ্রায় অস্ত্রিয়ান জাহাজে। ১৯১১ সনের পহেলা সেপ্টেম্বর এর যাত্রা করার কথা ছিল। আমার পিতা-মাতা, মা এবং একজন পারিবারিক কর্মচারীর সহ আমরা সিয়ালকোট থেকে ট্রেনখাতে বাটালার উদ্দেশ্যে ২৮শে আগস্ট সকালে রওয়ানা হী আর বিকেলে কাদিয়ান পৌছি। পরের দিন আমি হযরত খলিফাতুল মসীহর কাছ থেকে বিদায় নেই। তিনি আমাকে থেকে দোয়া ও দোয়া সৌখিনতা বিদায় জানালেন। তিনি কিছু দিকনির্দেশনা ও দোয়া লেখালেন। আমি এগৌলো নিয়েছি। আর সৌভাগ্যের দিকে আমাকে উপদেশ দিলেন। তিনি আমাকে বললেন, “আমাকে রীতিমন্ত চিঠি লিখবে।” হযরত উদ্ধুল মিনিনীর সাথে পুনরায় দেখা হওয়ায় আমার ‘মা’ বেশ স্থায়ী বোধ করছিলেন। একই দিন বিকেলে ট্রেনখাতে আমাদের কাজের কাজের কাদিয়ান থেকে অমৃতসরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয় যেখানে পৌছে যা, মা, মা এবং কর্মচারী সিয়ালকোটের ট্রেন ধরেন আর আমার পিতা ও আমি নেই ট্রেন যোগে সহস্রাধিক দূরে অবস্থিত বোধের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হী। ইতোমধ্যে আমি অমৃতসরের বাইরে কোথাও যায় নি। এছাড়া সবকিছু আমার জন্য ছিল নতুন। আমারা ৩১শে আগস্ট বেঁধে পৌছি এবং পরের দিন দুপুরে ৪০০০ টনি এস, এস কোরের জাহাজে প্রবেশ করি। জাহাজের সিডির গোড়া আমার পিতা বিদায়ের চিহ্নিতনগ্র আমার সাথে করণমূদ করেন।

প্রথমত সালাম ছাড়া উভয় পক্ষে আর একটি কথাও হলো না।

২২৪
ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ

জাহাজটি থেকে রওনাহওয়ার এক ঘন্টার মধ্যে আমার সমুদ্রপীর দেখা দেয়। এটি এমন একটি লক্ষণ যে সম্পর্কে আমি পূর্বে কিছুই জিনিস না আমার কিছুই জানা ছিল না। মৌসুমী বায়ু পুরোদমে প্রবাহিত হচ্ছিল। এরপর তীব্র, অপরিবর্তিত ও হতভম্ব করে দেয়ার মত ভোগাতিতে চারটি দিন কাটে। মৌসুমী অঞ্চল থেকে বেরিয়ে আসার সাথে সাথেই সফরের প্রতিটি মুহুর্ত আনন্দদায়ক প্রমাণিত হয়। চার দিন অনাহারের পর আমার চরম ক্ষুধা পায় আর জাহাজে পরিবেশিত সুখদূর খাবারের প্রতিটি কথা আমি উপভোগ করি। ১৪ই সেপ্টেম্বর দুপুরে আমারা যুড়ে ছুটি পেলাম। একেবারে ট্রেনমধ্যে উঠের সময়ে বাই এবং রাতের অতিক্রম করে ১৬ই সেপ্টেম্বর সকালে লন্ডনে পৌঁছি।

লন্ডন তখন সারা পৃথিবীর রাজধানী ছিল। তথাকথিত প্রীতিপ্রদ চতুর্থ দিনটির কথা বাদ দিলে জীবন ছিল সুখকর, আরামদায়ক ও সুখদূর। বড়কেট অতিথি হিসেবে এমন লোকদের মাঝে আমার আরামদায়ক বাসস্থানের ব্যবস্থা হয় যারা ছিল একাংশ বন্ধুভাজন এবং আমার প্রতি সবধা সদয় ও মনোহর। আমি আইন শাস্ত্রী অধ্যায়ের এলেগে গেলাম। পিতা-মাতার শূন্যটা ছাড়া অনলমায়ের মধ্যেই মনে হলো, আমি নিজ বাড়িতেই আছি। প্রত্যক সময়ে বাড়িতে চিনি লিখাভাষা এবং প্রত্যক সংখ্যা তাদের উত্তর পেতাম। আমি খুলো-ফাতল মনোরঞ্জনকও রীতিমত লিখাভাষা তিনি বহুতুল্যে সর্বোত্তম উত্তর লিখে আমাকে ধন্য করতেন। যদি আমার কাছে আনন্দদায়কমনে হতে আমি তাকে তা একাংশ আনন্দিত তার সেখানে লিখাভাষায় আমার লিখিত বিষয় সম্পর্কে তিনি উত্তর দিতেন ওজন আর প্রকাশ করতেন। অন্য সময়ের মধ্যে আমি ব্রহ্মানুষ আমাকে উপরে গোদিত আত্ম প্রকাশ করতেন। তার পরে তিনি আমাকে চেনে সাথে সহানুভূতি জানাতেন। অনেক সময় তিনি আমাকে দোয়ার সাথে সহানুভূতি করতেন; যেমন, "বাস্তবিক অর্থেই জাফরউল্লাহ হও" (অর্থাৎ আলীহার কৃপায় সত্যিকার অর্থে তুমি বিজ্ঞাপন হও) বা সত্যিকার অর্থে তুমি সত্যিকার পথ প্রদর্শিত হও এবং সৌভাগ্যবান হও।" তিনি আমাকে ১৯১৩ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর যে পত্র লিখেছেন তা ছাপা হয়েছে। দৃষ্টান্তের পাঠকদের জন্য আমি এর অনুবাদ নিম্নে পেশ করি:

আলীহার নামে যিনি অমৃতচক্ষু দানকারী এবং একাংশ দানালু।

নাবুধাদু: ওয়া নুসাইলি ব্রাদিরুল্লিহ করীম ওয়া আলা আরবিহিল মাসীহিল মাওদার।

২২৫
হয়রত মৌলিকী নুরউদ্দীন (রা.) - খলিফাতুল মসীহ আওয়াল

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহিও ওয়া বারাকাতুল্লাহ।

শেখ মোহাম্মদ আকবর সাহেবের প্রতি আমার একাত্ত স্নেহপূর্ণ সালাম রইল। তোমার উপর শান্তি বর্ধিত হোক। এটি কল্যাণময় একটি প্রতিদিন-সময়ক্ষেত্রের বিষয়, তোমার মুলমানরা একে অবহেলা করে।

ধর্মীয় হোক বা নিরপেক্ষ, প্রতিটি সফরেরই একটি উদ্দেশ্য থাকা চাই নতুন তা বুঝা।

পিটারসবার্গের মসজিদটি কল্যাণের কারণ হোক। ফিনল্যান্ড'এ নামায ও রোমার সময় ঘটিয়া হিসেবে হবে। আলাহ বলেন: আমরা চাই তাদের জন্য গন্ধে নির্ধারণ করেছি (৩৬,৪০)। এমন অধ্যক্ষের লোকদের জন্য এটিই হলো দিকনির্দেশনা।

হে সেহভাজন! মরণ রেখা, চার্ট আফ ইংল্যান্ডের রেজেট হলো দু' কোটি চল্লিশ লক্ষ পাউন্ড। যদি তারা শৃংখল বিশ্বাস না করে তাহলে এত তাকে কেন পানির মত নষ্ট করে?

গত দুবছরে বলকান রাজ্য, ইতালি এবং ফ্রান্স, ইসলামের বিরোধিতায় তুকি, ট্রিপলি ও মেরোকোতে কেন এত রক্তপাত ঘটিয়েছে?

একজন বিবেকবানকে আকৃষ্ট করতে পারে এমন কোন যুক্তি বিত্তবাধকে সমর্থন করে না। মসীহ মাওলুদ (আঃ) -এর সাথেই এ ধর্মের পতন সম্পর্কিত।

এ ধর্মের অনুসারীরা অন্যতম ধর্মের অনুসারীর অন্তর্গত হয়নি। কিন্তু তারা প্রকাশে ইসলাম গ্রহণে উদাসীন।

খোদার একসময় প্রচারের প্রতি তোমার মনের যৌগিক হওয়া উচিত। পাক্ষিক ও ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে আলাহু ও তাই রসূলের নাম প্রচার করা যথেষ্ট হবে।

নামাযে অবহেলা প্রদর্শন করবে না। কুরআন ফাতাহির পোড়ে আর সবসময় দোয়া করবে।

তোমার জামান বন্ধুর কি অবস্থা? সে এখন কোন আছে তা তুমি লেখনি।

আমি জানতে চাই।

ওয়াসুসলাম

নুরউদ্দীন

আহমদীয়া জামাতের একজন সুপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন খাজা কামালউদ্দীন।

পেশাগতভাবে তিনি ছিলেন একজন আইনবিদ। পেশাওয়ারে কিছুদিন আইন ব্যবসার পর তিনি লাহোরে স্থানান্তরিত হন।

২২৬
ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ

তিনি বলেন, একসময় তিনি উষ্ণ ধর্মের প্রতি গতিরভাবে আকৃষ্ট ছিলেন।
কিন্তু তার পরম মৌলাগী যে হযরত মসীহ মাওজ্জ (আঃ)-এর সাথে তার যোগাযোগ হয়। তার প্রভাবে ইসলামের প্রতি তার সুদৃশ বিশ্বাস জন্মে এবং তিনি একজন নির্দোষ মুসলমান হয়ে যান। হযরত মসীহ মাওজ্জ (আঃ) তাঁর জীবনের অষ্টম জাত্রায় যখন লাহোরের ‘আহমদীয়া বিক্ষিপ্ত’এ অবস্থান করছিলেন,
খাজা কামাল উদ্দিন স্নপ্ত দেখেন যে তাকে এবং মৌলভী মোহাম্মদ আলীকে
পূর্ণ প্রেরণ করেছে আর তাদের সাথে আরা তিন চারজন আহমদী
রয়েছে। তাদেরকে বল হলো, তারা বিদ্যালয়ের দায়ে দেওয়া, তাই তাদেরকে
সরাসরি প্রাপ্তির সাধনে হাজির করা হবে। তাদেরকে একটি বড় হলের দিকে নিয়ে
যাওয়া হয়। এর একটিতে একটি উঁচু জায়গায় চন্দ্রভূমি
স্মৃতিস্তম্ভ সংগঠিত সিংহাসনে
মৌলভী নুরউদ্দিন উপবিত্র অন্তর্ভুক্ত। তিনি তাদেরকে এভাবে সমাহরণ করেন:
“তোমরা আমার বিদ্বেষ বিদ্রোহ করেছ, তোমাদের সাথে এখন কি ব্যবহার
করতে পারি?” খাজা কামালউদ্দিন উদ্দিন দেন: “আপনি এখন বাদশা, আপনি
যেভাবে ইচ্ছা আমাদের সাথে ব্যবহার করতে পারেন।” তখন মৌলভী নুরউদ্দিন
বললেন, “আমি তোমাদেরকে দেশান্তরিত করছি।”

খাজা কামালউদ্দিন এ স্প্ল্যান হযরত মসীহ মাওজ্জ (আঃ)-কে শুনলে তিনি
এ বলে এড়িয়ে যান যে স্প্ল্যান তার জন্য কোন অণশু সংবাদ নেই। এরপর তিনি
নিজ স্প্ল্যান মৌলভী নুরউদ্দিনকে শুনান, যিনি ক্ষণকাল নীরবতার পর তাকে
বললেন, এ স্প্ল্যান অন্য কোনো সন্তানের ফাক। কয়েকদিন পর হযরত মসীহ মাওজ্জ
(আঃ) ইন্টারক্লাস করেন এবং খাজা কামালউদ্দিন হযরত মৌলভী নুরউদ্দিনের
কাছে যান আর বলেন, আমার স্প্ল্যান পূর্ণ হবার সময় এসে গেছে। আমি আপনার
হাতে বায়ানের জন্য অশ্রুত। জামাতের প্রতিরোধে যতক্ষণ কাদিয়ানে একক
স্প্ল্যান পরিমাণ না করেন ততক্ষণ তাকে চুপ ধারতে বলা হয়। হযরত খলিফাতুল
মসীহকে খলিফা ঘোষণা এবং তার মহান দায়িত্ব পালন আরত করার কিছুকাল
পর খাজা কামালউদ্দিন একই স্প্ল্যান কিছুটা ভিন্নভাবে পুনরায় দেখেন। এবার
হযরত খলিফাতুল মসীহ, খলিফা হিসেবে নিম্নলিখিত কাব্য প্রদান করেন, “তুমি
দ্বিতীয়বার বিদ্রোহ করেছ, আমি নিদৃশ্য জারী করছি যেন তোমার শিক্ষিত করা
হয়।” স্প্ল্যান খাজা সাহেবকে শিক্ষিতদের জন্য নির্দেশ ঘটান নিয়ে যাওয়া হয়
আর যখন ডাক্তার কুঠার তার যাত্রা আমার হাতে তিনি ভয়ে জেগে উঠেন।
হয়রত মৌলিকী নূরউদ্দিন (রা.) - খলিফাতুল মসীহ আউরাল

১৯১২ সনে খাজা কামালউদ্দীনের স্ত্রী মারা যান। তিনি দুর্বল মুহম্মদ
ছিলেন। তার চিঠি-ভাবনা ক্রমে ধর্মমুকুতি হতে থাকে। তিনি ইসলাম সম্পর্কে
বদ্ধ করার জন্য সমগ্র উপমহাদেশে ব্যাপক সফর অরাহত করেন। যখন তিনি
বেদে গোপুর তখন হায়দ্রাবাদ দাক্ষিণাত্যের একজন সম্প্রদায় ধনবান ব্যক্তি যিনি
আহমদীয়ের প্রতি আকর্ষণ রাখতেন তাকে তার পক্ষে একালে পারিবারিক
একটি গোপন উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ড যাওয়ার অনুরোধ জানান। তাকে অনেক বড়
অংশ দেয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়। যেহেতু বিষয়টি আপাত-আইন সংক্রান্ত ছিল এবং
তেমন কোন জটিলতা ছিল না তাই তাকে আর বেশি বৃদ্ধানোর প্রয়োজন হয় নি।
১৯১২ সনের শেষের দিকে তিনি ইংল্যান্ডে আসেন। কাজ শেষে তিনি ইংল্যান্ডে
স্থায়ীভাবে বসবাসের প্রস্তাব দেন আর নিজেকে ইসলামের সেবায় নিয়োজিত
করেন। তখন ইংল্যান্ডে শুধু তিনজন আহমদী ছিলেন। একজন নিউক্যাসেলে
চিকিৎসা শাস্ত্র পড়েছিলেন, দোট ইবাদুল্লাহ লডনে ডেন্টাল সাজারিতে উচ্চ
প্রশিক্ষণ কোর্স করছিলেন আর আমি আইন শাস্ত্র পড়েছিলাম। খাজা সাহেবের
আসার পর দোট ইবাদুল্লাহ তার সাথে ভক্ততার লক্ষে নিজেকে যথেষ্ট অসুবিধা ও
কষ্ট ঠেলে দিয়ে নিজ বসবাসে তার থাকায় ব্যবস্থা করেন। খাজা সাহেব নিজে
সাদামাটা জীবন-যাপনে দূর্বলক্ষ ছিলেন আর ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দের প্রতি খুব
একটি ফ্রেক্স করতেন না। আমি যে ঘরে থাকতাম সমস্ত সেখানে একটি
আরামদায়ক কক্ষ ছালি হলে তিনি আমাদের কাছে চলে আসেন। এ সুবাদে যখন
তিনি আমাদের সাথে ছিলেন তখন পরিস্থিতির সাথে আমাদের গতির সম্প্রসারণ
ছিল এবং আমি তাকে খুব ভালভাবে জানার সুযোগ পেয়েছি। তখন তিনি একটি
মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করার কথা চিঠি করেন। এর নামকরণ করেন ‘মূসলিম
ইভিয়া এবং ইসলামিক রিভিউ।’ কিন্তু পরবর্তীতে এর নাম থেকে মূসলিম ইভিয়া
বাদ দিয়ে শুধু ‘ইসলামিক রিভিউ’ রাখা হয়। আমারা সাধারণত ইসলাম ও
আহমদীয় সম্পর্কে আলোচনা করতাম যা খাজা সাহেব আরাহত করতেন।
এভাবে এমন অনেক বিষয় আমার জন্ম অর্জন হয় নতুনো যে সম্পর্কে আমি অত্য
থেকে থেকা মানতো।

দৃষ্টান্তগুলি একার তিনি বলেন, “মৌলিকী (তিনি প্রত্য সময় হয়রত
খলিফাতুল মসীহকে আপনজন হিসেবে ভালবাসবার মৌলিক ডাকতেন) মৃত্যুর
পর তার স্নাতকিতি নির্বাচন নিয়ে অবশ্যই গভীর হবে। দৃষ্টান্তগুলি
মাহমুদকে (অর্থাৎ সাহেবদাদি মির্জা শিয়ার উদ্দীন মাহমুদ আহমদ) দেখ, সে
একজন তরুণ মান। মোহাম্মদ আলী রয়েছে, সে অতি বেশি স্পর্শস্তর। সব

২২৮
ব্যক্তিগত সূত্রচারণ

ছোটখাট বিষয় নিয়ে কানাকাট্টি আরম্ভ করে। আমার ব্যর্থতা হলো, আমি সত্য
বলতে প্রচেষ্টা সময় অসময়ের বাঁচিয়ে করতে জানি না।"

দুর্ভাগ্যবশত তার সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা হলো, অনেক সময় আমি
চাইতাম তিনি যেন এ ধরনের বদ অভ্যাসের প্রমাণ দেন। কিন্তু আমার মনে হয়
তার সত্যের দর্শন হয়ত আমার হতে ভিন্ন ছিল। বিলাসে চিঘাই তার দুখিত সম্পর্কে আমি তাকে সম্প্রক্ষণ করলাম যে তার উৎক্ষণ যুগপৎ অসমান বিচিত্র এবং
অব্যাহত হয়। হয়রান হলীফাতুল মসীহু বারবার বলেছেন, যখন সময় আমার
ব্যাপার অন্যান্য তাত স্থায়ী সিদ্ধান্ত করে এবং তার হলীফ নিয়ুক্ত করবেন এবং তার হলীফা নিয়ুক্ত করবেন।

খাঁজা সাহেব একবার একটি দৃশ্য দেখে চরমভাবে উৎক্ষণ ছিলেন। এটা
তাকে সে স্বপ্নের কথা সম্প্রক্ষণ করার যাতে তিনি দেখেছিলেন যে তার শিরোধে
করা হচ্ছে। তিনি এতটা উপরাংশ ছিলেন যে কারণ না জানানা হেতু আমার ঘুরি ছিলা
হলো। কিছুদিন পর নিজ আবেগের উপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেলে তিনি আমার
কাছে তার সম্প্রতি বর্তমান করেন।

প্রলিঙ্গ প্রাচ বিশারদ দ্বারা হেনরিউ লেস্টার উদ্বন্ধ শতাধিক প্রথম দিকে
লাহের ওরিয়েন্টাল কলেজের প্রথিমাল ছিলেন। অবসরের সময় যন্ত্র এলে
তিনি লন্ডন বা এর আশ-পাশে একটি ওরিয়েন্টাল ইন্সটিটিউট গড়ার পরিকল্পনা
গ্রহণ করেন। তহবিল সংগ্রহের জন্য ভারতের বিভিন্ন মুসলমান রাজ্যের
শাসকদের শরণার্থ হল। তার দাতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মুসলমানের
মহামতি বেগম এবং হায়দ্রাবাদের প্রধান মুরার সালার জং। তিনি ইংল্যান্ড
ফিরে এসে নিজ প্রজেক্টের জন্য ওকিং এর অংশ সারেতে বড় একটি বুখার খাও
করেন এবং সেখানে ওরিয়েন্টাল প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন। একইসাথে একটি ছোট
মসজিদ এবং আবাসিক ভবন নির্মাণ করেন। মূলালের বেগমের নামে মসজিদের
নাম রাখা হয় 'শাহুজাহান মসজিদ' আর আবাসিক অংশের নামকরণ করা হয়
'স্যার সালার জং মেমোরিয়াল হাউজ'। ওকিং, লন্ডন থেকে ২৪ মাইল দূরে
অবস্থিত। মেহেরু ওকিং বা এর আশ-পাশে কোন মুসলমান নাগরিক ছিল না
তাই মসজিদের কোন নামায় হতে না বরং এটা এক অর্থে যাদুঘরের কাজ দিত
বা পর্যটকদের জন্য ছিল একটি রহস্যজনক স্থাপত্যকর্ম।

ডাঃ লেস্টারের মৃত্যুর পর পুরো জায়গাটি মালিকানায় তার পরিবারের
সদস্যদের নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। কৌলকাতা হাউকেটের জন্ম ডাঃ আমির আলী
একজন জনহিতকর মেনোদৃষ্টির অধিকারী মুসলমান এবং একজন সুপ্রভিত

২২৯
হযরত মৌলভী নূরউদ্দীন (রা.) - খলিফাতুল মসীহ আউরাল

ব্যক্তিত্ব। তিনি তার 'ইসলামের প্রেরণা এবং সারাসিয়ানদের ইতিহাস' সংক্রান্ত কর্মের জন্য প্রসিদ্ধ। তাকে প্রমাণ একই সময় মহামায়া গভর্নরের প্রিয় কাউসিলের সদস্য নিযুক্ত করা হয় এবং তিনি লভনে বসবাস আরম্ভ করেন। তখন লভনে আর একজন প্রসিদ্ধ মসুলমান ছিলেন মির্জা আলী বেগ। তিনি ছিলেন ভারতীয় রাজ্যবর্ণ সচিবের পরামর্শ সভার সদস্য। এ দুজন পরামর্শ করে ডি লেটনারের পরিবারের সদস্যদের নিকট প্রস্তাব রাখেন, যেহেতু এ প্রতিষ্ঠান এবং 'শাহজাহান মসজিদ' ও স্যার সালার জন্য মেমোরিয়ালসহ এতে যা কিছু আছে সবিন্দু মসুলমানদের দেয়া তহবিলে নির্মিত আর সেগুলো যেহেতু ট্রাইটের সম্পত্তি, তাই পাবলিক ট্রাইট হিসেবে এর পরিচালনা মসুলমানদের পক্ষে মসুলমান কর্তৃক হওয়া উচিত।

লিটনার পরিবারের কাছে তা প্রতীক ছিল না। তারা পুরো ট্রাইটকে তাদের নিজস্ব সম্পত্তি মনে করতো। তখন বিষয়টি আইনজদের হাতে দেওয়া হয়। দীর্ঘ দক্ষিণাখিদর পর সিদ্ধান্ত হয় যে মসজিদ ও মেমোরিয়াল হয় এবং পার্ব্বর্তী এলাকা মসুলমানদের হাতে তুলে দেয়া হবে আর লেটনার পরিবার প্রতিষ্ঠানটি ও এর সাথে সমর্থিত বিশাল ভূখনি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে। খাজা কামাল উদ্দীন এ পর্যায়ে আমীর আলী সাহেবের কাছে গিয়ে প্রস্তাব দেন খাজা হাউজাতের মসজিদ ও মেমোরিয়াল হাউজের ব্যবস্থাপনার ভার যদি তার হাতে ন্যস্ত করা হয় তাহলে তিনি তার আবাস সেখানে নিয়ে আসবেন আর মসজিদের রীতিমত নামাজের ব্যবস্থা করবেন। মির্জা আবাস বেগ ও অন্যান্য মসুলমানদের সাথে সাইয়েদ আমীর আলী আলোচনা করেন, ফলে খাজা কামাল উদ্দীনের প্রস্তাব গুঁতীল হয়। ওকিং মসজিদ ট্রাইট গঠিত হয় আর খাজা সাহেব সেখানে স্থানান্তরিত হন এবং মসজিদের ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ নিজ হাতে তুলে নেন। কিন্তু জুমুলর নামাজ আদায় হতে 'নটিউইল গেটগা' একটি ভাড়া করা হলে। এর ইমামতি করতেন খাজা কামাল উদ্দীন। তিনি নামাজ পড়নোর জন্য ওকিং থেকে সেখানে যেতেন।

মসজিদের ব্যবস্থাপনা ও ইসলামিক রিভিউ প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজ এক সত্ত্বেও জনকভাবে সমধা করা খাজা সাহেবের পক্ষে দুরাশ হয়ে উঠে। তাই তিনি হযরত খলিফাতুল মসীহর নিকট সাহায্য চেয়ে পাঠান। তিনি ১৯১৩ সালের প্রেমে তার সাহায্যের জন্য একাড নিবেদিত প্রাপ্ত একজন যুবক চৌহারী ফতেহ মোহাম্মদ সিয়াল এমএ. কে প্রেরণ করেন। খাজা সাহেব তার লাহের জীবনের

২৩০
ব্যক্তিগত মুহূর্ত, একজন ধারিক ও প্রবীণ বুদ্ধি শেখ নুর আহমদকেও ব্যক্তিগত স্বাছন্দ্যের বিধানক্লেশ সাথে আমার ব্যবস্থা করেন ।

ইংল্যান্ডে আমার দিন ভালোই কাটছিল। হযরত খলিফাতুল মসীহ আমাকে যে সকল দেয়াল করার নির্দেশ দিয়েছেন এর একটি হলো, ‘হে বেশির, আমাকে একজন পুণ্যবান সংগী দাও’। লত্তেন আমার অট সমাজের মর্যাদাই সে দোয়া গৃহীত হয়। দৈবতর্কে প্রায় আমার সম্বদ্ধক্ষে একজন জার্মান ছাত্রের সাথে সাক্ষাৎ হয়। সে এখানে ইংলিনারিং পাড়ে আসে এবং কিংবা কলেজে ভর্তি হয় আর আমিও সেখানে আইন পড়ার উদ্দেশ্যে ভর্তি হই সে পোমেরানিয়ান আর্টের সাথে সম্পর্কমুক্ত একটি পরিবারের সদস্য ছিল তার পিতা ছিলেন একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং হাউসগুলি করিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর শিল্পকর্মের সংগ্রহ ব্যাপক স্বার্থ ছিল। তার মা ছিলেন ফারসী। অন্য সময়ের মধ্যেই আমরা একে অনেক ভাল বড় হয়ে যাই। সে আমার একজন আপন ভাই প্রামাণ্য হয়। সেই জার্মান বড়ু যার কথা হযরত খলিফাতুল মসীহুর ১৯১৩ সালের ১৬ সেপ্টেম্বরের পরে উপেক্ষা করে। যতদিন সে জীবিত ছিল আমাদের বড়ু ছাড়ি ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সে জার্মানদের পক্ষে যুদ্ধ করে এবং দুর্বল আহত হয়। সে আয়রন শসা পদক লাভ করে। তাকে 'এহেসাসালান' নাইট উপাধি দেয়া হয় যুদ্ধের পর আমরা যোগাযোগ পুনঃস্থাপন করি। তার সবকিছু হারিয়ে যায় কিন্তু সে বীরত্বের সাথে জীবন সংগ্রাম অব্যাহত রাখে। সে ১৯২৪ সালে ইংল্যান্ড স্থানান্তরিত হয় আর হঘাড়াবাং লত্তেন বসবাস অর্জন করে। আমরা লড়াই প্রায়ই সংকট করতাম। সে কর্মকর্ম ভারতেও আমাদের কাছে এসেছে।

ছাত্রলীলায় ইংল্যান্ড অবস্থানকালে হযরত খলিফাতুল মসীহুর পত্র আমার জন্য বড় প্রশংসিত ও ইমামী প্রেরণকে সমস্যার রাখার কারণ হতো। আমি প্রায় সময় আক্ষরিকভাবে আমার জন্য তার দোয়ার কার্যকারিতা অনুভব করতাম। ১৯১৪ সালের মার্চ এর প্রথমদিকে আমি ইটারর ছুটিতে তার কাছ থেকে উপমহাদেশ যাত্রার অনুমতি নিলাম। যাতার পূর্বেই ওয়াজ কামাল উদ্দিনের মাধ্যমে তার ইন্টারকলের বেদনায়ককর সংবাদ পেলাম। আমি যখন তার কাছে সুনিশ্চিত ধরণে থাকা চাইলাম তিনি বললেন, "পরিহিত মুখেই মোলালের। আমি খুব একটা জানি না। আমি তিনি সংক্ষিপ্তে টেলিগ্রামে পেয়েছি। প্রথমদিকে মোলালে সাহেবের মৃত্যুর সংবাদ দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয়টিতে মিয়া মাহমুদকে

২৩১
হযরত মৌলিকী নৌরউজীন (রা.) - খলীফাতুল মসীহু আউয়াল

খলীফা হিসেবে ঘোষণা করার কথা বলা হয়েছে। আর তৃতীয়টির ভাষ্য হলো, কিছু লোক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তারা কিন্তু অবস্থান করেছে তাদেরকে বিশ্বাসযোগ্য আখ্যা দেয়া হয়েছে। আমি জানি না এ পরিস্থিতিতে কি করব?"

সেকালে পাঙ্গাবের চিঠিপত্র লিখে ১৭ দিন পর বিলি করা হতো। আমি পত্তিকের চিঠিতে থিয়াল। অনেক অশুদ্ধ ছিল আমার কিন্তু কিছু করার ছিল না। উদ্ধে উৎকল্প সাথে দোয়া ভরা হুর্য নিয়ে ছুটি কাঠামো চলে গেলাম।

তিন সপ্তাহ পর ফিরে এসে দেখি একক চিঠি আমার অপেক্ষায় আছে। আমার মায়ের পত্র বলা হয়েছে, জামাতের উপর অনেক বড় বিপদ নেমে এসেছে।

একটি বাৎসরিক ভাষণ দেখা দিয়েছে। হযরত সাহেবাদা মিয়া বাবুর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাব্বি ও সত্য খলীফা। তিনি তাঁর হাতে বর্ণনা করেছেন আর আমার বাৎসরিকভাবে তা করা উচিত। আমার পিতা বলেন, এটি প্রত্যেকের নিজ বিবেকের ব্যাপার। তিনি আমাকে কোন নির্দেশ দেবেন না। যথাযথ চিঠা-ভাবনা ও হেদায়াতের জন্য দোয়া করার পর আমাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

পত্রের চূড়া অন্য দিজিডি পাঠের পর আমি নিশ্চিত হলাম, মূল মতপার্থক্যের বিষয়টি হলো। জামাতের মধ্যে কোন কর্তৃক হস্পদ আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব প্রদান করেছে কি নেই? আমার চিঁদা-ভাবনা এ বিষয়ে অস্বাভাবিক বছর ছিল আর আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। সেদিন দুপুরেই ডাক যাবার কথা ছিল। আমি বললী নিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহু সানিকে (রাছ) বয়াতের অঙ্কিতাবরের কথা জানালাম এবং তা অবহিত করে বাড়িতে আমার পিতামাতাকেও পত্র লিখি।

২৩২
অষ্টম দৃশ্য

১৯১৪ সনের জানুয়ারীর প্রারম্ভে হয়ত খলীফাতুল মসীহুর সাহেবের ক্রম অবনতি ঘটতে থাকে। তিনি পাঁজরে ব্যাপ্ত অনুভব করেন। কখনো কখনো হাস্য জুর হতো সাথে বমি বমি ভাবও ছিল। তার জীবনিনিয়ক ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। কিন্তু তিনি হাসিমুখী ছিলেন আর পবিত্র কুরআনের দরস দেয়া অব্যাহত রাখেন। যখন মসজিদে আকাশের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে তার অসুবিধা হতো তখন তিনি মাদ্রাসা আহমদীয়ার প্রাঙ্গনে কুরআনের দরস দিতেন। তার কাছে দুর্লভতা বেড়ে যায় ফলে দরসের ব্যবস্থা তার বড় ছেলের ঘরের একটি কক্ষ স্থানান্তরিত হয়। এটা তার নিজ ঘরের পাশেই ছিল। তিনি বসে দরস দিতেন।

দাতারের পরামর্শ ছিল যে দরস বন্ধ করে দেয়া উচিত। কিন্তু তিনি এককাল উপরে জোর দেন, যতক্ষণ তিনি কথা বলতে সক্ষম ততক্ষণ আল্লাহুর কথার ব্যাখ্যা অব্যাহত রাখা আবশ্যক।

ফেরদুসীরের প্রথম দিকে সন্ধে করা হয়, তিনি ফুসফুসের মখানায় আক্রান্ত।

দাতার মির্জা ইয়াকুব রেগ সাহেব লাহের থেকে আসেন এবং ডাতার খলীফা রশিদ উদ্দীন সাহেবসহ তিনি নিজেকে মহান রোগীর পরিচয় পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ক্রমশ দূর্বল হয়ে পড়ছিলেন। তার আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে আসে, আর তিনি অতি সামান্যই পুষ্টি গ্রহণ করছিলেন। ১৪ই ফেরদুসীর লাহের থেকে কর্নেল মেলভেইক ডেকে পাঠাও হয়। তিনি ডঃ সৈয়দ হোসাইনের সাথে আসেন এবং পুটুমানপুরগুলো তাকে পরিকাঠা করে বলেন, পরিচয়বর্ধিত ডাক্তারগণ স্থায় রোগই নির্যাত করছেন। আর তাদের দেয়া চিকিৎসকে অনুমোদন করেন তবে অধিক পৃথিবী খাবার দেয়ার প্রস্তাব দেন।

তার চলে যাবার পর হয়ত খলীফাতুল মসীহুর বলেন: "লাহেরের ডাতার আমাকে পরিকাঠা করতে অনেক সময় নিয়েছে। আমি যে রোগে ভুগছি তা নির্যাত করা এত সহজ, যখন আমি ক্লিনিকে বাঁধ থাকি তখন কেউ দরজা দিয়ে প্রবেশের সময় সালাম করলে তার দিকে না তাকিয়ে শুধু গলার আওয়াজ শুনেই বুঝতে পারি যে সে এ রোগে ভুগছে।"
হযরত মৌলভী নূরউদ্দীন (রা.) - খলিফাতুল মসীহ আউরাল

একটি বড় বাগানে অবস্থিত। সেখানে তিনি অধিক আরাম পেতে পারেন। নবাব সাহেব তাকে স্বাগত জানানের জন্য অতিক্রম ব্যক্তি ছিলেন এবং দুর্বল তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। অবশেষে তিনি সমাধি দেন এবং ২৬শে ফেব্রুয়ারী তাকে সেখানে স্থানান্তরিত করা হয়।

মাঝের প্রথম দিকে ডাঁ সৈয়দ মোহাম্মদ হুসেইন হযরত খলিফাতুল মসীহর সাথে দেখা করতে আসেন। আলোচনা কালে তিনি বিভিন্ন মুসলমান ফিরকার মাঝে অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক সহযোগিতার প্রয়োজনের উপর জোর দেন। এ কথা হলে হযরত খলিফাতুল মসীহ বলেন: “মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্পে তরঙ্গিত করার ক্ষেত্রে আমরা এমন একটি সহযোগিতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছি। এমন সহযোগিতা কল্যাণকর। কিন্তু আমাদের সত্ত্ব পরিচয় বজায় রাখা আবশ্যক।

১. নাতিন্ত্র বজায় রাখার উন্নতি বেগবান হয়।

২. পণ্ডিত মোহাম্মদ উদ্দিন করে আর উন্নতির চাকা চাই হয়ে যায়।

অধিকন্তু আমরা নিজেদেরকে তাদের অধীনস্থ করতে পারি না যারা আমাদের ঐশ্বর্যাদির প্রতিষ্ঠাতাকে প্রতিষ্ঠাধান করে। যদি নাতিন্ত্র বজায় না থাকে তাহলে ‘পুণ্যের আদেশ ও মদনকাজ থেকে বারণ’ করার অর্থবিদ্যা অবহেলিত হয়।

কোন শ্রেণী সত্ত্ব হলে তাদের বিরোধিতা হয়। বিরোধিতা বাড়ার সাথে সাথে সত্ত্ব শ্রেণী বেশি বেশি দেয়ার দিকে পুরুষ এবং বেশি বেশি চেষ্টায় নিয়োজিত হয়।

সবসময় সর্বনাশ রাখান সমস্যায় সর্বদাই না হলে আর মানুষ যদি দোয়া ও চেষ্টা না করে তাহলে কোনো উন্নতি করা সম্ভব নয়। সমস্যা প্রচেষ্টা, সংগ্রাম ও দোয়ায় গতি সংগঠন করে। যে ব্যক্তি সর্বকুষ্ঠ সাথে সমর্থাতা রাখে সে সত্যই অর্জন করতে পারে।”

হযরত খলিফাতুল মসীহ ৪টা মে, স্বাভাবিক হাতে নিম্নরূপ: উদ্দীয়ত লিপিবদ্ধ করেন

“আল্লাহুর নামে অযাচিত দানকারী বারবার দয়াকারী
নাহমাদুল ওয়াও ওয়া নুসারিয়া আলার রসূলিহিল কারিম
এ অথবা সম্পূর্ণ সজ্জানে প্রত্যাশ করছে, আল্লাহ তিন কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সাঁ) তার বান্দা ও রসূল। আমার সত্য-সত্তীরা ছোট আর আমার কাছে কোন অর্থকড়ো নেই। আল্লাহু তাদের রক্ষনাবেক্ষণ করবেন। এহীম

২৩৪
অতিম দৃষ্টা

বা দিব্যদের কোন তহবিল থেকে যেন তাদের জীবিকার ব্যবস্থা না করা হয়।

দয়াপরবশ হয়ে কিছু ঝাঁঝা দেয়া যেতে পারে যা আমার সন্তানদের মধ্যে থেকে যারা

সামর্থ্যবান তারা ফেরত দেবে। আমার বই এবং আমার সম্পত্তি আমার

সন্তানদের কল্যাণার্থে একটি ট্রাস্টের হাতে সোপার্ড করা উচিত হবে। আমার

স্বল্পতিমাত্র ব্যবস্থিত হতে হবে খোদাইভুর, জনপ্রিয়, জনী ও সদাচারী। তিনি

যেন হযরত সাহেবের পুরোনো ও নবাগত সাধারণের দুর্বলতা কমা করেন এবং ধীরে

প্রদর্শন করেন। আমি সবার ভাবাকাঙ্ক্ষী ছিলাম। তিনিও যেন তাই করেন।

কুরআন ও হাদিসের দরস যেন অন্যায় থাকে।

ওয়াস্তাবাদাম

নুরউদ্দিন ৪ঠা মার্চ, ১৯১৪’

তিনি এটি মৌলিক মোহাম্মদ আলীর হাতে সোপার্ড করেন এবং উপস্থিত

লোকদের সামনে পড়ে শুনাতে বলেন। তিনি একে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার পড়ার

নির্দেশ দেন এবং জিজ্ঞেস করেন, কিছু বাদ পড়েছে কিনা? মৌলিক মোহাম্মদ

আলী এর উত্তরে বলেন, এটি নির্ভর। এরপর তিনি তা নবাব মোহাম্মদ আলী

খান সাহেবের তত্ত্বাবধানে রাখেন।

হযরত খলিফাতুল মসীহুর ক্রমবর্ধমান দৈহিক দূর্বলতায় এ ধারণা সৃষ্টি

হচিল যে তার মৃত্যু হলে পরিস্থিতি কি দাড়াবে। এ ধারণা জের ধরে স্পষ্ট

মতবেদ সামনে আছে। এর ফলে যাবার অনুরূপ এবং আলাদানের আশঙ্কা দেখা

dেয়। এরফলে পরিস্থিতিতে হযরত সাহেবায়াদা মিয়ারা বলিয়া উদ্দীন মাহমুদ আহমদ

একটি খসড়া ঘোষণাপত্র প্রক্ষম করেন; হযরত খলিফাতুল মসীহুর

সুখবাস্ত্য এবং মতবেদ তেমন কোন ক্ষতি করতে পারত না। কেননা তার

জন্য লেট নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হত। কিন্তু এখন যেযেই তিনি মারাত্মকভাবে

অস্থি, তাই এ ধরনের আলোচনার ফলে অশান্তি হতে পারে। সুতরাং আলোচনা

মৌলিক হেক বা লিখিত, তা বলা হওয়া উচিত যতক্ষণ না আরোপ তাকে পূর্ণ

আরোগ্য দান করেন। তিনি খসড়াতি মৌলিক মোহাম্মদ আলী সাহেবকে পাঠান

এবং প্রস্তাব করেন, এটা তাদের যৌথ সাহায্যের ছাপা উচিত। মৌলিক সাহেব

বললেন, যদি একটি ভিত্তি ডাকা হয় তাহলে ভাল হয়, যেখানে তারা উপস্থিত

বিষয়ে বক্তব্য রাখতে পারবেন। তদানুসারে নুর মুজিদের একটি সভা আহবান

করা হয়। মৌলিক মোহাম্মদ আলী সাহেবায়াদা সাহেবকে প্রথমে বক্তৃতা করতে

বলেন। তিনি তার খসড়ায় যা প্রস্তাব করেছেন তা উপস্থাপন করেন। এরপর

২৩৫
হয়রত মৌলিকী নূরুদ্দিন (রা.) - খলীফাতুল মসীহ আউয়াল

মৌলিকী মোহাম্মদ আলী বন্ধু করেন এবং খাজা কামালউদ্দিন এবং তার সমস্মনদের যারা সমালোচনা করেন তাদের প্রচেষ্ট বকা দেন। তার বন্ধুত্ব সময় পিন-পটন নীরবতা বিরাজ করে। শেষের দিকে তিনি ঐক্যের প্রয়োজন সম্পর্কে কর্মশ ভাবায় করেজুট কথা বলেন।

তার বন্ধুতা অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে আরও ঘোষাতে করে তোলে।

সাহেবযাদা সাহেব গভীরভাবে দোয়া ও আকুতি-মিনতিতে রত থাকেন আর
বন্ধুদেরকে তা-ই করতে বলেন। তিনি মতভিন্নতা নিয়ে তত্তা চিন্তিত ছিলেন
না যতটা জামাতের ঐক্যের ব্যপারে চিন্তিত ছিলেন। এর উপর তিনি সর্বাধিক
গুরুত্বারোপ করেন। তিনি জামাতের কছেকজন প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে আলাপ
করে বুঝান, যারা থিলাফতের পক্ষ এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর
নবুওয়াতে বিশ্বাসী তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, তারা এমন কোন ব্যক্তির হাতে বয়সাত
করতে পারেন না যে এই দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধী। কেননা এর অর্থ হবে
আহমদীয়ের সমাজ। কিন্তু তিনি নিষ্ঠিত ছিলেন, ঐক্য সবকুয়ার উপর প্রাধান্য
রাখে। আর কোন ব্যক্তির কারণে একে জলাশয়ি দেয়া মেনে পারে না। তিনি
তার বন্ধুদের বুঝাতে থাকেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ মুহার পর যদি
বিচ্ছিন্নতার আশঙ্কা দেখা দেয় তাহলে তাদের সংখ্যালিঙ্গ শ্রেণীর কারণে হাতে
বয়সাত করার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। কেননা তারা এমন কাউকে এগাছ করবে
না যারা তাদের সাথে মতপার্থক্য রাখে আর এর ফলশ্রুতিতে জামাত বিভক্ত হয়ে
যাবে। কিন্তু তিনি যদি তাদের করা হাতে বয়সাত করেন তাহলে তার বন্ধুরা
তার আদর্শ অনুসরণ করবেন এবং জামাতে ঐক্য বজায় থাকবে। একদিন
অপরাহ্মে তিনি জামাতের একজন শীর্ষস্থানীয় আলেম মৌলিকী সাইয়েদ সরওয়ার
শাহ সাহেবকে তার দৃষ্টিভঙ্গি মেনে নেয়ার জন্য প্রতিটা দুটো বুঝিয়েছেন যে কে
খলীফা হবেন সে বিষয় নিয়ে যদি মতভেদ দেখা দেয়, তাহলে তাদের অপব
পক্ষের করা হাতে বয়সাত করার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। মতভেদ সংক্রান্ত
বিষয়ে যাচ্ছে খলীফা কোন নির্দেশ না দেন, ততক্ষণ তারা যা সত্য ও সঠিক
বলে মনে করেন এর উপর স্বাধীনতাবাদে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবেন। যদি খলীফা
সে ধরনের বিষয়ে কোন নির্দেশ দেন তাহলে তারা জামাতের প্রকৃত তত্তাবধায়ক
খোদার হাতে বিষয় সোপার্ড করে তাকে মানতে ও নীরব থাকতে বাধ্য থাকবেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ অসুর্বের শেষ দিনগুলোতে পীর ইফতেহার
আহমদ তাকে বলেন: সুফীদের মতামত হলো, একজন সুফীর জীবন যুগপৎ তার
নিজের ও অন্যদের জন্য কল্যাণের কারণ হয়ে থাকে। তাই তিনি তাঁর (হযরত নুরউদ্দিন) স্বাধী পুনর্নবাহ হবার জন্য তাঁকে দোয়ার অনুরোধ করেন। উত্তরে তিনি বলেন, “বরং পক্ষান্তরে আমি অনবরত এই ধনবি নিঃস্থি ‘না, তোমরারা যা ক্ষমন্ত্রী তাকে ভালবাস আর যা চরিত্র্যী তাকে উপেক্ষা কর’ (৭৫:২১)।”

জীবনের একই পরিস্থিতিতে অনুরূপ এক প্রস্তাবে হযরত আবু বকর (রা:) যে উত্তর দিয়েছিলেন এটি তাঁরই অনুস্মৃতি। তিনি বলেন, “আমি দোয়া করেছি এবং এ উত্তর পেয়েছি, 'আমি সবচেয়ে ভাল জানি, আমি যেভাবে চাই সেভাবে করব'।”

১৩ই মার্চ উক্তবার পূর্বাঞ্চল হযরত খলীফাতুল্লাহ মসীহু তাঁর বড় ছেলে মিরাজ আবদুল হাইমে হেকে বলেন, “এটি আমার চলিত বিশ্বাস যে আল্লাহ ভিন্ন কোন উপাস্য নেই আর আমি যে বিশ্বাস নিমিত মৃত্যু বরণ করছি। আমি হযরত মুহাম্মদ (সাভ্‌)-এর সকল সাহায্যকে সম্মান করি। কুরআনের পর আমি মনে করি বুধবার সংকলন আল্লাহর অদ্ভুতের সবচেয়ে বেশি প্রহরীয়। আমি হযরত মির্জা গোলাম আহমদ (আহমদ)কে প্রতিরূপ মসীহু ও খোদার মনেলনীত বলে বিশ্বাস করি। আমি তাঁকে এই ভালবাসতাম যে তাঁর সন্তানদেরকে তোমার তুলনায় বেশি প্রিয় জন করি। আমি তোমাকে খোদার হাতে সোপার্দ করছি আর আমি নিপীত যে তিনি তোমাকে ধর্ম হতে দেবেন না। আমি তোমাকে খোদার কিতাব পড়ার উপদেশ দিচ্ছি।”

এর শিক্ষার দাও এবং এতদনুসারে কাজ কর। আমি অনেক কিছু দেখেছি কিন্তু কুরআনের মত কিছু পাইনি। নিঃসন্দেহে এটি স্বয়ং

খোদার কিতাব। বাকী সকল বিষয়ে আমি তোমাকে খোদার হাতে সংপে

দিচ্ছি।”

মুমিন নামাইনের সময় যখন এলে, দুই তিনজন পরিচয়কারী ছাড়া বাকী সবাই জুমুআর জন্য মসজিদ আকাশে চলে যায়। হযরত খলীফাতুল্লাহ মসীহু তার স্বামীকে নামাইন পড়েন। নামাই শেষ করতেই তাঁর স্বামী-স্বামীর কষ্ট আরম্ভ হয় এবং করেক মিনিটের মধ্যেই শীঘ্র দেহ-ঝুঁকা থেকে আত্মা বেরিয়ে নিজ স্বার্থী বিশ্বাসশূন্য অশ্রু নেয়। ইন্দ্রিয়তাত্ত্বি ওয়া ইন্দ্রিয়তাত্ত্বি রাজধানী (আমরা আল্লাহর এবং তাঁর দিকেই আমাদের প্রত্যাশিত)।

বেদনাদায়ক সংবাদ যখন মসজিদে পৌঁছে, তখন হযরত মির্জা বনীর উদ্দীন

মহম্মদ আহমদের ইমামতিতে নামাই শেষ হয় মাত্র। সকলেই শেষ বারের মত

সেই প্রিয়ের চেহারা দেখার জন্য নবাব মুহাম্মদ আলী খান সাহেবের ঘটে

২৩৭
হযরত মৌলভী নূরউদ্দীন (র.া.) - খলীফাতুল মসীহ আউয়াল

সমবেত হন, যার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তাদের আধ্যাত্মিক ও জগতিক কল্যাণের জন্য নিবেদিত ছিল। এরপর আসরের নামায় নবাব মোহাম্মদ আলী খান সাহেবর গৃহের সন্নিকটবর্তী মসজিদ নূর'এ নামায়ীদের অনেক বড় জনসমাগম ঘটে। নামায়ের পর সাহেবদাদা মির্জা বনীর উদীন মাহমুদ আহমদ সকলকে এভাবে সমুদায় করেন: "ঐশী ইচ্ছানুসারে হযরত খলীফাতুল মসীহ ইতেকাল করেছেন। আলাহ তার উপর অশেষ দয়া ও রহমত বর্ণ করুন। তাকে সর্বোচ্চ পদময়াদায় অধিষ্ঠিত করুন এবং রসুল করিম (সাঁ)ের সাহায্য ও হযরত মসীহ মাওউদ (আঁ)ের সাথে মিলিত করুন, যার প্রতি (অর্থাৎ মসীহ মাওউদ) তিনি সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত ছিলেন এবং যার ভালবাসা তার সত্তাকে পরিপূর্ণতা দান করেছে, আমাদু।

এখন আহমদীয়া জামাতের সদস্যদের উপর অনেক বড় দায়িত্ব বর্তমান।

পুরো জামাত একটি পরিক্ষার সমুদ্ধি। যে এই পরীক্ষায় পাশ করবে সে খোদার স্ন্তুতি ও ভালবাসা অর্জন করবে আর যে পরীক্ষায় বার্তা হবে সে তার দৃষ্টিতে পুণ্যবান বলে গণ্য হবে না। আমাদেরকে এ পরীক্ষা পাশ করার জন্য অবশ্যই পুরো প্রতিষ্ঠা প্রোণ করতে হবে। ভালবাসে সমর্পণ রাখবেন, যদি সংকল্প পরিশ্রম না হয় তাহলে সবচেয়ে সুপরিকর্মী বিপদের কারণ হয়ে যায়।

নামায় সবচেয়ে উত্তম একটি ইবাদত কিন্তু এসবের বলা হয়েছে, সেসব নামায়ীর জন্য ধর্ম যারা নামায় পড়েকিন্তু নামায়ের বিষয়ে উদাসীন আর শখু লোক দেখানো জন্য পড়ে (১০৭:৫-৭)। অতএব রূপে মননান্তিকতা নিয়ে যে নামায় পড়া হয় তা প্রতিষ্ঠা অর্জন ও খোদার নৈকট্য লাভের কারণ না হয়ে অভিশাপের কারণ হয়।

কুরআন পাঠের পূর্বে আমাদেরকে শয়তানের বিরুদ্ধে ঐশী নিরাপত্তা জন্য দেয়া করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে আর এর প্রতিটি অধ্যায় আলুর্ফ নামে অনুষ্ঠান হয় যা ঐশী সাহায্য চাওয়ার একটি মাধ্যম। অতএব এতি এ বিষয়ের প্রতিযোগিতা বহন করে যে কুরআন পাঠের ন্যায় এমন একটি উদ্বৃত্ত কাজের প্রারম্ভে শয়তানের কুমজ্জার বিরুদ্ধে ঐশী সাহায্য কামনা করা উচিত এবং কাজটি শেষ পর্যন্ত নির্যাধিকার এরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনে শক্তি ও সামর্থ্যের জন্য ঐশী সাহায্যের বিক্ষা চাইতে থাক্কা উচিত। অনেকেই কুরআনের এক আয়াতের মাধ্যমে ঐশী রহমত ও সাহায্য লাভ করে থাকে আর অন্য কারও কারও জন্য একই আয়াত ধ্বংসের কারণ হয়। সে কারণেই ঐশী নিরাপত্তা ও সাহায্য না হয়ে অভিশাপের কারণ হয়।

২৩৮
অন্তিম দৃষ্ট

প্রাণনার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। সংক্ষেপে, পরিকল্পনা যত উটমই হোক না কেন যদি এটি আন্তরিকতা ও যথাযথ মননমসিকতা প্রসূত না হয় তথাহলে এতে মানুষকে খোদা থেকে দূরে ঠেলে দেয়ার আশায় থাকে।

খোদার দৃষ্টি ও রহমত ছাড়া আমাদের উপর এখন যে ঘুরু-দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তা আমরা কোন ভাবে পালন করতে পারব না। তাই আমি আপনাদের পরামর্শে দেবো, যদিও সময় পান পুরো সময় বিনয়ের সাথে এ দোয়ায় রত থাকুন: হে খোদা! তুমি আমাদের সোজা-সরল পথে পরিচালিত কর, যেন আমরা ধর্মের হাত থেকে রক্ষা পাই আর যেন তোমার নেকটা লাগ করতে পারি। এটি একটি ঘুরু-দায়িত্ব। এটা ঐশ্বীরের সাহায্য ছাড়া কোন ভাবে আমরা পালন করতে পারব না। ইহুদিনাসু সিরাজাত্ত মুকতিকিং (১:৫) দোয়ায় প্রতি গভীরভাবে মনননির্বিশ করুন। আমরা জানি না কাল বা পরের দিন কি হবে।

এটি এখন অবিভাজ্যতের গর্বে লুকায়িত। যদি অদৃশ্য জাত খোদা আমাদের হেদায়াত না দেন বা সাহায্য না করেন তাহলে আমাদের ধর্মস হয়ে যাবার আশঙ্কা থেকে যাবে। সুতরাং দোয়া করুন, ক্ষমা লাও আর আন্তর্কক্ষে থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আকৃতি-মিনি ও দিকমিরি রহত এবং আঁ-হযরদ (দায়ি) এর প্রতি দুর্দাদ ধরণ করুন। বেদানার সাথে মিশ্রিত করুন হে প্রভু! আমাদের সাহায্য কর, যেন তোমার রহমতে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারি। তোমার মসিহ এসেছেন, আনেকে অস্বীকার করেছে আর হোটস্ট থেকে সে পথতের উপর পড়ে নিজেদের ধরতে করেছে। কিন্তু তুমি করণবশত আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছ। তার মূর্ত্তিতে আমার আবার পরীক্ষার সমুদ্রীন হই কিন্তু তুমি আমাদেরকে পুনরায় পথপ্রদর্শন করেছিলে। এখন আমরা আর একবার পরীক্ষায় পড়েছি। তুমি পুনরায় আমাদের প্রতি দয়া কর আর আমাদেরকে পুনরায় হেদায়াত দাও। আমাদের যাবতীয় বিষয়ে তোমার কল্যাণ অবতরণ কর। আর আমাদের কষ্ট শক্তির উপরের সুখোগ দিও না আর তোমার কাজের জন্য আমাদের মাঝ হতে একজন পবিত্র ব্যক্তিকে মনননির্বিশ কর, আমিন।

প্রত্যেকই পুরোটা সময় দোয়ায় রত থাকুন। রাতে উঠুন আর দোয়া করুন। আশাহ নিজ করণায় সকল সমস্যা দূরীভূত করবেন। খোদার উপর বিশ্বাস রাখুন। তার সকল প্রতিরুতি সত্য।

হযরত মসীহ মাওউদ (দায়ি)-এর সাথে তিনি যে অস্বীকার করেছেন তা পূর্ণ হয়েছে আর অব্যাহতত্বে হচ্ছে। একজন মানুষ মিথ্যা প্রতিরুতি দিতে পারে, ২৩৯
হযরত মৌলভী নূরউদ্দিন (রা.) - খলিফাতুল্লা মসীহ আওয়াল

কিন্তু খোদার প্রতিশ্রুতি সত্য এবং তিনি স্বীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষায় অন্যহ তার প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস রাখি। তার উপর ভরসা করুন। আমি এখান দোয়া করব।
আপনারা আমার সাথে দোয়ায় যোগ দিন আর এরপরও দোয়া অব্যাহত রাখুন।”

নীরব দোয়ার জন্য তিনি হাত উঠান। তাঁর সাথে মসজিদে উপস্থিত জনতাও হাত উঠায়। সবাই গীতিকভাবে আন্দোলিত হয় আর মসজিদ অবশ্য মতের মধ্যে ক্রমনাশালায় পরিণত হয়। দোয়া বেশ কিছুক্ষণ অব্যাহত থাকে। যখন শেষ হয় প্রতোক হয় সকল বোধ করে। সাহেবদাদা সাহেব বলেন, প্রতোক ব্যক্তি যে পারে সে যেন পরের দিন একটি রোয়া রাখে। তিনি তখন সেখান থেকে বেরিয়ে নবাব মোহাম্মদ আলি খান সাহেবের ঘরে চলে যান, কিন্তু উৎকিলত ছিলেন এবং নিঃসৃতে দোয়া করার প্রয়োজন বোধ করেন। সে উদ্দেশ্যে তিনি মৌলভী সরওয়ার শাহ সাহেবকে বললেন, তিনি একা থাকতে চান তাই কেউ যেন তাঁর পিছনে না আসে। তিনি বাগানের তিতর দিয়ে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছিলেন, মৌলভী মোহাম্মদ আলিদুর থেকে তাকে দেখেন যিনি তাঁর বক্তৃদের সাথে পরামর্শ করছিলেন। তিনি দ্রুত পায়চারি করতে তাঁর সাথে কথা আরম্ভ করেন। তাঁরা পায়চারি করতে করতে আত্মবিশ্বাসে আলোচনা অব্যাহত রাখেন আর তত্ত্বাবধানে মাগরিবের আযান হয়ে যায়।

পরে সাহেবদাদা সাহেব এ আলোচনাকে সংক্ষেপে এভাবে বর্ণনা করেছেন:

মৌলভী মোহাম্মদ আলি: “উত্তম হবে, আলোচনার মাধ্যমে যদি সবকিছু সিদ্ধান্ত হয়। হযরত খলিফাতুল্লা মসীহ ইতেমকাল করছেন। মুতরাঙ তড়িঠড়ি কোন সিদ্ধান্ত করা ঠিক হবে না। ভালভাবে পরামর্শ হওয়া উচিত।”

সাহেবদাদা সাহেব: “তড়িঠড়ি করা অনাক্কাজ্জিত আর অবশ্যই পরামর্শ হওয়া উচিত। অনেকেই আসছেন আর কাল পর্যন্ত অনেকেই পৌছে যাবেন। জামাতের নেতৃত্বরাই ব্যক্তিরা কাছেই থাকেন এবং কালকর মধ্যেই এসে যাবেন। তাদের আসার পর পরামর্শ হতে পারে।”

মৌলভী মোহাম্মদ আলি:

“এত তাড়াতাড়ি করা ঠিক হবে না। যেহেতু মতভেদ রয়েছে তাই পুরো আলোচনার পর সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবে। পুরো জামাতকে চার

240
অষ্টম দৃশ্য

পাঁচ মাস চিন্তা করতে দিন। এরপর মত বিনিময় করে যে সিদ্ধান্ত হয় সে অনুসারে কাজ করা উচিত।”

সাহেব যাদা সাহেব:

“প্রথম প্রশ্ন হলো: মত পার্থক্যগুলো কি কি?

পরের প্রশ্ন হলো: যদি মধ্যবর্তী সময়ে জামাতের মধ্যে বিশ্বঘাতা দেখা দেয় তাহলে নেতার অবর্তমানে কে দায়িত্ব নেবে?

হযরত মসীহু মাওদুদ (আঃ)-এর ইতিকালের পর যারা একত্র হয়েছিলেন তাঁরা তৎক্ষণিকভাবে পরমার্শ করেছেন এবং একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। এ রীতি প্রথম যুগেও অনুস্মৃত হয়েছে। হযরত মসীহু মাওদুদ (আঃ)-এর পূর্বে বা পরে কখনো ছয় মাস অপেক্ষা করা হয়নি।”

মৌলভী মোহাম্মদ আলী:

“পূর্বে মতভেদ ছিল না এখন মতভেদ রয়েছে। এছাড়া কিছুদিন অপেক্ষা করলে কৃতি কি? এমন কি কাজ আছে যা খালিফাকে কালকেই করতে হবে?”

সাহেব যাদা সাহেব:

“হযরত মসীহু মাওদুদ (আঃ)-এর ইতিকালের পর জামাত দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে জামাতের মধ্যে খিলাফতের প্রতিষ্ঠান থাকবে। এ বিষয়ে আর কোন পরামর্শের প্রয়োজন নেই। আর প্রশ্ন উত্থাপন করার এখন সুযোগও নেই। পরামর্শ চুক্ত এ বিষয়ে হতে পারে যে খালিফা কে হবেন? আপনার এই যে প্রশ্ন, খালিফা আকারের কাজ কি করবেন, এর উত্তর হলো, আধ্যাতিক নিগরানীর পাশাপাশি বিশ্বঘাতার সময় জামাতকে একত্রিত ও নিরাপদ রাখাও খালিফার কাজ। এটি এমন বাহুল্য কোন কাজ নয় যার আমি দৃষ্টান্ত দিতে পারি। খালিফাকে জামাতের আধ্যাতিক প্রশিক্ষণ ও শৃঙ্খলার নিগরানী করতে হয় আর আধ্যাতিক প্রশিক্ষণ দেখানোর মত দৈহিক কোন কার্যক্রম নয়। এছাড়া বিশ্বঘাতার নির্ধারিত কোন সময় নেই যে অমুক তারিখের পূর্বে কোন বিশ্বঘাতা দেখা দেবে না। কারণ কোন কিছু ঘটে যেতে পারে এর মোকাবেলার জন্য একজন পরিচালকের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। সুতরাং এ আলোচনা বাদ দেন যে খালিফা হওয়া উচিত কি উচিত নয়, বরং এ আলোচনা হওয়া উচিত যে খালিফা কে হবেন?”

২৪১
হযরত মোহাম্মদ আলিহু নূরুদ্দিন (রা.) - খলিফাতুল মসীহ আউয়ান

মৌলতী মোহাম্মদ আলী:

“এর ফলে একটি সমস্যা সামনে আসবে। মেহেদু দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য আছে তাই ব্যাক্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রেও পার্থক্য থেকে যাবে। আমরা এমন এক ব্যক্তির হাতে বয়ান করতে পারি না যার সাথে আমাদের মতবাদগত পার্থক্য আছে।”

সাহেববাদা সাহেব: “আমার মতে এতটা মত পার্থক্য নেই যা কোন এক পক্ষের কোন ব্যক্তির হাতে বয়ানের পথে বাধা হতে পারে। পরিস্থিতি যাই হোক না কেন আমরা আপনাদের দলের যে কারো হাতে বয়ান করার জন্য প্রস্তুত রয়েছি।”

মৌলতী মোহাম্মদ আলী:

“সেটি কঠিন বিষয়। আপনি আরও ভাবন। নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করুন এবং কালকে আমরা আবার বসি।”

মৌলতী মোহাম্মদ আলীর এ পরামর্শগুলো সাহেববাদা সাহেব যার জন্য নামের একটি তালিকা প্রস্তুত করেন এবং সেদিন সরোৱঘর শাহ সাহেবকে অনুরোধ করেন যে সে রাতেই তাদেরকে নিয়ে একটি চতুর্থাধিকারী নির্বাচন করতে হবে যিনি তাঁর জানায়া ও দাফনের ব্যবস্থা করবেন। এ সিদ্ধান্ত হয় যে রাতটি দোয়ায় ও আহারের মাঝে অভিবাহি করতে হবে যেন খোদা তাআলা দয়াপরবশ হয়ে জামাতকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন এবং তাঁর সন্তুষ্টির পথে অগ্রসর হবার তৌফিক দান করেন। অধিকাংশ পরবর্তী দিন রোয়ায় ও বিশেষ দোয়া অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত হয়।

পরের দিন দুপুর নাগাদ বাইরের বিভিন্ন জামাতের প্রায় সহায়তাকারী সদস্য কাউতুকে সমর্পিত হন। সাহেববাদা সাহেব তাঁর পরিবারের সদস্যদের সাথে উজ্জ্বল পরিসম্পর্কে আলোচনা করেন। তাঁদের কেউ কেউ বলেন, আমাদের অব্যাহতভাবে সে দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করা উচিত যাকে আমরা সঠিক বলে মনে করি। এ কারণে তাঁরা মনে করেন, খলিফা তাঁর হওয়ার উচিত যে মতবাদের দিক থেকে তাঁদের সমন্বয়। কিন্তু সাহেববাদা সাহেব এক্ষেত্রে উপর জোর দেন যে জামাতের এক্ষেত্রে রাখার বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে খলিফার নির্বাচন একটি ধর্মীয় দায়িত্ব। যদি এ বিষয়ে মতোকথা পৌঁছা যায় তাহলে সবচেয়ে সঠিক পথা হবে যে উপস্থিত লোকদের সংখ্যাপরিমাণের ভোটে খলিফা নির্বাচন করা।

242
নতুন দৃষ্টি
যদি এ ব্যাপারে মতোনের পৌঁছা না যায় তাহলে একজন নির্মুক্ত ব্যক্তিকে নির্বাচন করা যেতে পারে। এটি যদি ব্যর্থ হয় তাহলে এমন ব্যক্তির হাতে বয়ানাত করা যেতে পারে যেন দ্বিতীয় পক্ষের কাছে গ্রহণীয় বা তাদের যে কোন ব্যক্তির হাতে বয়ানাত করা যেতে পারে। শেষের দিকে পরিবারের সকল সদস্য তাঁর প্রতিপাদের সাথে একমত হন।

এ পর্যন্ত তিনি মৌলিক মোহাম্মদ আলী সাহেবের পক্ষ থেকে সংবাদ পান যে তিনি পূর্ববর্তী দিনের আলোচনা অব্যাহত রাখতে চান। তাঁকে আসার অনুরোধ করা হয়। তিনি তাঁর কিছু সদৃশ-সাধী নিয়ে উপস্থিত হন। তখন সাহেবদানা সাহেবের সাথে ছিলেন মৌলিক মোহাম্মদ আহসান, নবাব মোহাম্মদ আলী খান এবং তাঁর খেলীফা রশীদ উদ্দিন। গতদিনের সূত্র ধরে আলোচনা এগোতে থাকে।

এক পর্যায়ে মৌলিক মোহাম্মদ আলী ও মৌলিক মোহাম্মদ আহসান এর মাঝে মতবাদনের পরামর্শ নিয়ে আলোচনা হয় কিন্তু সাহেবদানা সাহেব এতে বাধা দেন এবং তিনি মৌলিক মোহাম্মদ আলীকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি যে দীর্ঘ দিন অপেক্ষায় কথা বললেন দীর্ঘ দিন পরও যদি মতোনের পৌঁছা না যায় তাহলে কি হবে? তখন যদি সংখ্যাগরিষ্ঠের মত সাপেক্ষে কোন সিদ্ধান্ত হতে পারে এখন কেন তা সন্দার নয়?

তত্ত্বকে মানুষ মসজিদ নূরে পৌঁছে যায় আর তাদের মাঝে চরম উত্তেজনা বিরাজ করে। একথা প্রকাশ পেয়ে যায় যে ৪ঠা মার্চ হয়েছত খলীফাতুল মসীহু যখন তাঁর ওয়ায়ত নামা লেখেন আর মৌলিক মোহাম্মদ আলীকে দিয়ে তা তিনবার পাঠ করান যাতে তিনি উদ্ধৃত করেন, 'তাঁর স্বল্পীক্ষিত ব্যক্তির বিশেষ কিছু গুণবলী থাকা অবশ্যক'। এরপার মৌলিক মোহাম্মদ আলী একটি প্যাসপার্লেট প্রস্তুত করেন যাতে খাদিমর প্রয়োজনীয়তাকে সাধারণত যেভাবে গুরুত্ব দেয়া হয় এর বিপরীতে মারাত্মকভাবে তা খাট করে দেখানো হয়েছে। এটি ছাপা হয় এবং এর কপি তাঁর বন্ধুদের এই নির্দেশনাট পাঠানো হয়, হয়েছত খলীফাতুল মসীহুর মূল্যের সংবাদ অনেকের এর ব্যাপক প্রচার করা হোক। হয়েছত খলীফাতুল মসীহুর মৃত্যুর বেদানাদারক সংবাদ শোনার পর যারই কাব্যিয়ান আনেন তাদেরকে পরিমাণে উচ্চ প্যাসপার্লেটের একটি কপি ধরিয়ে দেয়া হয়। এমন লোকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী এ ধরনের দুর্বলিক্ষিপ্ত অপপ্রচার ও অথহীন কাজে খুব রাগানিত ছিলেন আর তাঁরা। তখনই খিলাফতের নির্বাচন চালু ছিলেন।

২৪৩
হযরত মৌলিকী নুরউদ্দিন (রা.) - খনিফাতুল মসীহ আউয়াল

আলোচনায় কোন অগ্রগতি হচ্ছিল না আর দরজার কড়া অনবরত নড়ছিল এবং বলা হচ্ছিল, আলোচনা তাড়াতাড়ি শেষ হওয়া উচিত। সাহেবযাদা সাহেব পরামর্শ দিলেন, আলোচনায় যেহেতু মতের পৌরুষ কোন লক্ষণ নেই তাই তাদের সকলের মসজিদে নুর'এ একটা হওয়া উচিত এবং যারা সেখানে সমবেত হয়েছেন তাদের সাথে পরামর্শ করা উচিত। তখন মৌলিকী মোহাম্মদ আলী বললেন: “আপনার একথা বলার কারণ হলো আপনি জানেন তারা কাকে নির্বাচন করবে।”

সাহেবযাদা সাহেব বলেন, “আমি আপনাদের যে কারণ হাতে বয়ংকার করার জন্য প্রস্তুত রয়েছি।”

মৌলিকী মোহাম্মদ আলী: “এ সত্যের তারা কি ভাবে তা আপনি জানেন?”

সাহেবযাদা সাহেব বুঝতে পারলেন যে মতের পৌরুষ কোন সন্ত্রাস নেই। তাই তিনি বললেন, আমারা বিশ্বাস করি খিলাফত ধরে রাখা একটি ধর্মীয় দায়িত্ব আর আপনি মনে করেন যে খনিফাতুল মসীহ আউরুল (রাজ)-এর ১৯১৪ সনের ৪শা মার্চের ‘ওসীয়াত নামা’ পড়ে উঠান যা তিনি তাঁর তত্ত্বাধানে রেখে গেছেন এবং বলেন: “হযরত খনিফাতুল মসীহ আমার হাতে যে আমানত দিয়ে গেছেন তাই আমি আপনাদের হাতে ন্যস্ত করলাম। এখন এ অনুসারে কাজ করা আপনাদের দায়িত্ব। তাঁরা ‘মিয়া সাহেব’ ‘মিয়া সাহেব’ ধর্মনির মাধ্যমে এই ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছেন। এ তৈ এর মধ্যে মৌলিকী সৈয়দ মোহাম্মদ আহসান দাড়িয়ে উঠচ্ছেন, আমার সম্পর্কে হযরত মসীহ মাওদুদ (আঃ) বলেছেন, আমি দুফেরেশুতার একজন যার উপর ভর করে শেষ যুগে প্রতিষ্ঠিত মসীহুর আসার কথা। আমি সাহেবযাদা বল্লীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদকে সকল অর্থে আমাদের বয়ংকার নেয়ার যোগ্য মনে করি আর তাঁকে অনুরোধ করছি, আমাদের বয় আত্ম গ্রহণ করুন। এটি দেখে মৌলিকী মোহাম্মদ
অতিম দৃঢ়

আলী ও সৈয়দ হামেদ শাহ্ দাঁড়ালেন, এমন মনে হয়েছিল যেন কিছু বলতে চাইছিলেন এবং তবে করছিলেন যে কে প্রথমে কথা বলবেন। উপস্থিত জনতা তাদের প্রশ্ন দেয়া পছন্দ করল না। শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী (রা:) দাঁড়িয়ে গণ অনুভূতিকে একান্ড প্রকাশ করলেন: "এ ধরনের বিতর্কে নষ্ট করার মত সময় আমাদের হতে নেই। হে অভিভাবক! আমাদের বয়স্ক গ্রহণ করুন।" লাবাইক লাবাইক ধরনের মাধ্যমে এ আওয়াজকে রুপাগত জানানো হয় আর মানুষ সাহেবযাদা সাহেবের দিকে অহসর হতে থাকে। কয়েকজন ভিন্ন মতবাদী উঠে চলে যায়, কেউ বাধা দেয়ার চেষ্টা করেনি।

উপস্থিত লোকদের উপর সম্পূর্ণ নীরবতা ছেয়ে যায় যদিও উপস্থিত সকলেই হযরত সাহেবযাদা সাহেবের সচেতন কাছে আসার জন্য অভিযুক্ত হয়েছিল। তিনি নীরবে বসে মন দেয়া করছিলেন। একজন একাত্ত সমান্ত আলীম কাজী আমীর হোসেন একবার আবেগের সাথে তাকে অনুরোধ করেন, হযরত অনুর্বুদ্ধক্ষ আমার বয়স্ক গ্রহণ করুন। সাহেবযাদা সাহেবের উপরের দিকে একজন ভিন্ন মতবাদী বলেন তাকে কাঁধে খুঁজছেন। তিনি উদগ্রন্থ জনতার চাপে জরুরিত । "মৌলভী সৈয়দ মোহাম্মদ সরোয়ার শাহ্ সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, মৌলভী সাহেব, হস্ত করে প্রত্যাশিতভাবে আমার উপর এ ওর দায়িত্ব পড়লো। আমারতা বয়স্কের শর্ত বলেও মনে নেই। আপনি কি আমাকে বলবেন।" এভাবে বয়স্কের কার্যক্রম আরম্ভ হয়। হযরত খলিফাও মসীহ সানী, মৌলভী মোহাম্মদ সরোয়ার শাহ্ সাহেবের কাছে তুলে বয়স্কের শর্তগুলো উচ্চারণ করেন আর উপস্থিত সকলেই তাঁর হতে বয়স্ক করেন।

বয়স্কের শর্তগুলো ছিল:

"আমি সাক্ষা দিচ্ছি, আল্লাহ ভিন কোন উপাস্য নেই আর মুহাম্মদ(সা:) তাঁর বান্দা ও রসূল। (দুবার) আজকে মাহমুদের হতে আহমদীয়া জামাতে যোগ দিয়ে আমি আমার সকল পাপের জন্য অনুশোচনা করতি আর ভিযুতি খোদারমত শত্রুর মাধ্যমে সকল পাপ থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করব। আমি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করব না, ঈমানকে সকল পার্থ ভিযুতি উপর প্রাধান্য দেব। ইসলামের সকল নিদর্শন মান্য করব আর আপনার প্রদত্ত সকল মারফত সিদ্ধা মেনে চলে বাধা থাকব।"
হযরত মৌলিকী নূরউদ্দীন (রা.) - খলিফাতুল মসীহু আউয়াল র

আমি হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে খাতামান নবিয়ায় বলে বিশ্বাস করবো আর আত্মরাক্ষায় হযরত মসীহ মাওদ (আ.):-এর সকল দারিদর উপর ইমাম রাখবো এবং ইসলামের প্রচারের কাজ করে যাওয়ার ব্যাপারে সচেত্ত থাকবো।

আমি আমার প্রভু পাতিপালকের নিকট আমার সকল পাপের ক্ষমা চাই আর আমি তার দিকে প্রত্যাবর্তন করি।(তিন বার)

প্রভু আমি আমার প্রাণের উপর মারাত্মক মুলম করেছি।আমি আমার পাপ বীকর করছি। তুমি আমার পাপ ক্ষমা কর কারণ তুমি ছাড়া আমার কেউ পাপ ক্ষমা করতে পারে না।“

বয়োর মনো শেষ হয় তখন হযরত খলিফাতুল মসীহু দীর্ঘ দোয়া করান যাতে সবাই যোগ দেয় আর সংক্ষিপ্ত বাত্তার মাধ্যমে সমাপ্ত করেন।

এভাবে জামাতের দিশেহাট এবং দুঃখভাঙ্গা সদস্যরা পুনরায় আধ্যাত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ হন। সকল হার প্রায় লাভ করে। সকল আত্মা স্বত্ত্ব ফিরে পায়। সকলেই গভীরভাবে অভিভূত ছিল। সর্ব্বতৃপ্তি ও শান্তি ফিরে আসে।

হযরত খলিফাতুল মসীহু সানী (রাও) হযরত খলিফাতুল মসীহু আউয়ালের (রাও) নামায় জানায় পড়ন। আহমদী, অ-ই ইন্দু, জিসিউ, যুক্তিন, পুরুষ, মহিলা এবং ছেলে-মেয়ে সকলেই শেখার এমন এক মহান ব্যক্তিকে শ্রীদামশ্লী জানাতে আসেন। যাঁর কল্যাণ ছিল বিশ্বজীবন ও সার্বজনীন; যাঁর হৃদয় থেকে সকলের জন্য ভালবাসা উপচে পড়তো। সুরমাতের পূর্বেই তার পবিত্র মারদেহ তার সেই গ্রিয় নেতা হযরত মসীহু মাওদ (আ.):-এর কবরের পশ্চিম পার্শ্বে সমাহিত করা হয়, যাঁর জন্যে তিনি সবকিছু বিসর্জন দিয়েছিলেন।

হে প্রভু! তার কবরে তেমার কল্যাণাবারি বর্ণ কর।

তেমার পরম অনুগ্রহে তাকে তেমার নিয়মিত পুর্ণ ঘরে প্রবিষ্ট কর। দেশের সকল সংবাদ মাধ্যম এই মানব হিতৈষীকে প্রাণচালা সাধুবাদ জানিয়েছে। শুধু দুই একটির কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

জমিদার পত্রিকা লিখেছে,

“আজকের টেলিগ্রাফিক সংবাদে মুসলিমানগণ, বিশ্বের কাছে আহমদীরা, মৌলিকী হাকিম নূরউদ্দীনের কাছে সংবাদের অসুস্থতার পর ১৩ই মাচের মৃত্যু সংবাদে মারাত্মকভাবে দুঃখ ভাবাক্ত হবে। তিনি একজন সুপণ্ডিত আলম ছিলেন। ইন্দ্র লিভার ওয়া ইন্দ্র ইলাইহে রাজিউন।

২৪৬
অষ্টম দৃশ্য

মৌলিক হাকিম নূরউদ্দীন তাঁর অনুসারীদের মাঝে খলিফাতুল মসীহ হিসেবে পরিচিত ছিলেন এবং মির্জা গোলাম আহমদের খলিফা ছিলেন। তাঁর মুভা আহমদীদের জন্য বিরাট ধাক্কা। এর প্রভাব সুন্দর প্রসারী। মতবাদগত পার্থক্য একপাশে রেখে বলা যায়, মৌলিনা হাকিম নূরউদ্দীনের বাক্তিত্ব ও মেধা এমন উচ্চমানের যে সকল মুসলমান তাঁর মৃত্যুতে মর্মাহত হবে। বলা হয়, অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন মানুষ শত বছর পর পৃথিবীতে আসেন। মৌলিনা হাকিম নূরউদ্দীন তাঁর ব্যাপক জীবন ও পাতিত্যের সুবাদে এমনই এক প্রতিভা ছিলেন। অজকে আমরা এক প্রখ্যাত আলমের মৃত্যুতে শোকাহত। আহমদী পক্ষের প্রতি আমরা আত্মরক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি যারা এ বেদনাদায়ক ঘটনায় গীতীভিকে মর্মাহত। আমরা দোয়া করি, সবচেয়ে দয়ালু খোদা মৌলিক হাকিম নূরউদ্দীনকে তাঁর রহমতের চাদরে আবৃত করেন এবং তাঁর অনুসারী ও পরিবারের সদস্যদের ধর্মীয় দান করুন।

কর্তৃক গেজেট-এর সম্পাদক লিখেছেন:

“মরছম মৌলিক হাকিম নূরউদ্দীনকে আমরা যে কেবলমাত্র বাক্তিগতভাবে জানতাম তাই নয় বরং জমুকে কয়েক বছর তাঁর সাথে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। প্রত্যেক সময়ে আমাদের সাক্ষাৎ হতো। তিনি একাত্ব হস্তবান ও মানববান ছিলেন। তিনি মার্কিটর রসবোধের অধিকারী ছিল। তিনি শুধুঘরী দীর্ঘকায়, সুদর্শন ও ফসরী সুপুরক্ষ ছিলেন। তিনি কাঠের শ্রম ও সততার সাথে রাষ্ট্রীয় শুল ও হস্তাকান্নলোকের তত্ত্বাবধান করেছেন। তিনি অনেক বড় অংকের বেতন পেতেন। এর বেশিরভাগ যোগ্য ছাত্র-ছাত্রীদের ভরণপূর্ণ ও শিক্ষার জন্য উদার হতে বায় করতেন। জীবনে তিনি শত শত দদিন ছাত্রের লালন পালনের ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর শিক্ষার মাধ্যমে শেখ আবদুর্রাছ নামে একজন কাশ্মীরী প্রাক্তন মুসলমান হন। বতদিন তিনি আইন পাশ করে আলিগড়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠা না করেছেন তিনি তাকে সহায়তা দিয়েছেন এবং তার পড়ালেখা ও শিক্ষা ব্যবস্থা খ্রিস্টান বহন করেছেন। শেখ আবদুর্রাছ নারী শিক্ষায় গীতির অংশ রাখতেন এবং আলিগড় থেকে ‘খাতুন’ নামক সাময়িকীর প্রকাশনা আরম্ভ করেন।

অতএব হাকিম নূরউদ্দীন সত্যিকারের পরেপঞ্চায়ের একটি জীবন দৃষ্টান্ত ছিলেন। তাঁর দুটো বিষয়ের প্রতি সুন্দর আকর্ষণ ছিল। একটি হলো দরিদ্র ছাত্রদের কল্যাণের বিধান করা, অপরটি হলো বিবেক বই সংগ্রহ করা। তাঁর
বিশাল আয়ের পুরোটাই এ দুকানের জন্য নিবেদিত ছিল। তিনি একাত্ত বিনীর্ণ ও অল্প ছিলেন। নিজের সকল দায়িত্ব তিনি তাকাওয়ার সাথে পালন করতেন। যারা তার অধিনে কাজ করতেন তারা তাঁর প্রতি খুবই সতপ্ত ছিল এবং কখনো কোন অভিযোগ করেনি। তিনি একজন সুশিক্ষিত ধর্মবিশেষ এবং পরিদর্শক ছিলেন। আরবী ভাষায় তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। অবসর সময়ে তিনি বুখারী ও মুসলিমদের দরস দিতেন। তিনি ধর্মের সুগতীর্থ জ্ঞান রাখতেন।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, যিনি স্বয়ং একজন প্রসিদ্ধ পরিচালিত ও রাজনীতিবিদ ছিলেন আর একই সাথে সর্বভারতীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট ও ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন, তিনি আল বালাগ পত্রিকায় 'বিদায় নূরউদ্দীন' শিরোনামে লেখেন:

"পরিতাপের বিষয়, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রধান এবং শাহীত ও সুনিশ্চিত রোগ নির্মুক্তির হামিদ মৌলানা নূরউদ্দীনের মৃত্যুতে আমি সবাই শেষে সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। এমন এক ব্যক্তিত্ব যাঁর মাথে ব্যাপক পরিভাষা এবং সত্যিকারের পুরা ও তাকাওয়ার সমাহার ঘটেছে তিনি আমাদের মাথে আর নেই। যাঁর ছিল ধর্মীয় বিষয়ে বুদ্ধিমত্তা এবং চিরদিন নৈতিক শিক্ষার ব্যাপক জ্ঞান, এর সাথে মিশেছিল ধর্মীয় সাহিত্য থেকে আরম্ভ করে সেনা সাহিত্যের অসাধারণ জ্ঞান, যা নূরউদ্দীনের চিস্তা-চেতনাকে এমন পর্যায়ে উন্নীত করেছিল, যে পর্যায়ে পৌঁছে মানববৈজ্ঞানিক ও অনুষ্ঠানের রহস্যে অনুধাবন এবং তাকে বিচার করা সম্ভব। সে কারণে তাঁর উন্মুক্ত সাহারণ কিংবা অন্যান্য উক্তি বাগানের বিরোধীদের মুখে মোহর মেরে দেয়। তাঁর পুরো সত্তা ছিল ধর্মীয় উদ্দেশ্যা ও ব্যাপক জ্ঞানের আশ্রয়জনক ও বিরল সমাহার। তাঁর সার্বজনীন দৃষ্টি ছিল প্রভাব চৌকক জাল। দার্শনিক গবেষণা ও কামেল তাকাওয়ার সমস্যাতে তাঁর সামনে বর্ণের রহস্য উদ্ভাবিত করেছিল। ঐশ্বরিক পৃষ্ঠা পূর্ণ আত্মা তাঁর সকল চিত্তাভাবনাকে অনুপ্রাণিত করেছে।

তাঁর জীবনের শেষ অংশ আহমদীয়া জামাতের সেবায় নিবেদিত ছিল। তাঁর আহরওয়া এ জামাতের আধ্যাত্মিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য কঠোর সংগ্রামে অস্তিত্বাত্য হয়েছে। নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক শুরু প্রতি যে আত্মনিবেদন ও আনুগত্যের দৃষ্টিতে স্পর্শ করেছেন প্রথম যুগের মুসলমান ছাড়া এর দৃষ্টিতে অন্য কোথাও হঁটে পাওয়া তার। হযরত ঈসা (আর্য) এর সাবাবিক মূল্যবান বিশ্বাস, যার সম্পর্কে সাহারণ্যে এ অলীক ধারণা রয়েছে যে তিনি সময়রে

248
অতিম দৃষ্ট
আকাশে সবাস করেছেন, আর মসীহ ও মাহদীকে একই ব্যক্তি আখ্যা দেয়া, ভারতের মুসলমান আলেমদের জন্য ছিল একটি তিন্দ বার্তা। এ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি যে প্রবল বিচারবিশ্লেষণ জন্য দিয়েছে তা সার্ব্বভাষী বালকগণের ন্যায় ছিল কিন্তু এই ঝড়ের ভায়াবহতা নৃতৃদীঘের দৃষ্টিভঙ্গিকে বিদ্যমান টলাতে পারেনি। পরবর্তী যেমন সত্তরাঙ্গত মেহখালি ও বিশ্বকর্মের বলে যে অন্ধ থাকে, তিনি অনিরুদ্ধ দৃষ্টিতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তার নিষ্ঠাপূর্ণ অবিচলিত জীবনের শেষ মূহূর্ত পর্যন্ত একটি প্রশ্ন দেয়া যে তিনি সেই কঠিন জীবন পরিত্যাগ করেন যেখানে তার ব্যবহিত ও সম্পাদনা আত্মা অবশেষে আরাম পেয়েছে। যদিও আমি আহমদীয়া জামাতের কোন কোন দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত নই এ সম্ভ্রে আমি তাকে আন্তর্হ হই, সেই আধ্যাত্মিক অন্যটির প্রাকৃতিক আমার মৃত্যু আরেকেরই গালবাসার প্রধানমন্ত্রী অর্থে রূপান্তরিত করেছে।

নৃতৃদীঘের সমানিতি ব্যক্তিত্ব এখন আমাদের চর্চাক্ষুর আড়ালে। কিন্তু পৃথিবীর বুকে এর স্বীকৃতিহীন এখনও স্পষ্টভাবে লক্ষ্যাঙ্গী যা অবিচলিত ও দীর্ঘকাল বা কর্মনার পানে আমাদের পরিধান। ওদার দয়া ও কৃপা তার করবে অনুসারে সৌচিত্য সুস্থিত করে।

অসাধারণ ব্যক্তিত্ব হয়ত হাকেম হাজারী হাকিম নৃতৃদীঘের বলিক্ষণ ও সফল জীবনের এই অতি সুক্ষম প্রত্যেক। কলেবর সুক্ষম হওয়ায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যে পার্থিব না। কিন্তু আহমদীয়া, ইসলাম এবং মানবতার কল্যাণে তার মহান সেবার একটি দিকের উপর জোর না দিলে নয়। কবরান কবরা হোস্না করার যে সেই যুগে আলাদা কিন্তু সমূহের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবে এবং ইসলামকে ধ্বংস করতে প্রয়াসী হবে, কিন্তু আহওয়াজ তার তাদের ব্যক্তিগত ব্যক্তি করে এবং ইসলামকে আপনাদের সকল ধর্মের উপর জয়ীক্ষণ করবেন (১৯:৩০-৩৩)। এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠাত মসীহুর মাধ্যমে অর্জিত হওয়া কথা, তরবারীর মাধ্যমে নয় বরং আধ্যাত্মিক অন্তর্হ ব্যবহারের মাধ্যমে।

প্রতিষ্ঠাত মসীহুর আমন্ত্রণ হয়েছে এবং ঐশী দিকনির্দেশনার আলোকে সে সকল অন্তর্হের একটি ভাল্লার গড়ে তুলেছেন আর দেখিয়েছেন যে ইসলামের জন্য মানবহুদয়কে জয় করার জন্য তা কিছুই ব্যবহার করতে হবে। তিনি (আঃ) বলেন, তাকে গ্রহণ করা হয়েছে ইসলামের বিজয়ের প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দিতে এবং সে সকল অন্তর্হ সরবরাহের জন্য যা ব্যবহার করে তাঁর বলিকাদের ব্যবধানে ইসলাম তার প্রতিষ্ঠিত অধ্যাত্মিক জাতিতের মাধ্যমে জয়ীক্ষণ হবে। তিনি বলেন, তিনি বীজ বপন করেছেন, যা এখন অক্ষুতিত হবে এবং একটি বৃক্ষ রূপান্তরিত
হযরত মৌলভী নূরউদ্দীন (রা.) - খলিফাতুল মসীহ আউয়াল

হবে যার শাখা সর্ববিত্রু লাভ করবে আর কেউ এর উন্নতিকে স্বীকারে বা বাধ্যতা করতে পারবে না। ঐশ্বী দায়িদু পালনের পর তিনি ১৯০৮ সনের ২৬শে মে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। তাঁর ইতিকালে জামাতের সদস্যদের উপর মারা তোক প্রভাব পড়ে। তারা সম্পূর্ণভাবে দিশশাহরা ছিল। রুকতে পারছিল না যে কোনো পথে যেতে হবে। আল্লাহ তাআলা তাদের উপর তার দয়ার হাত রাখলেন এবং তাদেরকে খলিফাতুল মসীহ হিসেবে হযরত মৌলভী নূরউদ্দীনের আধ্যাতিক নেতৃত্বে পুনরায় একটি করেন। তখন ভিন্নভাবে একটি ধরনের শোনা যায়নি। কিন্তু হযরত পরিপাকী সতর্ক, অতি সতর্ক প্রকাশ নয় বরং সুমধুর বিদ্রোহের কানায়ম আরুণ হয়ে যায় যা ধীরে ধীরে মাঝে মাঝে দেখা এবং সে আওয়াজ কানে আসা আমন্ত্রণ হয়। জামাতের কিছু নেতৃস্থানীয় বায়ির গণনাত্ব, সংসদ ও সংবিধানের কথা মনে পড়ে। তবুও রহস্যজনকভাবে, ভুল বা এ কারণে যে এটি একটি সনবায়নকারী সংস্থা, তারা সদর অধ্যক্ষের নিজেদের শক্তির উত্তর হিসেবে মনে করে যেখানে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল কিন্তু একটি ভুলে যায় যে এটি নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান নয় আর গণতান্ত্রিক নয়, অথচ খলিফা হলেন তাদের এবং একই সাথে পূরো জামাতের সর্বসম্মত পছন্দ। তাদের এ দাবিত ছিল অবশ্বই সম্পূর্ণভাবে অলিখী। দুঃখজনকভাবে তারা যে বিষয়ে রূপাঙ্কিত দেখিয়েছে তা হলো খলিফা একজন আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব, যাকে স্পষ্ট ও জ্ঞানজনক ভাবে ঐশ্বী সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে (২৪:৫৬)। ইসলামের বিজ্ঞান ঐশ্বী দিকনির্দেশিত খলিফাদের তত্ত্বাবধানে আধ্যাত্মিকতার পথ বেঁধে আসার কথা। সুতরাং বিষয়টি পারস্পরিক সম্পর্কমূল্য। জামাত কি খোদা নিযুক্ত ও খোদার পক্ষ থেকে অনুমোদিত কর্তৃত্বসম্পন্ন আধ্যাত্মিক নেতা কর্তৃক পরিচালিত হবে, না কি এটি একটি আত্ম-নবায়নকারী রেজিস্টার্ড প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হবে? যদি পরেরটি দ্বারা পরিচালিত হয় তাহলে আধ্যাত্মিকতার কিছুই থাকবে না। আর এটি (২৪:৫৬)-তে যে ঐশ্বী প্রতিশ্রুতি ও নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে তা থেকে বিচুতি থাকবে। তাই বিনাদনের হলেন হযরত খলিফাতুল মসীহ আউয়াল মৌলভী নূরউদ্দীন (রাঃ) যিনি এ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন ছিলেন। তিনি একে আঁধিয়েছে চলেন নি এবং পৃথি প্রদর্শন করেন নি আর যদি বা প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ ও হুমকির মুখে এক ইঙ্গিত জানতে হাত ছাড়া করেন নি। তিনি পুরুষের মত অনেক ছিলেন। অসত্যাজ ও বিদ্রোহের মেয়ে তাঁকে গাজে আঁহাড় খেয়ে এন্দোমান ফনার মত ব্যাখ্যাক্রমে হয়ে ফিরে যায়। তাঁর পূরো ভরসা ছিল খোদার উপর। তিনি জানতেন, ঐশ্বী বিচারের মাপকাঠিতে তাঁর অবস্থান ছিল নায়কসংস্কৃত। পৃথিবী থেকে তিনি বিদায় নিয়েছেন আজ প্রায়

২৫০
অবিমূল দৃশ্য

শতাব্দীর দুইতৃতীয়াগাঁশ কাল হতে চললো [বর্তমানে প্রায় এক শতাব্দী -
অনুবাদক], অথচ আজও এটি মানুষের দৃষ্টিতে তাঁর অবস্থানের ব্যাখ্যাতাকে
প্রমাণ করেছে।

খলীফার পদমর্যাদা ও কর্তৃত্বের প্রেক্ষা খলীফাতুল মসীহা আউয়াল হযরত
মৌলভী নূরউদ্দীন (রা) জামাতের মধ্যে যারা নেতৃত্বের প্রধ্য দেখতো তাদের
অব্যাহত চাপের মুখে নিত বীর্য করে যদি একটি ইঙ্গিত ছেদে দিতেন তাহলে
হযরত মসীহা মাওউদ কর্তৃক যে বৃক্ষ রোপিত হয়েছিল তা দ্রুত ও ক্রমশ শুকিয়ে
যেত, যা বাসন্তেই বিদ্রোহী শ্রেণী এবং তাদের সংঘর্ষের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়।
এমনটি হলে শেষ যুগে ইসলামের বিজয়ের ঐশ্বর্যের প্রতিকৃতি আপূর্ণ থেকে যেতো
আর এটি ইসলামের সত্যতাকে প্রশ্নবাণী জগরিত করতো। কিন্তু খোদার
প্রতিকৃতি কখনো অপরিপূর্ণ থাকে না। হযরত মৌলভী নূরউদ্দীন খিলাফত
প্রতিষ্ঠানের পরিচর্যা এবং একে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে খোদার হাতিয়ার ছিলেন
যার মাধ্যমে ইসলামের বিজয় সূচিত ও অর্জিত হবার ছিল। কত সুন্দর ও
সাঠিকভাবে সেই যথার্থ কাজ করেছে তা এই পুস্তকের বর্ণিত বিষয় থেকে প্রতিক্রিয়া
হয়। আর এর কাজের ফলাফল আহমদীয়তরূপী বৃক্ষ ইতিমধ্যে যে প্রসার লাভ
করেছে এতেও পরিলক্ষিত হয়। এর মূল মাতির গাত্রে প্রোত্সাহিত এবং এর শাখা
গণমাত্রী, এটি নিজ প্রতুল নির্দেশে সদা সত্যজন ফল দেয় (১৪:২৫-২৬)। অপর
দিকে ভিন্নমতে পোষণকারী শ্রেণীর বৃক্ষ ভূমি থেকে উপভোগ করা হয়েছে এবং এর
কোন স্থিতি নেই (১৪:২৭)। হযরত মৌলভী নূরউদ্দীনের সত্যত পরিচর্যা এটি
নিপীড়ন করেছে, হযরত মসীহা মাওউদ (আ) যে বীজ বশন করেছেন এর
অক্রমের সময়, দৃঢ় হওয়া, এরপর পুষ্ট হওয়া এবং শীঘ্রো কাছের উপর দৃষ্টি সক্রিয় হওয়া, অবশ্যই, যা কৃতকরণ গীতিকে ও অবিশ্বাসীদের ইরশাদ করবে
(৪৮:৩০)।

এটিই সেই দায়িত্ব, যা ঐশ্বর্য ইচ্ছায় নূরউদ্দীনের (রা) উপর নয়স্ত হয়েছিল।
তিনি নিখুঁতভাবে সেই দায়িত্ব পালন করেছেন।

আল্লাহ তাআলা দয়া ও সুপ করত তাঁর সজ্জিত সরবেচ জানাতে তাঁকে
স্থান দিন। (আমিন)

২৫১
তথ্যসূত্র

১. বদর পত্রিকা, খণ্ড-১৩, মার্চ ০৬, ১৯১৩।
২. হায়াতে নূর, পৃষ্ঠা ২১-২২, মিরকাতুল ইয়াকিন, পৃষ্ঠা: ৬১ এর বরাতে।
৩. প্রাঙ্গক, পৃষ্ঠা: ২২।
৪. প্রাঙ্গক, পৃষ্ঠা: ৩১-৩২।
৫. প্রাঙ্গক, পৃষ্ঠা: ৪০-৪১, মিরকাতুল ইয়াকিন, পৃষ্ঠা: ৮১, ৮২।
৬. প্রাঙ্গক, পৃষ্ঠা: ৪২।
৭. প্রাঙ্গক, পৃষ্ঠা: ৪৩।
৮. প্রাঙ্গক, পৃষ্ঠা: ৪৫।
৯. প্রাঙ্গক, পৃষ্ঠা: ৪৮-৪৯।
১০. প্রাঙ্গক, পৃষ্ঠা: ৫৩-৫৪।
১১. প্রাঙ্গক, পৃষ্ঠা: ৫৪।
১২. প্রাঙ্গক, পৃষ্ঠা: ৬৩।
১৩. প্রাঙ্গক, পৃষ্ঠা: ৬৭।
১৪. প্রাঙ্গক, পৃষ্ঠা: ৮৪-৮৫।
১৫. প্রাঙ্গক, পৃষ্ঠা: ৯৮-৯৯।
১৬. প্রাঙ্গক, পৃষ্ঠা: ১০৩।
১৭. প্রাঙ্গক, পৃষ্ঠা: ১০৫।
১৮. প্রাঙ্গক, পৃষ্ঠা: ১৩২।
১৯. কারামাতুস সাদেকীন, রহানী খাযায়েন, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা: ১৪৯-১৫১।
২০. হায়াতে নূর, পৃষ্ঠা: ১৩৯, ১৪০।
২১. প্রাঙ্গক, পৃষ্ঠা: ১২২।
২২. প্রাঙ্গক, পৃষ্ঠা: ১৭৭।
২৩. প্রাঙ্গক, পৃষ্ঠা: ১৮১।
২৪. প্রাঙ্গক, পৃষ্ঠা: ১৮২।
২৫. আয়নায় কামালাতে ইসলাম, রহানী খাযায়েন, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা: ৫৮১-৫৮২।
২৬. হায়াতে নূর, পৃষ্ঠা: ২৯৯।
২৭. সিরাতুল মাহলী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা: ৬১৪।
২৮. মালফুজত, হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী, অক্টোবর ২৫, ১৯৬০।
২৯. আল ফয়ল, ডিসেম্বর ০৬, ১৯৫০।
৩০. নূরদীন, পৃষ্ঠা: ১৪৬।

২৫২
তথ্যসূত্র

৩১. আল হাকাম, খন্ড ৪, নং- ২৫, পৃষ্ঠা: ৫।

৩২. হায়তে নুর, পৃষ্ঠা: ১৯১।

৩৩. মৌলবী হানান আলী ভাগলপুরী রচিত রিসালা তাইদী হাক, পৃষ্ঠা: ৬৪।

৩৪. রাওজ, পৃষ্ঠা: ৬৯।

৩৫. আল হাকাম, জুন ১০, ১৯০২ ও হায়তে নুর, পৃষ্ঠা: ২৬৭।

৩৬. আল হাকাম, খন্ড ৬, নং- ৩৮ অক্টোবর ১/২৪, ১৯০২ ও হায়তে নুর,
পৃষ্ঠা: ২৭০।

৩৭. আহসাবে আহমদ, খন্ড ১০, পৃষ্ঠা: ৭৯-৮০।

৩৮. বদর পত্রিকা, এপ্রিল ১২, ১৯০৮।

৩৯. বদর পত্রিকা, অক্টোবর ১৬, ১৯১১।

৪০. হায়তে নুর, পৃষ্ঠা: ১৯৯।

৪১. বদর পত্রিকা, সেপ্টেম্বর ২৬, ১৯১২।

৪২. আহসাবে আহমদ, প্রথম সংখ্যা, খন্ড ২, পৃষ্ঠা: ১০০।

৪৩. আওরঙ্গজেব, পৃষ্ঠা: ১০২।

৪৪. বদর পত্রিকা, ফেব্রুয়ারী ২৩, ১৯০৬।

৪৫. আল হাকাম, খন্ড ৩৭, নং-১৩, এপ্রিল ১৪, ১৯৩৪।

৪৬. রিপোর্ট জালসায়ে আওম মাযাহেব, পৃষ্ঠা: ৫৫-৫৭।

৪৭. ঐ, পৃষ্ঠা: ৪৬।

৪৮. ঐ, পৃষ্ঠা: ২৫৮-২৬১।

৪৯. আল ইশতাফতা, পৃষ্ঠা: ৩৫-৩৬।

৫০. বদর পত্রিকা, মে ১৬, ১৯০৭।

৫১. হায়তে নুর, পৃষ্ঠা: ৩০০, ৩০১।

৫২. আল হাকাম, খন্ড ১০, নং-৪৪, পৃষ্ঠা: ৬।

৫৩. চাঁদমায় মারফত্ত, পৃষ্ঠা: ২।

৫৪. বদর পত্রিকা, ফেব্রুয়ারী ১, ১৯০৪।

৫৫. বদর পত্রিকা, খন্ড ৭, নং-১১, মার্চ ১৯, ১৯০৮।

৫৬. বদর পত্রিকা, জুন ২, ১৯০৮।

৫৭. আওরঙ্গজেব।

৫৮. বদর পত্রিকা, জুন ২, ১৯০৮।

৫৯. আল হাকাম, মে ২, ১৯০৮ ও বদর পত্রিকা, জুন ২, ১৯০৮।

৬০. মৌলবী মোহাম্মদ আলী রচিত হাকিমীতে ইখতিলাফ, পৃষ্ঠা: ৩৯।

৬১. মৌলবী মোহাম্মদ আলী রচিত বিজ্ঞাপন 'এক নেহােয়াত জরুরী এলান',
পৃষ্ঠা: ১০-১১।

৬২. বদর পত্রিকা- ১১, জুলাই ৪, ১৯১২।

২৫৩
হযরত মৌলল্লী নূরউদ্দীন (রা.) - খলীফাতুল মসীহ আউয়াল

৬৩. মৌলল্লী মোহাম্মদ আলী রচিত বিজ্ঞাপন ‘এক নেহায়্যাত জরুরী এলান’,
পৃষ্ঠা: ১০-১১।
৬৪. মিরআতুল ইথিতলাফ পত্রিকা প্রকাশকাল ১৯৩৮।
৬৫. হায়াতে নূর, পৃষ্ঠা: ৩৫৩।
৬৬. মৌলল্লী মোহাম্মদ আলী সাহেবের বক্তৃতা, প্রকাশিত আল হাকাম,
জুলাই ১৮, ১৯০৮ ও হায়াতে নূর, পৃষ্ঠা: ৩৫৪।
৬৭. পরিষিষ্ট আকবর, বদর পত্রিকা, জানুয়ারী ২৬, ১৯১১।
৬৮. পয়গামে সুলহ, সেপ্টেম্বর ১৬, ১৯১৩।
৬৯. পয়গামে সুলহ, অক্টোবর ১৬, ১৯১৩।
৭০. আল হাকাম, এপ্রিল ১৪, ১৯০৮, পৃষ্ঠা: ২ ও বদর পত্রিকা,
এপ্রিল ২৩, ১৯০৮।
৭১. ইয়ালায় আওহাম।
৭২. মৌলল্লী মোহাম্মদ আলী রচিত হাকীকাতে ইথিতলাফ, পৃষ্ঠা: ২৯-৩০।
৭৩. হায়াতে নূর, পৃষ্ঠা: ৩৭৭-৩৭৮।
৭৪. হযরত মিয়া বিশ্বরূপদী মাহমুদ আহমদ (রা.) রচিত ইথিতলাফে
সিলসিলহ, পৃষ্ঠা: ২৯-৩০।
৭৫. প্রাঙ্ক, পৃষ্ঠা: ৩৫-৩৬।
৭৬. বদর পত্রিকা, অক্টোবর ২১, ১৯০৯।
৭৭. মৌলল্লী মোহাম্মদ আলী রচিত হাকীকাতে ইথিতলাফ, পৃষ্ঠা: ৬৯।
৭৮. আল ওসায়ত, পৃষ্ঠা ৩-৫।
৭৯. হায়াতে নূর, পৃষ্ঠা ৪১৩-৪১৪।
৮০. বদর পত্রিকা, অক্টোবর ১৫, ১৯০৮।
৮১. বদর পত্রিকা, ডিসেম্বর ১০, ১৯০৮।
৮২. আল হাকাম, অক্টোবর ৩০, ১৯০৮, পৃষ্ঠা ৩,৪।
৮৩. বদর পত্রিকা, জানুয়ারী ২৮, ১৯০৮।
৮৪. আল হাকাম, জানুয়ারী ১৪, ১৯০৯।
৮৫. হায়াতে নূর, পৃষ্ঠা ৪৩১-৪৩২।
৮৬. আল হাকাম, জুলাই ৭, ১৯০৯।
৮৭. বদর পত্রিকা, আগস্ট ৫, ১৯০৯।
৮৮. আল হাকাম, আগস্ট ৭, ১৯০৯।
৮৯. খালিদ, নভেম্বর ১৯০২।
৯০. বদর পত্রিকা, এপ্রিল ৭/১৪/২১, ১৯১০।
৯১. বদর পত্রিকা, আগস্ট ৪, ১৯১০।
৯২. বদর পত্রিকা, আগস্ট ১১, ১৯১০।
৯৩. বদর পত্রিকা, অক্টোবর ২৭, ১৯১০।

২৫৪
৯৪. বদর পত্রিকা, নভেম্বর ৩/১০, ১৯১০।
৯৫. প্রাক্তন।
৯৬. আল হাকিম, খন্ড ১৪, নং-৪১, পৃষ্ঠা: ১৪, নভেম্বর ১৯১০।
৯৭. পরিশেষণ বদর, ডিসেম্বর ১, ১৯১০।
৯৮. বদর পত্রিকা, জানুয়ারী ১২, ১৯১১।
৯৯. প্রাক্তন।
১০০. বদর পত্রিকা, জানুয়ারী ২৬, ১৯১১।
১০১. বদর পত্রিকা, ফেব্রুয়ারী ২, ১৯১১।
১০২. বদর পত্রিকা, ফেব্রুয়ারী ১৬, ১৯১১।
১০৩. বদর পত্রিকা, পৃষ্ঠা: ১, মার্চ ৯, ১৯১১।
১০৪. হায়াতে নুর, পৃষ্ঠা: ৫১১-৫১৩।
১০৫. বদর পত্রিকা, জানুয়ারী ২৫, ১৯১২।
১০৬. বদর পত্রিকা, ফেব্রুয়ারী ১, ১৯১২।
১০৭. প্রাক্তন।
১০৮. হায়াতে নুর, পৃষ্ঠা: ৫৫৬-৫৫৭।
১০৯. বদর পত্রিকা, জুন ২৭, ১৯১২।
১১০. বদর পত্রিকা ৪; জুলাই ১১, ১৯১২।
১১১. আল হাকিম, খন্ড ১৯, নং-২৩, ১৯০৯।
১১২. বদর পত্রিকা, আগস্ট ১, ১৯১২।
১১৩. বদর পত্রিকা, আগস্ট ২২, ১৯১২।
১১৪. আল ফয়ল, অক্টোবর ১২, ১৯৬০।
১১৫. বদর পত্রিকা, অক্টোবর ১৭, ১৯১২।
১১৬. প্রাক্তন।
১১৭. বদর পত্রিকা, জানুয়ারী ৩০, ১৯১২।
১১৮. প্রাক্তন।
১১৯. বদর পত্রিকা, ফেব্রুয়ারী ২৭, ১৯১৩।
১২০. তাসয়ীমূল অহান পত্রিকা, অক্টোবর ১৯১২।
১২১. বদর পত্রিকা, মার্চ ১২, ১৯১৩।
১২২. বদর পত্রিকা, জুলাই ৩, ১৯১৩।
১২৩. আল ফয়ল, জুলাই ২, ১৯১৩।
১২৪. পয়গামে মুলহ, খন্ড ১, নং-৫৪, সংখ্যা ১৩, ১১, ১৬।
১২৫. আল হাকিম, খন্ড ১৯, নং-৬, সংখ্যা ৫, ফেব্রুয়ারী ৭/১৪, ১৯১৫।
১২৬. আল ফয়ল, খন্ড ১, নং-৩, জানুয়ারী ৭, ১৯১৪।
১২৭. আল ফয়ল, ফেব্রুয়ারী ১১, ১৯১৪।
Hadrat Maulawi Nur-ud-Din, Khalifatul Masih I\textsuperscript{ra}

Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, the Promised Messiah\textsuperscript{as} and Mahdi, Founder of the Ahmadiyya Muslim Jama'at (Movement/Sect) died on May 26, 1908. The impact of the event, when it happened, on the members of the Jama'at, was shattering.

At that fateful hour in the history of the Jama'at, of religion and of mankind, before his sacred remains were reverently committed to the earth at Qadian, on May 27, his foremost and most devoted disciple, Hadrat Maulawi Nur-ud-Din\textsuperscript{ra}, an eminent divine, a great lover of the Holy Quran, an outstanding and reputed physician, was acclaimed as his spiritual Successor, and the members of the Jama'at swore allegiance to him in his capacity of Khalifatul Masih.

The place of Hadrat Maulawi Nur-ud-Din, Khalifatul Masih I\textsuperscript{ra}, is securely established in the history. Little is, however, known of his life and character, to those members of the Jama'at and other seekers after truth who are not familiar with Urdu. This is a humble effort to furnish a concise account of both in English. Sir Muhammad Zafrulla Khan thereby seeks to discharge a minute fraction of the heavy debt of gratitude that he owes to that august, revered, gracious and deeply loved personage from whom he had received numerous personal favours and bounties.

This edition of the book includes the index and the references have also been given where possible.